মুহাম্মদ বিন কাসিম

মেজর জেনারেল আকবর খান

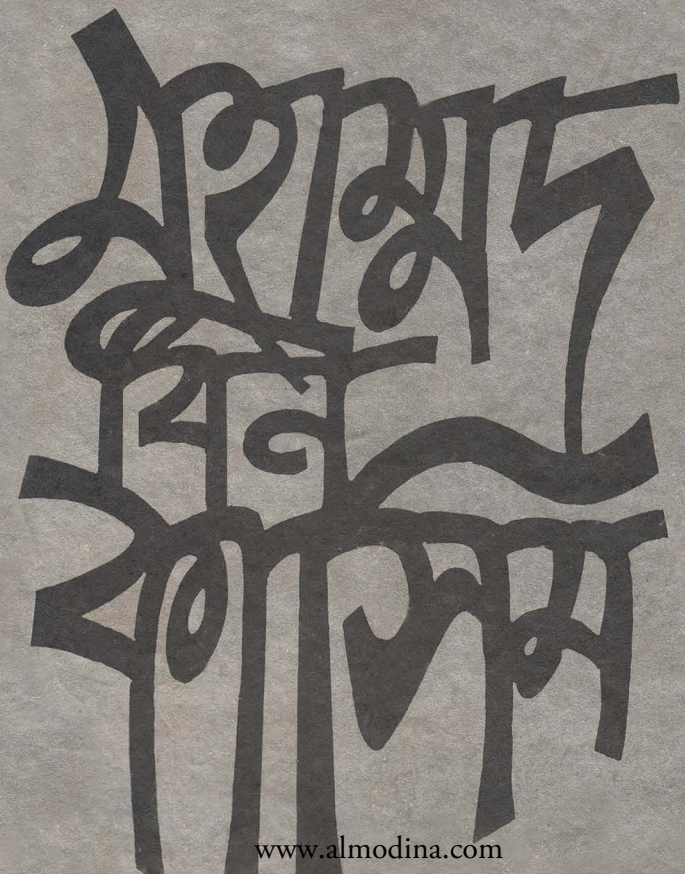

www.almodina.com

মেজর জেনারেল আকবর খান

আমীর-ই-মুজাহিদীন

মুহাম্মদ বিন কাসিম

তরজমায়

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পনের শতক উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিম ঃ মেজর জেনারেল আকবর খান ; আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত ॥ ই. ফা. বা. প্রকাশনা ঃ ১৩৪১ ॥ ই.ফা.বা. গ্রন্থাগার ৯২৩·১৯৭ ॥ বিষয় ঃ জীবনী ॥ প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৮৬, কার্তিক ১৩৯৩, সফর ১৪০৭ ॥ প্রকাশনায় ঃ আবুল বাশার আখন্দ, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২ ॥ প্রচ্ছদ ঃ কামাল আহমেদ ॥ ইলাস্ট্রেশন ঃ কাজী শামসুল আহসান ॥ মুদ্রণে ঃ শেখ আবদুর রহিম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস ॥ বাঁধাইয়ে ঃ ওরিয়েন্টাল বাইণ্ডার্স ৫৯, পূর্ব বাসাবো বাজার, ঢাকা-১৭

মূল্য ঃ পঁয়ত্রিশ টাকা

MUHAMMAD BIN QUASIM (The Biography of Muhammad bin Quasim) : Written in Urdu by General Akbar Khan, translated into Bengali by Abu Sayeed Muhammad Omar Ali and published by the Islamic Foundation Bangladesh. November 1986.

Priee : TK. 35·00

U. S. Dollar : 2·50

www.almodina.com

যে কালো হাতের হিংস্র থাবায় জীবনের প্রথম প্রভাতেই ঝরে গেল মুহাম্মদ বিন কাসিম, কুতায়বা বিন মুসলিম, 'আবদুল আযীয ইব্‌ন মূসা, ওমর ইব্‌ন 'আব্দুল 'আযীয (র)-এর ন্যায় অনেক সম্ভাবনাময় যুবা ও তরুণের তরতাজা প্রাণ,

থিতিয়ে গেল মূসা বিন নুসায়র ও তারিক বিন যিয়াদের ন্যায় বহু প্রৌঢ় ও যুবকের উৎসাহ-দীপ্ত আবেগ,—

যে কালো হাতের বিষাক্ত ছোঁয়ায় হারিয়ে গেলেন হাসান আল-বান্না, সায়্যিদ কুত্‌ব, মুহাম্মদ ম্যালকম এক্স, ইসমা'ঈল আল-ফারূকীর ন্যায় অনেক মনীষী—

সেই কালো হাতের চির-ধ্বংস সাধনে প্রতিজ্ঞা-দীপ্ত তরুণদের হাতে।

—অনুবাদক

www.almodina.com

লেখক কর্তৃক লিখিত ও অনূদিত কয়েকটি বই

- ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার (২য় সং)
- ঈমান যখন জাগলো (২য় সং)
- ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (৩য় খণ্ড, ২য় সং)
- ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল (১ম সং)
  ("মহানবী (সা)-র রণ-কৌশল" নামে ২য় সং প্রকাশের পথে)
- খালিদ বিন ওয়ালীদ (১ম সং)
- ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (১ম খণ্ড, প্রকাশের পথে)
- গল্প পড়ি জীবন গড়ি (শিশু-কিশোর গ্রন্থ, ২য় সংস্করণ)
- তাঁরা ছিলেন মানুষ (শিশু-কিশোর গ্রন্থ, ১ম সং)

www.almodina.com

আমাদের কথা

পৃথিবীর সমর নায়কদের ইতিহাসে মুহাম্মদ বিন কাসিম একটি অবিস্মরণীয় নাম। উমাইয়া খলীফা প্রথম ওয়ালীদের অন্যতম সিপাহসালার হাজ্জাজ ইবনে য়ূসুফের জামাতা সপ্তদশবর্ষী তরুণ যুবক মুহাম্মদ বিন কাসিম মুসলিম জাতির গৌরব। পৃথিবীর সমর ইতিহাসে এত অল্পবয়স্ক যুবকের নেতৃত্বে কোন সমরাভিযান পরিচালিত হয়েছে কি-না তা আমাদের জানা নেই। মূলত তাঁরই প্রজ্ঞা, তাক ওয়া, সমর-কুশলতা ও কুরবানীর বদৌলতে এই উপমহাদেশ মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! এ বিরল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুণ সমর নেতাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এক দিকে তাঁর অসম সাহসিকতা, বীরত্ব ও রণকুশলতা কিংবদন্তীর ন্যায় প্রচলিত, অপর দিকে তাঁর অকাল মৃত্যুর করুণ কাহিনী শোকাবহ ঘটনা হিসেবে অবিস্মরিত।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্পর্কে তথ্য-নির্ভর কোন পুস্তক বাংলা ভাষায় নেই বললেই চলে। প্রখ্যাত সমর বিজ্ঞানী জেনারেল মুহাম্মদ আকবর খান প্রণীত "আমীরে মুজাহিদীন মুহাম্মদ বিন কাসিম" শীর্ষক গ্রন্থটি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। লেখক অত্র পুস্তকে সমর-নায়ক ও রণকুশলী যোদ্ধা হিসেবে মুহাম্মদ বিন কাসিমের ঘটনা-বহুল ও তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী তুলে ধরেছেন। লেখকের আলোচনা পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত। যুগের চাহিদা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অতি নিখুঁত-ভাবে তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের জীবনী উপস্থাপনা করেছেন। বইটি বাংলায় ভাষান্তর করেছেন অধ্যাপক এ. এস. এম. ওমর আলী। তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখক ও খ্যাতনামা অনুবাদক। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। আল্লাহ তা'আলা অনুবাদকের কলমকে আরও মযবুত করে দিন।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে আলোচ্য পুস্তকটি প্রকাশ করত সুধী পাঠক মহলে উপহার দিতে পেরে রাহ'-মানু'র-রাহ ীমের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে।

ফরীদুদ্দীন মাসউদ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

www.almodina.com

অনুবাদকের আরয

আল্লাহ পাকের অশেষ হ'াম্‌দ ও শুকরিয়া। অবশেষে তাঁরই অপার অনুগ্রহে মেজর জেনারেল আকবর খান লিখিত ও গুনাহ্‌গার কর্তৃক অনূদিত "মুহাম্মদ বিন কাসিম" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। জেনারেল আকবর লিখিত এটি আমার তৃতীয় অনূদিত গ্রন্থ। এর পূর্বে তাঁর "হাদীছে দেফা" ও "সায়ফুল্লাহ্‌ খালিদ" শীর্ষক দু'টি গ্রন্থ যথাক্রমে "ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল" ও "খালিদ বিন ওয়ালীদ" নামে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকেই প্রকাশিত হয়েছে।

উপ-মহাদেশের যে কয়েকটি চরিত্র সর্বস্তরের মানুষের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করতে পেরেছে, যে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব সাধারণ মানুষের অন্তরের মণিকোঠায় স্থান লাভে সক্ষম হয়েছেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁদের শীর্ষে। মাত্র সতের বছরের এই তরুণ কোন্‌ যাদু মন্ত্র বলে সিন্ধুর আপামর মানুষকে বশীভূত করলেন তা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এত অল্প বয়সে এই তরুণ এতগুলো গুণ কি করে আত্মস্থ করতে পারলেন—কেবল আত্মস্থই নয়, সে সবের যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়ে শুধু সিন্ধুর নয়, উপমহাদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম হিরো হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তা অভাবনীয় বৈকি! কী বীরত্বে, কী উদার মহানুভবতায়, আর কী আনুগত্যে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। এটা কোন আবেগ-উচ্ছ্বাসের কথা নয়; বরং ইতিহাসের রায়ও তাই।

গ্রীক বীর দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের কথাই ধরুন। উপ-মহাদেশের প্রতি তাঁর লোভ মোটেই কম ছিল না। এটাকে করায়ত্ত করবার জন্যে তিনি চেষ্টারও কোন ত্রুটি করেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একরাশ ব্যর্থতা নিয়েই ভারতের দোর গোড়া থেকে ফিরে যেতে হ'ল তাঁকে। অগণিত লোক ক্ষয়, প্রচুর সম্পদ বিনষ্ট,

www.almodina.com

সর্বোপরি বিরাট ঝুঁকি ও ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে তিনি যে সব দেশ জয় করলেন--সেখানেও তিনি কোন স্থায়ী কীর্তি রেখে যেতে পারেন নি, পারেন নি তাঁর পিতার হাতে গড়া সেনাবাহিনীকেও কোন প্রেরণাদায়ক আদর্শে উজ্জীবিত করে তুলতে। আর এই না পারার ব্যর্থতা নিয়েই ভগ্ন হৃদয়ে তিনি স্বদেশের বুকে পাড়ি জমালেন এবং পরিণতিতে অকালে মৃত্যু বরণ করলেন। আর তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই বিজিত বিশাল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতই ধসে পড়ল।

কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমেব বিজয় এধরনের কোন দিগ্বিজয়ীর বিজয় ছিল না, ছিল না পররাজ্য লোভী স্বৈরশাসকের অধীনস্থ কোন মহাবীরের অভিযান। প্রথমত, তিনি তাঁর স্বজাতির কতিপয় বন্দী ও বন্দিনীর আর্ত চীৎকারে সাড়া দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। আর তাদেরকে মুক্ত করতে এসেই দেখতে পেলেন রক্ত, বর্ণ ও কৌলিন্যবাদের যূপকাষ্ঠে উত্তরাধিকার সূত্রে বন্দী সিন্ধুর তথা উপমহাদেশের আপামর মানুষকে। তারা বন্দী বিদেশী কোন শক্তির হাতে নয়, ভিন্‌দেশী কোন স্বৈরশাসকের হাতেও নয়; বন্দী তাদেরই স্বদেশী রক্ত ও বর্ণের দাবীতে আভিজাত্য গর্বিত স্বৈরাচারী একদল মানুষের হাতে। সিন্ধুর রাজা দাহির এদেরই প্রতিনিধি হিসাবে আপন দেশবাসী হিন্দু, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকল মানুষকে নির্মমভাবে শাসন ও শোষণ করে যাচ্ছিলেন। সিন্ধু তথা উপমহাদেশের শাসিত ও শোষিত মানুষের চোখের নীরব আর্তি পাঠ করলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং মানুষের হাতে গড়া শাসন ও শোষণের লৌহ জিঞ্জীর ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে আল্লাহ্‌র খেলাফত ও রব্‌বিয়ত কায়েম করতে চাইলেন। সিন্ধুর মানুষ অবাক বিস্ময়ে ইবনে কাসিমের জনকল্যাণমুখী ব্যবস্থার বাস্তব নজীরটি শুধু প্রত্যক্ষই করল না, তারা একে নিজেদের জীবনেও গ্রহণ করল। তারা নিবেদিত-প্রাণ কর্মী হিসেবে একে সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবার দুর্জয় শপথ গ্রহণ করল এবং এ অভিযানের অগ্রসৈনিক মুহাম্মদ বিন কাসিমের সংগে হাত মেলাল। মুহাম্মদ বিন কাসিম মাত্র ছয় হাজার সৈনিক নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছিলেন, অথচ বছর দু'য়েকেরও কম সময়ের ভেতর সিন্ধু থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে তাঁর সঙ্গে ছিল লক্ষাধিক সৈনিক যারা তাদের সেনাপতির অংগুলী হেলনে অবলীলায় প্রাণ

www.almodina.com

বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিল। স্বভাবতই অনুমান করা চলে এই অতিরিক্ত জনশক্তি ছিল কারা, কোন্ মন্ত্র তাদেরকে এই ভিনদেশী তরুণের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল এবং কে তাদেরকে তাঁর পেছনে সংঘবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সন্দেহ নেই, মুহাম্মদ বিন কাসিমের হাতে তলোয়ার ছিল। কিন্তু সে তলোয়ার ছিল তাদের উদ্দেশ্যে কোষমুক্ত যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট স্বাধীন মানুষকে মানুষের বল্গাহীন খেয়াল-খুশীর গোলামে পরিণত করেছিল। অপরদিকে তিনি বন্দী শাসিত ও শোষিত মানুষগুলোর জন্য সংগে নিয়ে এসেছিলেন স্নেহ ও ভালবাসায় পূর্ণ দরদী একটি মন আর আল্লাহ্‌র দেয়া নে'মত ইসলাম—যে ইসলাম মানবীয় সার্ব-ভৌমত্বের বদলে আল্লাহ্‌র খিলাফত কায়েম করতে চায়, শাসন-শোষণের পরিবর্তে চায় মানুষকে সন্তান স্নেহে পালন করতে, যার অপর নাম রবুবিয়ত। সিন্ধুর শোষিত ও অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ মুহাম্মদ বিন কাসিমের নিরহংকারী চরিত্র ও ব্যবহার দৃষ্টে এবং তাঁর অপার দরদী মনের পরশে অভিভূত হয় এবং দলে দলে মুসলমান হতে থাকে। আর যারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মে অবিচল থেকে যায় তারাও এই তরুণটির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। তারা তাঁকে দেবতা হিসাবে তাদের হৃদয়ে ঠাঁই দিয়েছে, তাঁর অকাল মৃত্যুতে তাঁরই মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করেছে। সর্বশেষ সাফল্য হ'ল, তাঁরই পদস্পর্শে ধন্য সিন্ধু, মুলতান ও তৎসন্নিহিত এলাকা চিরকালের মত কুফরীর আবর্জনা মুক্ত হয়ে "দারু'ল-ইসলাম" হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এরপরও কি তাঁকে পররাজ্য গ্রাসী কোন বীরের সংগে তুলনা করা চলে ?

মুহাম্মদ বিন কাসিমের অপর প্রশংসনীয় দিক ইসলামের প্রতি তাঁর তুলনাহীন আনুগত্য। এক্ষেত্রে কারো সাথে যদি তাঁর তুলনা করতেই হয় তবে সে তুলনা কেবলমাত্র তাঁর পূর্ব-সুরি সায়ফুল্লাহ খালিদ (রা)-এর সংগেই করা চলে। কিন্তু তবুও কথা থেকে যায়। খালিদ (রা)-কে তো একধাপ নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র—সেনাপতি থেকে সেনানায়কে। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমের চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁকে করা হ'ল সরাসরি পদচ্যুত। তদুপরি খালিদ (রা)-এর জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে আশংকার কিছু ছিল না। কিন্তু মুহাম্মদ

www.almodina.com

বিন কাসিমের সে আশংকা ছিল ষোল আনা। তাঁর সৈনিক ও সেনা-নায়কগণ সে আশংকার কথা ব্যক্ত করে তাঁর দিকে তাদের সাহায্য ও আনুগত্যের হস্তও সম্প্রসারিত করেছিল। খলীফা সুলায়মান কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ী এই বীরকে তাঁর আরব্ধ বিজয় অসম্পূর্ণ রেখেই তলব করার পেছনে এক বিরাট ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলে তারা অনুমান করেছিল। তাদের আশংকা ও অনুমান যে কল্পিত ও অমূলক ছিল না--খলীফার পরবর্তী কার্যক্রম তার সাক্ষী। মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজেও যে পরিস্থিতি আঁচ করতে পারেননি তা নয়। কিন্তু তবুও তিনি কেন খলীফার এই অবিবেচক সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন? কেন তিনি তাঁর শুভাকাংক্ষী সৈনিক ও সেনানায়কদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করলেন।

এর উত্তর খ্যাতনামা ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক নাসীম হিজাযী মুহাম্মদ বিন কাসিমের মুখ দিয়ে যেভাবে বলিয়েছেন আমরা নিম্নে তা উদ্ধৃত করলাম। মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর অন্যতম সেনানায়ক রাজা ভাম সিংহ ও তদীয় সংগীগণ কর্তৃক তাঁর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য ও সমর্থন ঘোষণার জবাবে বলেছিলেন ঃ

"আমার প্রত্যেক সৈনিকের জীবনকে আমি আমার জীবনের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করি।...আমার ব্যক্তিত্বকে তোমরা আমার উদ্দেশ্যের উপরে স্থান দিয়েছ। তোমরা জানো , যে মহান আদর্শের জন্য গত এক শতাব্দী যাবত লক্ষ লক্ষ বীর স্বীয় রক্তদান করেছেন, খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ সেই আদর্শের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করা। এই এক লক্ষ সৈন্য সারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য যথেষ্ট। আমার জীবন এত মূল্যবান নয় যে, আমি তার জন্য এই এক লক্ষ তরবারিকে মুসলিম জগতের এক লক্ষ তরবারির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবার অনুমতি দেব। এরূপ সংঘাতে আমার জয় হলেও তা মুসলমানের বিপুল পরাজয়ের সমার্থক হবে। তুর্কিস্তান ও স্পেনে আমাদের যে সব সৈন্য জিহাদে ব্যস্ত, সিন্ধুর সৈন্যাধ্যক্ষ স্বীয় প্রাণভয়ে মুসলিম জগতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে বলে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হোক--এরূপ ব্যবস্থা কি আমি কখনো পসন্দ করতে পারি? এটা সুলায়মান ও আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন হলে আমি হয়ত তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতুম না। কিন্তু যে জাতি সুলায়-

www.almodina.com

মানকে নিজেদের খলীফা মেনে নিয়েছে, আমি সেই জাতির কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আমার মৃত্যু যদি মুসলিম জাতিকে এরূপ একটি সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, তা হলে সেটা আমার সৌভাগ্য বলে গণ্য করব। তোমরা বলেছ যে, আমার ইংগিতে তোমরা প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছ। আমি তোমাদের কাছে কোন প্রকার ত্যাগ দাবী করার অধিকারী নই। কিন্তু তোমরা যদি চাও যে, সিন্ধু থেকে বিদায় নেবার কালে আমার মনে কোন ক্ষোভ না থাকে এবং আমি সিন্ধুতে কোন আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখে যাই নি—এরূপ মনে শান্তি নিয়ে যাই, তা হলে যে ধর্মকে তোমরা কার্যক্ষেত্রে গ্রহণ করেছ—তাকে মুখেও ঘোষণা করে দাও। আমার যেসব বন্ধু এখানে উপস্থিত--তাদের সকলের জন্যই আমার এই আহ্বান। তোমাদের মত লোক ইসলাম গ্রহণ করলে সিন্ধু কোন মুহম্মদ ইবনে কাসিমের মুখাপেক্ষী থাকবে না। যে পথিক দীর্ঘ ভ্রমণের পর অভীষ্ট স্থানে পৌঁছেই শুয়ে পড়তে চায়, আজ আমার অবস্থা তারই মত।...আমার ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আপনারা এ মুহূর্তে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলুন, আমার অভিপ্রায় তা নয়। কিন্তু আন্তরিকভাবে যদি আপনারা ইসলামের সৌন্দর্যসমূহ স্বীকার করে থাকেন, তা'হলে আপনাদের ঘোষণা শুনে আমার আধ্যাত্মিক আনন্দ হবে" দ্র. এ. এফ. এম. আবদুল হক ফরিদী অনূদিত 'মুহম্মদ ইব্ন কাসিম"—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত)।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁর এই আবেদন নিষ্ফল হয় নি। রাজা ভীম সিংহ সহ এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিন্ধুবাসী তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের অকাল মৃত্যুতে কারা লাভবান হয়েছিল? —তারাই, যারা হযরত 'উছ'মান (রা) ও হযরত 'আলী (রা)-এর শাহাদতে লাভবান হয়েছিল, যারা মু'আবিয়া ইবনে য়াযীদ ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর পতনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়েই ইসলামের দুশমনরা 'আবদুল্লাহ বিন উবাই ও 'আবদুল্লাহ বিন সাবার ন্যায় কপট মুসলিম সেজে ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং একের পর এক হযরত 'উছ'মান (রা)-কে হত্যা, জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফীন,

www.almodina.com

হযরত 'আলী (রা)-এর শাহাদত, ইমাম হাসান (রা)-কে বিষ প্রয়োগ, কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা, মু'আবিয়া ইবনে য়াযীদকে বিষ প্রয়োগ, 'আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র (রা)-এর পতন প্রভৃতি ঘটনার জন্ম দেয়। ইব্‌নে উবাই ও ইবনে সাবার প্রেতাত্মারাই খলীফা সুলায়মানের ঘাড়ে ভর করে কেবলমাত্র মুহাম্মদ বিন কাসিমকেই নয়, তুর্কিস্তান বিজয়ী সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম, আফ্রিকা বিজয়ী সেনাপতি মূসা বিন নুসায়র-পুত্র 'আবদুল 'আযীয ইবনে মূসাকেও হত্যা করায়। মূসা বিন নুসায়র এবং তদীয় সেনাপতি স্পেন বিজয়ী তারিক ইবনে যিয়াদ এ মর্মান্তিক ঘটনায় এমনভাবে মুষড়ে পড়েন যে, অবশিষ্ট জীবন তাঁরা নির্জনতার মাঝে কাটিয়ে দেওয়াকেই শ্রেয় জ্ঞান করেন। বনী উমাইয়ার পরবর্তী বংশধরদের মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম হযরত ওমর ইবনে' আবদু'ল-'আযীয (র)-কে বিষ প্রয়োগ করে যারা ব্যষ্টি ও গোষ্ঠী স্বার্থ নিরাপদ করতে চেয়েছিল তারাও ছিল ইবনে উবাই ও ইবনে সাবারই মানস-সন্তান। সেই থেকে আজকের দিনটি পর্যন্ত যেখানে যত দুষ্কর্ম সাধিত হয়েছে, মুসলিম ইতিহাসের যেখানে যত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তার পেছনে কোন না কোন ইবনে সাবার গোপন হাত সক্রিয় দেখতে পাওয়া যাবে। হাসান আল-বান্না, সায়্যিদ কুত্‌ব শহীদ, মুহাম্মদ ম্যালকম এক্স বাদশাহ ফয়সল প্রমুখের মৃত্যুর পেছনেও তাদেরই অদৃশ্য হাত নিয়োজিত ছিল। ইসলাম ও মুসলিম জাতির অস্তিত্ব আজও তাদের চোখে এক দুঃসহ বিভীষিকা। এরা মুসলমানদের অস্থি-মজ্জা ও শিরা-উপশিরায় মিশে আছে বিধায় ওদের পৃথক করা যায় না। ওরা বহুরূপী—তাই ওদেরকে চেনা যায় না। মার্জারের মত নিঃশব্দ গতি তাদের---তাই ওদের আগমন টের পাওয়া যায় না। ওরা এত সতর্ক যে, কখনো ধরা পড়ার উপক্রম হতেই নিঃশব্দে ও ত্বরিতে সটকে পড়ে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুতে কি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল? হ্যাঁ, হয়েছিল। তাঁর আগমনে উপমহাদেশের বুকে ইসলামের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়ছিল তা এমনভাবে থিতিয়ে গেল যে, পরবর্তীকালে ইসলামের লক্ষ সন্তানের একক ও সম্মিলিত কোন প্রকার চেষ্টা-সাধনাতেই আর সেই জোয়ার সৃষ্টি হয়নি। ভারতের উত্তর ও পশ্চিম

www.almodina.com

সীমান্তের নিপীড়িত মানুষের ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত এই তরুণের অকাল মৃত্যুর মাঝ দিয়ে মুসলিম নামধারী খলীফাদের যে বীভৎস চেহারা তাদের মনে গেঁথে গেল তাতে কোনদিনই আর তারা এদের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ বোধ করেনি। পরবর্তীকালেও মুহাম্মদ বিন কাসিমের যথার্থ কোন উত্তরাধিকারের আগমন না ঘটায় আজও তাঁর স্থান অপূর্ণই থেকে গেল। বর্ণবাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত এই উপমহাদেশের কয়েক কোটি অস্পৃশ্য মানুষ আজও সাধারণ মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। জানি না কবে ইবনে কাসিমের শূন্যস্থান পূরণ হবে আর কবে অধিকার বঞ্চিত এসব আদম সন্তান তাদের অধিকার ফিরে পাবে। সাম্যের ধর্ম, মুক্তির ধর্ম ইসলাম এখনো বিদ্যমান আছে, তবে সে সাম্য শুধু সালাতের কাতারে আর 'ঈদের জামা'আতে। ভাতের থালার সাম্য কৈ? গাছতলার আর পাঁচতলার ব্যবধান ঘুচল কই? ব্যবধান শুধু এখানে যে, এতদিন কচ্ছপ গতিতে অসাম্যের দিকে এগুচ্ছিলাম, আর এখন ধাবিত হচ্ছি খরগোশের ন্যায় লাফিয়ে লাফিয়ে। কে সেই তরুণ যে এ গতিকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবার দুঃসাহস রাখে? মুসলিম জাতির আগামী দিনের নেতৃত্ব তারই অপেক্ষা করছে।

নিরন্তর কর্মব্যস্ততার মাঝে বইটি অনুবাদ করতে হয়। অখণ্ড মনোযোগ দেবার মত সময় হাতে ছিল না। তবুও চেষ্টা করেছি অনুবাদকে যতটা সম্ভব সুখপাঠ্য করে তুলতে। একে সুন্দরতর করে তোলার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন এর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় অগ্রজ-প্রতীম মওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী। প্রশংসা করার মত কিছু থাকলে সেটা তাঁর, আর নিন্দাটুকু আমার। ভবিষ্যৎ সংস্করণ-গুলোকে অধিকতর উন্নত করার চেষ্টা করা যাবে।

প্রকাশনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করায় ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুবাদ বিভাগের পরিচালক জনাব মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, সহকারী পরিচালক অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন ও জনাব আবুল বাশার আখন্দ-এর সংগে আমার যে সম্পর্ক তাতে সাধারণ ধন্যবাদ জানিয়ে সে সম্পর্কের মাঝে কোন ব্যত্যয় ঘটাতে চাই না। এ বই প্রকাশের পেছনে তাঁদের অবদানই সর্বাধিক। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেসের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ যেভাবে তাঁদের

www.almodina.com

দায়িত্ব আনজাম দিয়েছেন সেজন্য তাঁদেরকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। পাণ্ডুলিপির অনেকাংশ কপিকরণে স্নেহভাজন জিল্লুর রহমানের এবং নির্ঘন্ট তৈরীতে আবদুল হান্নান ও সিরাজুল ইসলামের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেয়েছি—এ জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সহকর্মী মোহাম্মদ মোকসেদ প্রুফ দেখার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁকেও আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ পাক সবাইকে নেক বদলা দিন।

—আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

www.almodina.com

নযরানা

আমার আম্মা মুহ্তারিমা হাজিয়া বাদশাহ বেগম
মরহূমা মাগফূরাকে

যাঁর মুহব্বত, তরবিয়ত ও দু'আর বরকতে আমি একজন উত্তম খেলোয়াড় এবং যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞ অশ্বারোহী থেকে একজন দায়িত্বশীল জেনারেল পদে বরিত হই এবং ইসলামের প্রতিরক্ষা ইতিহাস ও ইসলামের সমর-পন্থার উপর একজন লেখক হিসাবে যাঁর ইচ্ছা ও অভিলাষের আমি প্রতিনিধিত্ব করছি।

—আকবর

www.almodina.com

শুক্‌রিয়া

আমি মুফতীয়ে আ'জম মাওলানা মুহাম্মদ শফী', মাওলানা মুহাম্মদ মতীন, খতীব ও নাজিম-ই-'আলা এবং মাওলানা নূর মুহাম্মদ সাহেব—নাজিম, দারুল 'উলূম, করাচী-এর শুকরিয়া আদায় করছি যাঁরা তাঁদের মূল্যবান উপদেশ দ্বারা আমাকে কৃতার্থ করেছেন এবং এ গ্রন্থের উপর পুনরায় চোখ বুলিয়ে আমাকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

—আকবর খান

www.almodina.com

সূচী

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী	পৃষ্ঠা
প্রতিরক্ষার ইতিহাস	২
মুহাম্মদ বিন কাসিমের বুনিয়াদী সমর নীতি	৮
প্রতিরক্ষার অগ্রগতিমূলক ইতিহাস	৯
ইসলাম-পূর্ব আমলে রোমক ফৌজের সংগঠন ও বিন্যাস	১১
ইসলাম-পূর্ব আমলে ইরানী ফৌজের সংহতি-বিন্যাস	১১
ইসলাম-পূর্ব আমলে আরব ফৌজ	১৩
ফৌজী বিন্যাস ও সংগঠনে আঁ-হযরত (সা)-এর নতুন উদ্ভাবন	১৪
মুজাহিদ ভর্তি এবং গণীমতের মাল বন্টন পদ্ধতি	১৫
হযরত ওমর (রা)-এর ফৌজী সংগঠন ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি	১৬
উমাইয়া খিলাফত আমলে ফৌজী সংগঠন	১৭
ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর মুসলিম ফৌজের প্রথম পরাজয় ও তার কারণ	১৮
'আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে মুসলিম ফৌজে শুদ্ধিকরণ	১৮
ফৌজ ভর্তির প্রাথমিক অবস্থা ও তার পদ্ধতি	২০
মুসলিম ফৌজের বেতনভোগী হওয়া	২১
মুসলিম ফৌজের সংখ্যা গণনা	২২
ফৌজী শ্রেণীক্রম ঃ মর্যাদানুসারে	২২
পরিদর্শন	২৪
ফৌজী ছাউনী	২৪
সামরিক পতাকার গুরুত্ব	২৫

www.almodina.com

ফৌজী ব্যাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ২৭
অস্ত্রশস্ত্র ২৮
তীর-ধনুকের ব্যবহার ২৯
সমরশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়ে গড়ে উঠার জন্য মুজাহিদদের প্রতি আঁ-হযরত (সা)-এর অমূল্য বাণী ২৯
অশ্বারোহণ সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা)-এর অমূল্য বাণী ৩০
ভারতীয় তলোয়ার এবং এর নমুনা ৩২
রোমান ও ইরানী তলোয়ার এবং তার নমুনা ৩২
আরবে ব্যবহৃত তলোয়ার এবং তার নমুনা ৩২
মুসলিম ফৌজে তলোয়ারবাজীর মহড়া ও অনুশীলন ৩৩
বিভিন্ন রকমের ভালা ৩৪
ভালা নামকরনের কারণ এবং এর ব্যবহার ৩৫
ঢাল এবং এর প্রয়োজনীয়তা ৩৫
লৌহবর্মের গঠনাকৃতি, ব্যবহার ও তার প্রয়োজনীয়তা ৩৬
খঞ্জরের ব্যবহার ৩৬
কুড়াল ব্যবহার ৩৭
অবরোধ ভেঙ্গে ফেলার যন্ত্রপাতি ৩৭
মিনজানীক ৩৭
দুবাবা এবং তার ব্যবহার ৩৯
কাব্‌শ ৩৯
গ্রীক-অগ্নি ৪০
বারুদের ব্যবহার ৪১
যুদ্ধ-পদ্ধতি এবং আরব ৪১
ক্রুডিস-এর উপর এক নজর ৪৩
ক্রুডিস-এর সংজ্ঞা ৪৩
ইসলামে নৌ-বহর ৪৯
ছাউনি এবং পদ্ধতি ৫২
সংবাদদাতা ৫২
প্রচারক দল ৫৩
ডাক-ব্যবস্থা ৫৩

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিম

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সংক্ষিপ্ত জীবন-পঞ্জী	৫৪
রাজা দাহিরের করদ রাজ্যসমূহ	৬৪
বিখ্যাত কেল্লা	৬৫
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ	৬৫
প্রাকৃতিক বিভাগ	৬৫
আরবের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সিন্ধুর বাণিজ্য শহর	৬৬
ইরাক ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী শাহী সড়ক	৬৭
বিভিন্ন প্রকার জীব-জানোয়ার	৬৭
মৌসুমী আবহাওয়া	৬৭
ভারতীয় ফৌজে সমরাস্ত্র	৬৮
ভারতীয় সৈনিক	৬৮
ভারতীয় সিপাহসালার	৬৮
প্রতিরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি	৬৯
হামলা	৬৯
সিন্ধী ফৌজ	৭০
ফারূকী (রা) খিলাফত আমলে সিন্ধু এলাকার গোয়েন্দা রিপোর্ট	৭০
রাজা দাহিরের রাজ্যের কতিপয় মশহুর শহর	৭১

সিন্ধুর উপর হামলার কারণ

বোম্বাই সমুদ্রোপকূলে হামলা	৭৭
ভারতবর্ষের উপর হামলা	৭৭
সিন্ধু আক্রমণের কারণ	৭৮
রাজা দাহিরের অগ্রাভিযান	৭৯
রাওর কেল্লা	৮০
অভিযানের প্রস্তুতি	৮২
সিন্ধুতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের যুদ্ধ	৮৫
দেবলের উপর হামলা	৯২
দেবল বিজয় ও সন্ধি চুক্তি	৯৪

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিমের নামে রাজা দাহিরের পত্র ৯৫
মুহাম্মদ বিন কাসিমের জওয়াব ৯৬
সহওয়ান অভিমুখে অগ্রাভিযান ৯৭
সিবীর রাজা কাকা ৯৭
সিন্ধুনদের ছাউনী এবং ফৌজের মুকাবিলা ১০৫
রাজা দাহিরের মৃত্যু ১০৮
অগ্রাভিযান ১০৯
বাহমনাবাদের উপর হামলা ১০৯
স্কালিন্দার অভিমুখে অগ্রাভিযান ১০৯
মুলতানের দিকে অগ্রাভিযান এবং মুলতান বিজয় ১১০
মুহাম্মদ বিন কাসিমের রাওর প্রত্যাবর্তন ২১১
মূসা বিন নুসায়র ১১২
মুহাম্মদ বিন কাসিমের গ্রেফতারী ১১২

সংক্ষিপ্তসার

প্রতিরক্ষামূলক শিক্ষা ঃ উত্থাপিত অভিযোগসমূহ এবং এর জওয়াব ১১৩
মুহাম্মদ বিন কাসিমের হামলার ব্যাপারে দ্বিতীয় আপত্তি ১১৫
মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর গৃহীত কর্মপন্থা সঠিক ছিল ১১৫
দেবল বিজয়ের শিক্ষা ১২১
সিবী যুদ্ধের শিক্ষা ১২৬
নীরূন ছাউনী ১২৭
নদী পার ১২৮
জয়পুর যুদ্ধের শিক্ষা ১২৯
শক্তি ও বিজ্ঞান ১৩২
কেবল আত্মরক্ষার তাগিদ ১৩৭
সিপাহসালার এবং তাঁর দায়িত্ব ১৩৯
সেনাপতিকে কোথায় অবস্থান করা উচিত ১৩৯
অটুট সংকল্প ও ধৈর্য ১৪৬
যুদ্ধে সংবাদ আদান-প্রদানের গুরুত্ব ১৪৭

www.almodina.com

গেরিলা যুদ্ধের গুরুত্ব ১৪৭
ম্যাসিনা এবং স্পেনিশ গেরিলা ১৪৮
নেপোলিয়ন এবং রাশিয়ান গেরিলা ১৪৮
গেরিলাদের বিরুদ্ধে তুর্কী ফৌজ ১৪৮
স্পেন এবং গেরিলা ১৪৮
রাশিয়া ও গেরিলা ১৪৯
ওয়াযিরীস্তানের গেরিলা এবং ইণ্ডিয়ান আর্মী ১৪৯
কিভাবে গেরিলা বাহিনীর মুকাবিলা করা যায় ১৫০
জেনারেল টুকার এবং গেরিলা ১৫০
এক্কাজ কিভাবে সম্ভব হ'ল ১৫২
মেহমন্দ এবং ১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ১৫৩
সামরিক গতিবিধির যোগ্যতা ১৫৬
মুহাম্মদ বিন কাসিম কেবলমাত্র অশ্বারোহী বাহিনী কেন—সঙ্গে নিলেন ১৫৭
মন্ত্রীবর্গ এবং প্রতিরক্ষা স্ট্রাটেজী ১৬১

ইসলামের যুদ্ধ-বিধান

আঁ-হযরত (সা)-এর পথ-নির্দেশ ১৬৩
নাজরানবাসীদের সঙ্গে কৃত চুক্তিপত্র ১৬৪
হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশসমূহ ১৬৫
দেবলবাসীদের জন্য হাবীব বিন মাসলামার প্রতিজ্ঞা পত্র ১৬৫
হযরত 'আলী-(রা)-এর দিক-নির্দেশনা ১৬৬

পরিশিষ্ট

মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক ১৮৮
সাধারণ সমর-নীতি ১৮৯
অধিনায়কত্ব ১৮৯
যুদ্ধের মুলনীতি (principle of war) ১৯১
মুহাম্মদ বিন কাসিম, আলেকজাণ্ডার এবং নেপোলিয়ন ১৯৫
নির্ঘন্ট ১৯৯
গ্রন্থ পরিচিতি

www.almodina.com

কেন লিখলাম

এই গ্রন্থ প্রণয়নের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হ'ল, আপনারা যেন প্রত্যক্ষ করতে পারেন ঃ

ক. এই নওজোয়ান ঐ দেশটিকে কিভাবে এবং কেমন করে জয় করলেন---যেখানে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মত য়ুরোপ ও পারস্য বিজয়ী বীরও টিকে থাকতে পারেন নি।

খ. একজন মুসলিম মুজাহিদ কিভাবে বিগড়ে যাওয়া একটি ফৌজকে প্রশিক্ষণ দান করে সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করেন এবং তাকে একটি দুর্ভেদ্য ও অজেয় সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত করেন। হাজ্জাজ বিন য়ুসুফ, যাকে আমাদের ঐতিহাসিকরা নির্দয় ও রক্ত-পিপাসু হিসাবে স্মরণ করেন, তিনি কি আসলেই সেই ব্যবহার পাবার হকদার ছিলেন? পাশ্চাত্যের দেশগুলো কি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তাঁকে অনুকরণ করে নি?

গ. দ্রুতগামী ও বিদ্যুৎগতির অস্ত্রের সাহায্যে চেঙ্গীয খান, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন এবং হিটলার দুনিয়াকে তছনছ করে দিয়েছিলেন, অথচ মুহাম্মাদ বিন কাসিম এই অস্ত্রকেই কত সর্বোত্তম পন্থায় এবং কত নিপুণভাবে ব্যবহার করেছিলেন!

ঘ. প্রতিরক্ষা কৌশল এবং সমরশাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে প্রতিটি জাতীয় নেতা ও প্রতিটি মুসলিমকে কেন অবহিত হওয়া দরকার।

www.almodina.com

www.almodina.com

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

দেখা গেছে যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যা শুধুমাত্র রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা আদর্শগত—তা ফলাফল ও পরিণতির দিক দিয়ে যতই গুরুত্বপূর্ণ ও বিপ্লবাত্মক প্রমাণিত হোক না কেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আকর্ষণীয় হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রচণ্ড উদ্দীপনাময় কার্যাবলী তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দার্শনিক তত্ত্ব বুঝবার জন্য দর্শন বিদ্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং উক্ত বিদ্যা অর্জন ও তাতে পাণ্ডিত্য লাভ করা আবশ্যক। কিন্তু সামরিক ঘটনাবলী এই জন্য চিত্তাকর্ষক হয় যে, সকলেই জানতে চায় যুদ্ধক্ষেত্রে জাতীয় বীরবৃন্দ আত্মোৎসর্গ, বীরত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ কি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য কিভাবে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন! এই সব কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী ও কুরবানীর উপ্যাখ্যান পাঠ করে অন্তরের মাঝে এই মর্মে আবেগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় যেন আমরাও এভাবে আমাদের দেশ ও জাতির কাজে লাগতে পারি।

মজার ব্যাপার এই যে, কাহিনী যতটা লোমহর্ষক, ভয়াবহ ও রক্তাক্ত হয় ততটা হৃদয়গ্রাহী এবং চিত্তাকর্ষকও হয়।

যেহেতু যুদ্ধের কাহিনী হৃদয়গ্রাহী ও আবেগোদ্দীপক হয়ে থাকে সেজন্য এর পাঠকচক্রও বিস্তৃত হয় এবং জাতির প্রতিটি অংশ ও শ্রেণী এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। আজকাল রাষ্ট্রের হেফাজত ও নিরাপত্তার যিম্মাদারী কেবল সেনাবাহিনীর উপরই বর্তায় না, আধুনিক সমরশাস্ত্রের কারণে এতে জাতির প্রতিটি সদস্যই সমান অংশীদার হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রতিরক্ষার প্রেক্ষাপটে প্রতিরক্ষার ইতিহাস অধ্যয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

www.almodina.com

প্রতিরক্ষার ইতিহাস

কিন্তু আমরা যখন প্রতিরক্ষার ইতিহাস অধ্যয়ন করতে শুরু করি তখন অসংখ্য প্রশ্ন সামনে এসে দেখা দেয়। যেমন ঃ

১. কোন দেশের পাহাড় পর্বত, রেল-লাইন, রাস্তা-ঘাট, গিরিপথ, প্রান্তর-ময়দান, বন-জঙ্গল, দুলদুলে স্থান ও নদী-নালা প্রতিরক্ষা স্ট্রাটেজীতে কিরূপ গুরুত্ব রাখে এবং বিজেতার বিজয় এবং পরাজিতের পরাজয়ের উপর ঐ সব প্রতিবন্ধকতা কিংবা সহজ সাধ্যতার (আসানীর) কি প্রভাব পড়ে ?

২. একটি বিশাল সাম্রাজ্যের বিরাট বাহিনী প্রতিপক্ষের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর কাছে কেন পর্যুদস্ত হয় এবং কি সেই রহস্য যা একটি বাহিনীর চলনভঙ্গি (Movement) প্রতিপক্ষের যাবতীয় কূট-কৌশলকে পণ্ড করে দেয় ?

৩. কেন অমুক সিপাহসালার খ্যাতিমান ও প্রশংসাধন্য ?

যিনি ইতিহাসের এই অংশ অধ্যয়ন করেন তিনি এসব প্রশ্ন এবং এ ধরনের আরো অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়ে পারেন না।

এসব প্রশ্নের জওয়াব উপাখ্যান কিংবা কিস্‌সা-কাহিনীতে পাওয়া যাবে না। এজন্য এমন সব বই-পুস্তকের প্রয়োজন যা এসব প্রশ্নের সমাধান দিতে পারে। অবশ্য এই সব গ্রন্থকে নতুন পারিভাষিক জটিলতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে যাতে করে পাঠকের ধ্যান-ধারণা এসব পরিভাষা আয়ত্ত করতে গিয়ে মূল বিষয় থেকে বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে কিংবা সাহিত্যিক ও শৈল্পিক সূক্ষতা ও খুঁটিনাটির আবর্তে জড়িয়ে না পড়ে। এধরনের পরিভাষা প্রণয়ন এবং তার ব্যবহার এ-জাতীয় গ্রন্থ লেখকদের মনোবল দমিয়ে দেয়। কোন জাতি-গোষ্ঠী ততক্ষণ পর্যন্ত বিজয়ী কিংবা খ্যাতিমান হতে পারেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সমর ক্ষেত্রে অবতরণ করে স্বীয় ইতিহাসকে আপন রক্ত-আখঁরে লিখেছে এবং কোন জাতি-গোষ্ঠী ততক্ষণ পর্যন্ত এমনটি করার যোগ্য হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সমর ক্ষেত্রের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং এই অবহিতি প্রতিরক্ষা স্ট্রাটেজী ও সমরশাস্ত্র সম্পর্কে যথাযথ পরিচিতি লাভের পরই কেবল হাসিল হতে পারে।

www.almodina.com

উপমহাদেশের ইতিহাসই ধরুন না কেন! রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ। সে সময় ভারতবর্ষকে গোটা বিশ্বে বুদ্ধিমত্তা, প্রাচুর্য ও সভ্যতার শীর্ষে স্থান দেওয়া হ'ত। তার নিকট তখন আছে অশ্বারোহী বাহিনী, বিরাট হস্তীবাহিনী আর আছে সর্বোত্তম রথযান। তথাপিও সে বিশ্বজয়ীর আসন লাভে সক্ষম হয়নি। প্রশ্ন জাগে, এমনটি কেন হ'ল? ভারতবর্ষের ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের কাহিনী তখন বিশ্বময় লোকের মুখে মুখে ফিরছে। ফলে আলেকজাণ্ডার ভারত অভিমুখী হন যাতে করে উজ্জ্বল এই হীরক খণ্ডটিকে তিনি তাঁর রাজমুকুটের শোভা বর্ধনে ব্যবহার করতে পারেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি কিছু সংখ্যক সেনা সহযোগে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন এবং শেষাবধি রাজা পুরুর সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাঁধে।

পুরুর ছিল বিশাল সেনাবাহিনী। আর ছিল অসংখ্য হাতী, অশ্বারোহী সৈন্য ও লৌহবর্মে আবৃত বীর রাজপুত পদাতিক বাহিনী। তার সমরাস্ত্র শত্রুর মুকাবিলায় সর্বোত্তম না হলেও একেবারে নিকৃষ্টও ছিল না। সাধারণ লোকের মধ্যে বিশেষ করে রাজপুত যুবকদের মধ্যে ত্যাগের সীমাহীন প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল; বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্য তাদের শিরায় শিরায় মিশে ছিল। পুরুষ তো দূরের কথা, তাদের মহিলারাও মৃত্যুকে ভয় পেত না। কিন্তু রণক্ষেত্র যখন উত্তপ্ত হ'ল, দেখা গেল অভিজ্ঞ ও পারদর্শী পুরু যুবক আলেকজাণ্ডারের নিকট পরাজিত হয়েছেন। এমনটি কেন হ'ল? পুরুর পঙ্গপালের ন্যায় বিরাট বাহিনী আলেকজাণ্ডারের মুষ্টিমেয় ও স্বল্প সংখ্যক অশ্বারোহীর নিকট কেন পরাজিত হ'ল? এর কারণ ছিল এই যে, আলেকজাণ্ডার তাঁর শত্রুর দুর্বলতা কোথায় তা আঁচ করে নিয়েছিলেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই নওজোয়ান তাঁর পিতা ফিলিপের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অতি উন্নত মানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি সেনাবাহিনী পেয়েছিলেন। ঐ বাহিনী সংখ্যায় বিরাট বড় ছিল না। কিন্তু ফিলিপ সেটাকে এমনভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন যে, সেই বাহিনীর একটি অংশ যাকে তিনি "রিসালা" (অশ্বারোহী বাহিনী) বলতেন,—এতখানি যোগ্য ও দক্ষ ছিল যে, তা তার সিপাহসালারের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাকে এমন

www.almodina.com

বিদ্যুৎগতিতে বাস্তবায়িত করতে পারত যে, শত্রু তার আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে পারত না। ঐ রিসালার সমর-নৈপুণ্য ছিল সেই তীরের মত যা একজন অভিজ্ঞ তীরন্দাযের হাত দিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে শত্রুর বক্ষ ভেদ করে তাকে চিরতরে খতম করে দেয়। স্থূলদৃষ্টিতে যে সম্পর্ক রয়েছে তীর ও তার নিশানা অর্থাৎ প্রতিপক্ষের দেহের সাথে—ঠিক সেই সম্পর্ক রয়েছে একটি সর্বোত্তম অশ্বারোহী বাহিনী (রিসালা) ও তার প্রতিপক্ষ বাহিনীর সাথে যার উপর এই অশ্বারোহী বাহিনী আপন সুযোগ্য সিপাহসালারের নেতৃত্বে হামলা করে এবং প্রতিপক্ষের কাতার কে কাতার তছনছ করে দেয়। অনন্তরে ঠিক যে মুহূর্তে রাজা পুরুর পদাতিক বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে গ্রীক ফৌজকে পিছু হটতে বাধ্য করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে আলেক-জাণ্ডারের অশ্বারোহী বাহিনী প্রচ্ছন্নভাবে অতর্কিতে নদী পার হয়ে পুরুর বাহিনীর পশ্চাদ্দেশ থেকে তার মধ্যখানে উদিত হয়। এই বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন গ্রীক অশ্বরোহী বাহিনীর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া এই হ'ল যে, পুরুর বাহিনী এর মুকাবিলার তীব্রতা সহ্য করতে পারল না। অন্য কথায়, পুরুর অশ্বারোহী বাহিনী এবং হস্তি বাহিনীকে এমন ট্রেনিং দেওয়া হয়নি যে, তারাও তৎক্ষণাত একত্রিত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের আক্রমণের গতি পরি-বর্তন করতে পারে। পুরুর সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব ন্যস্ত ছিল ঢিলা হাতে। গ্রীক আক্রমণের তীর তাঁর বক্ষে গিয়ে বিধেঁ এবং আলেকজাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত ফৌজ প্রবল ভারতীয় বাহিনীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে দেয়।

এটি এমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যেখানে প্রতিরক্ষা বিষয়ক যোগ্যতাকে সঠিক ও সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আলেকজাণ্ডারের ন্যায় সম্রাট হ্যানিবলও প্রতিরক্ষামূলক যোগ্যতাকে সঠিক এবং কার্যকর পন্থায় ব্যবহার করে রোমক বাহিনীকে ত্রিবিয়া এবং কীনের রণক্ষেত্রে পরাজিত করেন, যদিও রোমকদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বিরাট ও বিপুল এবং তাদের কাছে অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্যও ছিল। এর মুকাবিলায় হ্যানিবলের অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক-চতুর্থাংশের ও কম। এতদসত্ত্বেও

www.almodina.com

হ্যানিবল উক্ত দু'টি যুদ্ধে তার ছোট্ট অশ্বারোহী বাহিনীকে এমনি সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করেন যে, রোমক সৈন্যদের পরাজিত হয়ে পালাতে হয়।

এখন প্রশ্ন জাগে, এতবড় বিজয় লাভের পরও কেন হ্যানিবল রোম জয় করতে পারলেন না? শেষ পর্যন্ত তিনি কেবলমাত্র ব্যর্থ হয়েই ফিরেন নি বরং ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। এমনটি কেন হ'ল? এর কারণ দু'টি ঃ

(ক) হ্যানিবল অতঃপর যথাসময়ে সাহায্যকারী বাহিনী পাঠান নি, আবার যথেষ্ট পরিমাণ সমরাস্ত্র ও রসদ-সম্ভারও পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেন নি। যাও পাঠিয়েছিলেন তা সময়মত পৌঁছে নি।

(খ) হ্যানিবল যেখানে স্বীয় ফৌজের প্রতিরক্ষামূলক যোগ্যতাকে তার প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় সর্বোত্তম করে গড়ে তুলেছিলেন সেখানে তিনি এটা চিন্তা করেন নি যে, তাঁর শেষ লক্ষ্যস্থল কি এবং এর পাথেয় কি হওয়া উচিত।

তাঁর শেষ লক্ষ্যস্থল ছিল রোমের কেল্লাগুলো জয় করা। কিন্তু সে গুলো জয় করার জন্য তাঁর নিকট সমরাস্ত্রের ঘাটতি ছিল। অন্য কথায় তিনি পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নি এবং সমর-শাস্ত্রের আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেন নি বিধায় তাঁকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছে।

উল্লিখিত যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনার পিছনে আমার উদ্দেশ্য এই যে, যখন রাষ্ট্র, জনসাধারণ কিংবা সিপাহসালার বিস্তারিত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাকে তাড়াহুড়ো কিংবা স্থূলদৃষ্টিতে দেখে তখন তাদেরকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়।

১৯১৪ ঈসায়ীতে জার্মানী যখন ফ্রান্সের উপর হামলার ইচ্ছা করল তখন জার্মান সম্রাট কাইজারের সিপাহসালার জেনারেল মলিটিকের জন্য বিরাট ও উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী সরবরাহ করা হয়। কিন্তু জার্মানীর সমর পর্যালোচকগণ সূক্ষ্ম-দৃষ্টি দিয়ে অনেকগুলো দিকের উপর চিন্তা-ভাবনা করলেও এই বিরাট ও বিশাল বাহিনীর প্রতিরক্ষামূলক গতিবিধির গুরুত্বের প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দেন নি। বিশেষ করে তাঁরা এটি চিন্তা

www.almodina.com

করে দেখেন নি যে, যদি যুদ্ধক্ষেত্র প্রাকৃতিক অথবা অন্যবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে দু'টো মোর্চাতেই ছড়িয়ে পড়ে এবং শত্রুর ডান ও বাম পার্শ্বের উপর হামলা করে তাকে তার মোর্চা থেকে বহিষ্কার করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে তখন জার্মান সেনাপতিকে কি করতে হবে? এই ভ্রান্তির পরিণাম এই হ'ল যে, যখন মিত্র-বাহিনী মোর্চা বন্দী করে তাকে থামিয়ে দিল তখন তারা অঘোরে জীবন দিতে শুরু করে। এত মূল্যবান জীবন কুরবানী তারা বেশীক্ষণ দিতে পারে নি (আর তা দেওয়াও সম্ভব নয়) বিধায়, তারা শেষ পর্যন্ত থেমে পড়ে।

মিত্রশক্তিও জার্মানদের এই সমরশাস্ত্র ও রণনীতির প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে না দেখেই এর পুনরাবৃত্তি করে। ফলে মিত্রশক্তিকেও সীমাহীন জীবনহানির সম্মুখীন হতে হয়। যেহেতু জার্মানী (মিত্রশক্তির তুলনায়) একটি ছোট্ট দেশ, সে জন্য সে বেশীক্ষণ কুরবানী দিতে পারেনি! তাই শেষ পর্যন্ত সে অবসন্ন ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

যেহেতু জার্মানী ছাড়া সারা বিশ্বের প্রতিরক্ষা পর্যালোচকগণ শেষ বিজয়ের নেশায় ছিলেন মত্ত, সেহেতু তারা বিশ্বযুদ্ধের পর এই ভুল তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন যে, আগামী যুদ্ধগুলো মোর্চার আড়াল নিয়েই লড়া হবে এবং এভাবে কয়েক বছরের সামরিক দীর্ঘ-সূত্রিতা তথা দীর্ঘ দিন যাবত পরিচালিত যুদ্ধের কারণে যে রাষ্ট্রের নিকট সমর-সম্ভার কম হবে স্বভাবতই সে হেরে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এবারও অবস্থার সঠিক পরিমাপ করতে ব্যর্থ হন। ফ্রান্স মেজিনিউ লাইন বানায়। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড মোর্চাবন্দীতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। কিন্তু ১৯৩৯ ঈসায়ীতে জার্মানী যেহেতু পূর্বকৃত ভুল ধরতে পেরেছিল তাই সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার সংস্কারিত ও পরিশুদ্ধ নমুনা-মাফিক খুবই সাফল্যের সঙ্গে লড়ে। যদি মিত্রশক্তিও এই যুদ্ধের সঠিক ফলাফল অনুধাবন করতে পারত তাহলে তারা দেখতে পেত যে, জার্মানীর ১৯১৪-১৮ ঈসায়ীর হামলা ছিল সম্রাট হ্যানিবল অথবা অন্য কোন আক্রমণকারীর সেই হামলা মাফিক যে মেঠো জেতা তো জিতেছে, কিন্তু মযবুত দুর্গ-প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবার মত যথেষ্ট সমর-সম্ভার যার ছিল না। যেখানে অতীতে

www.almodina.com

ভারতবাসী হাতির সাহায্যে দুর্গ ভাঙত সেখানে আরবীরা ভাঙত মিনজানীক নামক প্রস্তর নিক্ষেপকারী কামান দ্বারা। জার্মানী ১৯৪০ ঈসায়ীতে ট্যাংক নির্মাণ করে। এর আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক যদিও বৃটেন, কিন্তু সে এই মা'সূম বাচ্চাকে জার্মানীর হাতে বিক্রয় করে দেয় এবং জার্মানী একে দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরে ব্যবহার করে। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রতিরক্ষা কৌশলের মূলনীতি যথার্থই প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ—

১. লড়াই সাধারণত একটি বড় এলাকায় হয়ে থাকে যেখানে সৈন্যদল সুদৃঢ় কেল্লা এবং মোর্চা ইত্যাদির উপর হামলা করে। তখন যে ফৌজ প্রতিরক্ষামূলক গতিবিধির যোগ্যতাকে যথারীতি কায়েম রাখে তারাই প্রতিপক্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। ১৯১৪-১৮ ঈসায়ীর লড়াই থেকে সাধারণত প্রতিরক্ষা পর্যালোচকগণ এজন্য ভুল শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন যে, শেষ বছরগুলোতে বিশ্বযুদ্ধ একটি কেল্লা ধ্বংসকারী লড়াইয়ের রূপ নিয়েছিল। আর যখন মিত্রশক্তির ফৌজ ট্যাংক, তোপখানা ও বিমান বহরের সাহায্যে জার্মানীর ফৌজী শক্তিকে দুর্বল করে দিয়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে তখনই তারা সম্মুখ পানে এগিয়ে যায়। এরপরও এই সব প্রতিরক্ষা পর্যালোচকগণ সঠিক সিদ্ধান্ত উদ্ভাবনে ব্যর্থ হন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের ময়দানে হুশিয়ার ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী সিপাহসালার স্বীয় শত্রু মোর্চার উপর হামলা করবার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন এবং প্রতিপক্ষের দুর্বল অংশের উপর কার্যকর আঘাত হেনে তাকে পেছপা করতে পারেন।

২. যে ফৌজের সিপাহসালার শত্রু ফৌজের মুকাবিলায় উত্তম গতিবিধির যোগ্যতা হাসিল করেন অর্থাৎ যিনি আপন গতিশীল ও সচল ফৌজকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে গিয়ে শত্রুর উপর প্রচণ্ড বেগে ও পূর্ণ শক্তিতে হামলা করতে পারেন—বিজয় ও সাফল্য তাঁরই পদচুম্বন করে।

যে ফৌজ সচল ও সক্রিয়—ট্যাংক, মোটর, অশ্বারোহী বাহিনী, বিমান এবং অন্যান্য সমরাস্ত্র---যেমন তোপখানা, এটম বোম ইত্যাদি যার অন্তর্ভুক্ত এবং এই সব সমরাস্ত্রের সঠিক ব্যবহার

www.almodina.com

যে জানে, সাফল্য সাধারণত তাদেরই সাথী হয়। কেননা এই সব সমরাস্ত্র আক্রমণের পথে প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে এবং কেল্লা দখল করার কাজে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবে শত্রুকে সচল ও সক্রিয় থেকে অচল ও নিষ্ক্রিয় করা যেতে পারে এবং তার সাহস ও মনোবল দুর্বল করা যেতে পারে।

এখন অমি আপনাদের সামনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কয়েকটি যুদ্ধ তুলে ধরব যাতে করে আমরা ঐ সুযোগ্য ও সফল জেনারেলের সমর কৌশল বুঝিয়ে দিয়ে সমরশাস্ত্রের মূলনীতির গুরুত্ব সঠিকভাবে উদ্ভাসিত করতে পারি।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের বুনিয়াদী সমরনীতি

মুহাম্মদ বিন কাসিমকে আপনারা গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে অবশ্যই জানেন। কিন্তু এখন আমরা এই যোগ্যতম জেনারেলকে তাঁর আসল রূপে পেশ করছি যাতে তাঁর প্রদর্শিত সামরিক কলা-কৌশল ও কর্মপন্থা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। আমরা এই গ্রন্থে আপনাকে পারিভাষিক জটিলতার মধ্যে জড়াব না, বরং আমরা আমাদের দাবীকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণ করব এবং এভাবে সেই প্রতিরক্ষাগত শিক্ষা আপনার মস্তিষ্কে গেঁথে দেব যা ঐ সব ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের জীবনী পাঠে আপনি অনুভব করবেন যে, সমরশাস্ত্রের এই অভিজ্ঞ জেনারেল প্রতিরক্ষা বিষয়ক নীতি বাস্তবায়নে কারো মুখাপেক্ষী হন নি, বরং অত্যন্ত নির্ভীক ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে একক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে শত্রুর প্রতিরক্ষা কূটচাল ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তিনি স্বীয় বাহিনী নিয়ে সেই স্থানেই পৌঁছেছেন যে স্থান সম্পর্কে শত্রুর ধারণা ছিল যে, আরব বাহিনীর পক্ষে সেখানে পৌঁছা মোটেই সম্ভব নয়।

সমরশাস্ত্রের এই মূলনীতিকে এই অটুট মনোবলসম্পন্ন, নির্ভীক ও যোগ্য সিপাহসালার শত্রুর নৈতিক দুর্বলতা কিংবা ভীরুতার কারণে নতুন রূপে ও নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজিয়েছেন।

www.almodina.com

প্রতিরক্ষার অগ্রগতিমূলক ইতিহাস

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সর্বাগ্রে ফিরআওন নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন করেন। এ প্রায় খৃস্ট-পূর্ব বিশ শতাব্দীর আগের ঘটনা। ফিরআওন স্বীয় মিসরীয় ফৌজ (যা প্রধানত যঙ্গী ও হাবশী সেনা নিয়ে গঠিত ছিল)-এর সাহায্যে প্রথমে লোহিত সাগর উপকূলে অবস্থানরত জাতি-গোষ্ঠীকে পদানত করেন। অতঃপর আসিরিয়, ব্যাবিলনীয় ফিনিকীয়, গ্রীস প্রভৃতি দেশের সরকার-গুলোকে পরাস্ত করে আপন আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।

প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ঐসব ফৌজী সিপাহীকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সোজা পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত। প্রথম কাতারের পর দ্বিতীয় কাতার, অতঃপর তৃতীয় ও চতুর্থ কাতার। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্ভবত তাই ছিল যা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কার্যকর। অর্থাৎ সশস্ত্র লোকদের একটি দেওয়াল খাড়া করে দেওয়া হ'ত যা শত্রুর হামলার সময় একটি লৌহ প্রাচীরের কাজ দিত। এর ভেতর দিয়ে শত্রুর পদাতিক কিংবা অশ্বারোহী বাহিনী প্রবেশ করে একে ছিন্ন ভিন্ন করতে পারত না। যুদ্ধের সময় এই ফৌজ আক্রমণ ও পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হ'ত। তারা সড়ক ঢালাইকারী ইঞ্জিনের ন্যায় শত্রু সৈন্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সম্মুখে অগ্রসর হ'ত। শত্রু সৈন্যের প্রতিরোধকে যখন এভাবে পিষে ফেলা হ'ত তখন ময়দানও পরিষ্কার হয়ে যেত। সেই যুগের ফৌজ ছিল অধিকাংশই পদাতিক; অধিনায়ক কেবল আরোহী হতেন। অবশ্য সেই যোদ্ধাও আরোহী হতেন যিনি ঘোড়া, রথ, হাতী অথবা উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করে শত্রু ফৌজের শৃংখলা বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট করার কাজে নিয়োজিত থাকতেন তখন একটি পদাতিক বাহিনীতে সাধারণত চার হাযার সৈন্য থাকত।

মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপস্ (Philips) তাঁর ফৌজকে নতুন প্রশিক্ষণ দেন। তিনি পদাতিক ফৌজের ছোট ছোট রেজিমেন্ট-গুলোকে ছোট ছোট অধিনায়কদের নেতৃত্বে দিয়ে দেন। পদাতিক বাহিনীর একটি রেজিমেন্টে ছয় হাযার সৈন্য থাকত। ফিলিপ্স্

www.almodina.com

পুত্র আলেকজাণ্ডার পদাতিক বাহিনীর এই সংখ্যা বাড়িয়ে বার হাযারে উন্নীত করেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে লড়বার জন্য আলেকজাণ্ডার পদাতিক বাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যে, প্রথম কাতারের সৈন্যরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘন নিবিড় হয়ে থাকত। প্রতিটি জওয়ানের নিকট ছ'ফুটের মত লম্বা ভালা থাকত যার মস্তক সংলগ্ন থাকত লৌহ-শলাকা নির্মিত অস্ত্র।

দ্বিতীয় কাতারের সিপাহীদের নিকট পয়লা কাতারের সিপাহী-দের চাইতে অধিকতর লম্বা ভালা থাকত, যা পয়লা কাতারের লোক-দের কাঁধের উপর দিয়ে সামনে বের হয়ে থাকত। এভাবেই তৃতীয় কাতারের ভালা পয়লা এবং দ্বিতীয় কাতারের সিপাহীদের ভালার চাইতে অধিকতর লম্বা হ'ত। শেষ কাতারের সিপাহীদের নিকট যে বল্লম থাকত তা প্রায় চব্বিশ ফুট লম্বা হ'ত। এভাবে আলেকজাণ্ডার তাঁর বাহিনীকে এমন একটি লৌহ প্রাচীররূপে খাড়া করতেন যা সচল হয়ে আগেও অগ্রসর হ'তে পারত। এটা ছিল বল্লমের এমন একটি জঙ্গল যার ভেতর দিয়ে মানুষ কিংবা অন্য কোন পশুর পক্ষে অতিক্রম করাটা ছিল প্রায় অসম্ভব।

এতদ্ভিন্ন ফিলিপ্‌স আরোহী বাহিনী অর্থাৎ রিসালা তৈরী করেন যারা পৃথকভাবে নয় বরং সংঘবদ্ধভাবে শত্রুর উপর হামলা করতে পারত। এটাই ছিল সেই হাতিয়ার যার সাহায্যে আলেক-জাণ্ডার ভারতবর্ষের রাজা পুরুকে পরাজিত করেন। তিনি লৌহবেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত এই হিন্দু রাজার হাতী, রথ, ঘোড়া ও বলদসমূহের ঘেরাওকে ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিয়েছিলেন। যদি পুরু তাঁর ফৌজের পশ্চাদ্ভাগকেও সুরক্ষিত করতেন এবং তাঁর হাতী ও রথকে হামলার পর অথবা হামলাকালীন সময়ে নতুন নতুন দিক-অভিমুখে ঘুরাবার ব্যবস্থা রাখতেন তাহলে আলেক-জাণ্ডার কি বিজয়ী হতে পারতেন? এটি এমন একটি প্রশ্ন যার জওয়াব বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর অকাট্য 'না' ছাড়া আর কিছুই হবে না।

ফিলিপ্‌সই 'মিনজানীক' আবিষ্কার করেছিলেন।

www.almodina.com

ইসলাম-পূর্ব আমলে রোমক ফৌজের সংগঠন ও বিন্যাস

গ্রীকদের পর যখন রোমকরা ক্ষমতা লাভ করল তখন তারা পদাতিক বাহিনীর কাতার এভাবে বিন্যস্ত করেন ঃ

(ক) প্রথম কাতারে তারা যুবক ও তরুণদের এনে দাঁড় করান।

(খ) দ্বিতীয় কাতারে এমন সব লোক এনে দাঁড় করান যাদেরকে আমরা অর্ধ-বয়সী বলতে পারি তা বয়সের বিচারে হোক অথবা— অভিজ্ঞতার দিক দিয়েই হোক।

(গ) তৃতীয় কাতারে তারা সমর কুশলী ও রণনিপুণ বীরদের-কে এনে দাঁড় করান।

এই বিন্যাসের দ্বারা সম্ভবত তাদের এই অভিপ্রায় ছিল যে, অভিজ্ঞ সিপাহী যুবকদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। তাছাড়া অনভিজ্ঞ তরুণ সিপাহীরা ঘাবড়ে গিয়ে কিংবা রক্তপাত ও হানাহানির ভীতিকর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের সুযোগ পাবে না।

পদাতিক বাহিনীর সামনে আরোহী বাহিনী থাকত। তাদের নিকট হাতিয়ার হিসাবে থাকত তলোয়ার ও বল্লম। এই পদাতিক বাহিনী গোটা পল্টনের মুহাফিজ (রক্ষক) হ'ত।

ইসলাম-পূর্ব আমলে ইরানী ফৌজের সংহতি বিন্যাস

ইরানী ফৌজের বিন্যাসও প্রায় এমনটিই হ'ত। ইসলামের সূচনা-পর্বের কিছুকাল পূর্বে ইরানী ও রোমকরা নিজ নিজ ফৌজকে বিভিন্ন রেজিমেন্টে ভাগ করেছিল। একটি রেজিমেন্ট-এর সৈন্য সংখ্যা হ'ত দশ থেকে বার হাযার। রোমক রেজিমেন্টের অধি-নায়ককে বলা হ'ত "বাৎরীক"। বাৎরীকের অধীনে দু'জন অধিনায়ক "তুমার খান" নামে আভহিত হতেন এবং প্রতি তুমার খানের অধীনে পাঁচ হাযার সিপাহী এবং পাঁচ জন "তুনজারিয়া" থাকতেন। প্রতি তুনজারিয়া এবং "কূস" দু'শ পদাতিক সৈন্য-বিশিষ্ট হতেন। কূসের অধীনে চারজন "কুমতারাহ" এবং কুম-

www.almodina.com

তারাহ্‌র অধীনে কয়েকজন "দামরাখ" থাকতেন। প্রতি দামরাখের অধীনে থাকত দশজন সৈনিক।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাপনায় একটি বাহিনী একক থাকার পরিবর্তে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। কেননা প্রতিটি খণ্ড নিজ নিজ অধিনায়কের অধীনেই লড়াই করত।

রোমকরা গ্রীকদের অনুকরণ করে আরোহী বাহিনীকে একটি আলাদা বাহিনী হিসাবেই রাখে। কিন্তু তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে আরোহী বাহিনীকে পদাতিক বাহিনীর সামনে এনে দাঁড় করায় যাতে এরা পদাতিক বাহিনীর দেখাশুনা করতে পারে। ইরানীরা সূচনাকালে তাদের ফৌজকে এভাবে বিন্যস্ত করে যে, প্রতিটি রেজিমেন্টের সিপাহসালারকে---যিনি আমীর শ্রেণীর হতেন, "মীর-ই-মীরান" নামে ডাকা হ'ত।

মীর-ই-মীরানের অধীনে চারজন অফিসার থাকতেন যাকে "আস্পাহাদ" বলা হ'ত। আস্পাহাদের অধীনে চারজন "মারযুবান" থাকতেন এবং প্রত্যেক মারযুবানের অধীনে থাকতেন চারজন অধিনায়ক আর প্রত্যেক অধিনায়কের অধীনে আরোহী বাহিনীর দশজন ও পদাতিক বাহিনীর পাঁচজন সৈনিক থাকতেন। তাদের হাতিয়ার ছিল তলোয়ার, নেযা, বল্লম, মিনজানীক এবং তীর। রোম এবং ইরানে নিয়ম ছিল যে, বৎসরে একবার নির্দিষ্ট সময়ে সকল ফৌজ বাদশাহ কিংবা সর্বাধিনায়কের সম্মুখ দিয়ে এভাবে অতিক্রম করতেন যে, সর্বাগ্রে সর্বাধিনায়ক সওয়ার হতেন। তাঁর পাশাপাশি একজন ক্রীতদাস থাকত। সর্দার তাঁর যেরা, খোদ, দস্তানা, চার আয়না এবং জওশন পরিহিত থাকতেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে লৌহ চাদর যেরার ন্যায় পড়ে থাকত। একে "বরকিস্তাওয়ান" বলা হ'ত। সর্দারের পর তাঁর ফৌজ সকল প্রকার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাস্তা অতিক্রম করত। আরোহী বাহিনীর সৈনিকের থাকত ঢাল, নেযা, গুর্য, রশি, তুবরা, লৌহ নির্মিত মিনজানীক, বাগডোর (ঘোড়া বাঁধবার জন্য), নাগের থলি, সূচ, কাঁচি, হাতুড়ী (ঘোড়ার পায়ে নাল মার জন্য), কাড়, লুবনা সওয়া, তূণীর, কম্বল (মুড়ি দেবার জন্য), চড়ানো কামান এবং দুটো

www.almodina.com

ফালতু কামান। প্রতিটি আরোহীর ক্রীতদাসের নিকট একটি ফালতু তূণীর থাকত। এই প্রদর্শনী থেকে জানা যেত, আরোহী, অধিনায়ক এবং তাদের ক্রীতদাসের নিকট সাজ-সরঞ্জাম সঠিক অবস্থায় আছে কি না।

এই সব অবস্থা বর্ণনা করার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, যদিও ভারতীয় ও ইরানীদের বন্ধুত্ব অনেক কাল অটুট ছিল, কিন্তু ভারতীয় ফৌজের নিয়ম-শৃংখলার উপর ইরানী ফৌজের শাসন-শৃঙখলার গভীর প্রভাব পড়েনি---যদিও সমরাস্ত্র নির্মাণে ভারতীয়রা অনেক অগ্রসর ছিল। ভারতীয় ফৌজ স্বীয় ভূখণ্ড থেকে বহির্গত হয়ে বহিঃরাষ্ট্রের উপর আক্রমণোদ্যত হয়নি বিধায় তারা অপরের সমরশাস্ত্র অনুধাবন করবার কষ্ট স্বীকারে যেমন রাযী হয়নি, তেমনি তাদের বন্ধুত্ব থেকে উপকৃত হতেও চেষ্টা করেনি--- এমতাবস্থায় যে, কয়েকজন রাজার দরবারে ইরানী ও আরব বংশোদ্ভূত লোকেরা অধিনায়ক পদে চাকুরীও করত।

ইসলাম-পূর্ব আমলে আরব ফৌজ

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাতি বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। তাদের কোন নিয়মিত সেনাবাহিনী ছিল না। কখনো যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দিলে গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ হাতিয়ার এবং যার যার সওয়ারীসহ যুদ্ধ করবার জন্য বেরিয়ে পড়ত। খোলা ময়দানই হ'ত তাদের যুদ্ধক্ষেত্র। আর যে গোত্রের নিকট ভাল ঘোড়া কিংবা উষ্ট্রারোহী ও যোদ্ধা অধিক সংখ্যায় থাকত সেই গোত্রই অন্যদের উপর প্রধান্য বিস্তার করত। অশ্বারোহী সৈন্যের নিকট তলোয়ার, বল্লম, তীর ধনুক ইত্যাদি অস্ত্র থাকত।

অবশ্য আরবদের কতিপয় পরিবার যারা ইরান সীমান্তে বসতি স্থাপন করেছিল---তারা বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করে নিয়ে ছিল। তারা ছিল 'তুব্বা'-র বাদশাহ হামীর গোত্রের রঈসকুল এবং "মুনযির" সুলতানগণ। মুনযির গোত্রের বাদশাহদের রাজধানী ছিল "হীরা"।

www.almodina.com

মরুবাসী আরবদের সমর-পদ্ধতি ছিল একই ধরনের অর্থাৎ অতর্কিতে হামলা করা কিংবা রাত্রিকালে আকস্মিকভাবে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। এতে যদি তাৎক্ষণিক জয়লাভ ঘটে যায় তাহলে লুটপাট করে নিজ আবাস স্থলে ফিরে আসা। অন্যথায় দুই একটা সংঘর্ষের পরই উভয়পক্ষ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যেত। যুদ্ধের প্রথম অথবা দ্বিতীয় দিন উভয় পক্ষের ফৌজ যখন সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যেত তখন যুদ্ধক্ষেত্রকে উত্তপ্ত করে তোলার জন্য দু'পক্ষের এক একজন দুঃসাহসী আরোহী কিংবা পদাতিক সৈনিক নিজ নিজ প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য চীৎকার করে আহ্বান জানাত। এই যুদ্ধ চলাকালে উভয় ফৌজই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে এ দু'জনের রণনৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করত। এদের একজন নিহত হবার পর তার বাহিনীর অন্য কেউ নিহতের বদলা নেবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হ'ত। কোন সময় এমনও হ'ত যে, যখন এক পক্ষের ফৌজ দেখতে পেত যে, তাদের বীরযোদ্ধা পরাভূত হতে চলেছে তখন তাদের গোটা ফৌজ কিংবা তার কিছু অংশ প্রতিপক্ষের উপর হামলা করে বসত। কখনো এমন হ'ত যে, একজন নামকরা সর্দার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মারা যাবার পর তার ফৌজ হার মেনে পালিয়ে যেত। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) শত্রুর উপর ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্য প্রায়ই শত্রুর নামকরা সর্দারকে স্বীয় যোগ্য ও বীর অশ্বারোহী সৈনিকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লাগিয়ে পরপারে পাঠিয়ে দিতেন। কয়েক-বার তিনি নিজেও দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতরণ করেছেন।

ফৌজী বিন্যাস ও সংগঠনে আঁ-হযরত (সা)-এর নতুন উদ্ভাবন

আঁ-হযরত (সা) মুজাহিদদেরকে নতুনভাবে প্রশিক্ষণ দান করেন। তিনি তাদেরকে শুধু সমরাস্ত্র ব্যবহার করার ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ করে তোলেন নি, বরং রাত দিন চলে সাধারণ সড়ক পথ কিংবা দূরতি-ক্রম্য রাস্তা দ্রুততার সঙ্গে পার হবার যোগ্যও বানিয়ে দেন। তিনি ফৌজী রেজিমেন্টকে নিজ অধিনায়কের নেতৃত্বাধীনে বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে লড়ার কৌশল শিক্ষা দেন। তিনি ফৌজের

www.almodina.com

চলাচল ও গতি-বিধিকে (শান্তিকালীন কিংবা যুদ্ধকালীন যে কোন সময়েই হোক) এমনি সুশৃঙখল বানিয়ে দেন যে, মুসলিম ফৌজ তাদের সিপাহসালারের মৌখিক নির্দেশ কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে বিভিন্ন ধরনের ফৌজী কূটচাল মাফিক সুশৃঙখল ও ঐক্যবদ্ধভাবে চলাচল করতে পারত।

তিনি মুজাহিদদেরকে ছোট-বড় কোম্পানী ও প্লাটুনে ভাগ করেন। অতঃপর এইসব ছোট ছোট প্লাটুনকে মিলিত করে এমনভাবে একাত্ম করেন যে, যুদ্ধ অথবা শান্তিকালীন সময়ে তারা নিয়ম-শৃঙখলার সাথেই জীবন যাপন করত। যখন মুজাহিদবৃন্দ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র জন্য জমায়েত হ'ত তখন রসূল (সা) (অতঃপর খুলাফায়ে রাশেদীনও) এই জমায়েত পরিদর্শন করতেন। দুর্বল ও অল্পবয়স্ক মুজাহিদকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত। বাকী যারা থাকত তাদেরকে নিয়ম-কানুন ও শৃঙখলা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'ত। যুদ্ধের অনুশীলন ধারাবাহিকভাবে করানো হ'ত। কেবল সেই দিনই নয় বরং ছাউনী থেকে যাত্রা শুরু করার পরও শত্রুর মুকাবিলায় ও সংঘর্ষকালীন সময় এই প্রশিক্ষণ ধারা অব্যাহত থাকত। যখনই মওকা মিলত---যুদ্ধক্ষেত্রেও সমস্ত মুজাহিদকে বরাবরের ন্যায় সামরিক নির্দেশাদি প্রদান করা হ'ত।

মুজাহিদ ভর্তি এবং গণীমতের মাল বণ্টন পদ্ধতি

মুসলমানদের সর্বপ্রথম সিপাহী (মুজাহিদ) ছিলেন মুহাজির-গণ। কিন্তু মদীনায় আগমনের পর অনেক আনসার এতে শামিল হন। পরবর্তীকালে মক্কা বিজয় পর্যন্ত অধিক সংখ্যক মুজাহিদই ছিলেন মদীনার অধিবাসী। অতঃপর বিভিন্ন গোত্রের সাহাবী (রা) এবং নও-মুসলিম জিহাদের উদ্দেশ্যে ইসলামী পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। আঁ-হযরত (সা) স্বয়ং এই ফৌজের নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর অধীনে বিভিন্ন সেনানায়ক থাকতেন। আঁ-হযরত (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শত্রু বাহিনীর সংখ্যা বাড়ল তখন মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যাও বাড়ানো হ'ল। এই সব মুজাহিদকে রসূল (সা) আপন আপন গোত্র ও পরিবার অনুযায়ী ভাগ করে দেন। তখনো কোন নিয়মিত

www.almodina.com

বাহিনী ছিল না। যখন প্রয়োজন দেখা দিত তখন রসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীন মসজিদে খুতবা প্রদানের মাধ্যমে জিহাদের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করতেন। এদের কোন বেতন কিংবা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'ত না, শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও বেহেশ্ত লাভের সুসংবাদ দেওয়া হ'ত। অবশ্য জয়লাভের পর গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বিশেষ মূলনীতির ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বন্টন করা হ'ত। এ ছিল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ; ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধন কিংবা লাভা-লাভের প্রশ্ন এর সাথে কখনো জড়িত ছিলনা। বংশ ও গোত্র অনুসারে বাহিনীকে ভাগ করে দেওয়া হ'ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বনী উমাইয়া আমলে বসরার সেনাদলের পাঁচটি ভাগ ছিল যাকে 'খুম্মাস' বলা হ'ত। প্রতিটি ভাগের ($\frac{১}{৫}$ অংশ) মধ্যে একটি গোত্র নিম্নলিখিত গোত্রগুলোর মধ্য থেকে হ'ত ঃ

ইয্দ, তামীম, বকর, 'আবদুল কায়স, আহ্ল-ই-আলিয়া (অর্থাৎ কিনানা, কুরায়শ, ইয্দ, সুজায়লা, খাছআম, কায়স, আয়লানের সকল পরিবার, মুযায়না)। কূফার অধিবাসীদেরকে আহ্ল-ই-মদীনা বলা হ'ত। অবশ্য সকল অবস্থায় আরোহী এবং পদাতিক বাহিনী আলাদা আলাদা হ'ত। এসব আরোহী ও পদাতিক বাহিনীকে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হ'ত না।

প্রতিটি এক-পঞ্চমাংশের উপর এই সব গোত্রের আমীর-উমারা থেকে একজনকে আমীর বা সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হ'ত। এই পন্থা গোটা বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। বাহিনীর অধিনায়ক পদে সাধারণত সাহাবা কিংবা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কাউকে মনোনীত করা হ'ত।

হযরত উমর (রা)-এর ফৌজী সংগঠন ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে সবুজ শ্যামল এলাকা অবধি ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হলে আমীরুল-মু'মিনীন ঘোষণা দেন যে, বিজিত এলাকায় মুজাহিদরা কৃষিকর্মে লিপ্ত হবে না, জায়গা-জমিও খরিদ করবে না এবং স্থায়ীভাবে

www.almodina.com

বসবাসও করবে না। কেননা এতে তারা আরামপ্রিয় ও সুবিধা-ভোগী হয়ে উঠবে। অবশ্য জীবিকার প্রয়োজন সম্মুখে রেখে তিনি এই ঘোষণাও দেন যে, প্রতিটি আমীর ও সিপাহী এবং তাদের সন্তানদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেওয়া হ'ল। এটাও একটা বিখ্যাত ঘটনা যে, হযরত উমর (রা) ইরাক থেকে প্রত্যাবর্তন-কালে এই মর্মে নির্দেশ জারী করেছিলেন যে, মুসলিম ফৌজকে সেখান থেকে এমন এক জায়গায় স্থানান্তরিত করা হোক যেখান-কার মৌসুম ও পরিবেশ হেজাযের অনুরূপ। স্থানটি ছিল কূফা। পরবর্তীকালে কূফা ফৌজী ক্যাম্প থেকে সৈন্য ছাউনি এবং সৈন্য ছাউনি থেকে বিরাট বড় শহর, অতঃপর দারুল-খুলাফা বা রাজধানীতে পরিণত হয়।

উমাইয়া খিলাফত আমলে ফৌজী সংগঠন

হযরত উমর (রা) ফৌজকে একটি আলাদা জামা'আতে সংগঠিত করতে শুরু করেন। এতদুদ্দেশ্যে আলাদা দফতর খোলা হয়। বনী উমাইয়া যুগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের হাতে এর পূর্ণতা-প্রাপ্তি ঘটে। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সৈনিক বৃত্তি 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্'রই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উমাইয়াদের খিলাফত আমলে দু'ধরনের সৈনিক ছিল। যেমন,

১. মুজাহিদ বা ফী সাবিলিল্লাহ জিহাদকারী। এধরনের মুজাহিদের সংখ্যা সাধারণত মোট সংখ্যার অর্ধেকের বেশী হ'ত। এরা আরবের অধিবাসী হ'ত এবং সাধারণত বনী কাহতান কিংবা শ্যামানের আরব অথবা বনী আদনান (এরা মিসরের অধিবাসী) হিসাবে পরিচিত হ'ত।

২. বেতন-ভোগী অর্থাৎ জায়গীদার কর্তৃক নিযুক্ত বাহিনী। জায়গীরদাররা ছিলেন সেই সব মুসলমান যারা উমাইয়া খলীফা-দের মদদগার ছিলেন। তারা তাদের খিদমতের বিনিময়ে বিভিন্ন ধরনের ইনাম পেতেন। জায়গীরদার তাদের বাহিনীর যাবতীয় ব্যয় নিজেরাই বহন করতেন। সাধারণত গোলাম ও দাসদের সমন্বয়ে তারা নিজেদের বাহিনী গড়ে তুলতেন।

www.almodina.com

ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর মুসলিম ফৌজের প্রথম পরাজয় এবং তার কারণ

আমীর মু'আবিয়া (রা) সুকৌশলে জিহাদী আবেগ-উদ্দীপনা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীরা খুলাফায়ে রাশেদীনের সামরিক ব্যবস্থাপনার উপর--যা আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশ ও হিদায়াত মুতাবিক ছিল, পূর্ণরূপে আমল করেনি। ফলে মুসলিম ফৌজ কনস্টান্টিনোপল অবরোধকালে প্রথম পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। পরাজয়ের কারণগুলোকে নিম্নরূপ চিহ্নিত করা যায় ঃ

(ক) দুর্গ জয় করার জন্য পরিপূর্ণ ববস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

(খ) ফৌজের মধ্যে আরামপ্রিয়তা ও সুখ-সুবিধার প্রতি অভিলাষ দেখা দিয়েছিল। ফলে তারা কঠোর পরিশ্রমে অনভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

(গ) জিহাদী প্রেরণা গোটা ফৌজে একইরূপ কার্যকর ছিল না। কেননা এতে কয়েকজন বেতন-ভোগী কর্মচারীও ছিল।

(ঘ) নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। সেনানায়ক ও মুজাহিদদের মধ্যে পূর্ণ সংহতি ছিল না।

এ ছাড়াও আরো কিছু কারণ থাকতে পারে।

আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের যুগে মুসলিম ফৌজে শুদ্ধিকরণ

আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান যখন ক্ষমতাসীন হন তখন ফৌজী ব্যবস্থাপনার মান অনেক নীচে নেমে গেছে। আবদুল মালিক রূহ ইব্ন যানবাগ-এর নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। ইনি পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। রূহ ইব্ন যানবাগ খলীফাকে বলেনঃ আমার দৃষ্টিতে এ কাজের উপযুক্ত একজন ব্যক্তিই আছেন এবং তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। হাজ্জাজ প্রথম জীবনে ছিলেন একজন শিক্ষক এবং এখন তিনি সৈন্য বিভাগের একজন কর্মচারী। খলীফা তাকে তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর অফিসার নিযুক্ত করেন। কেননা সাধারণত এমন হ'ত যে, খলীফা কোথাও যাত্রা শুরু করেছেন, অথচ তাঁর রক্ষী সৈনিকেরা নিজেদের ক্যাম্পে ঘুমিয়ে রয়েছে। মোটকথা, তারা কোনরূপ নির্দেশের পরওয়াই করত না।

www.almodina.com

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অফিসার নিযুক্ত হওয়ার পর একদিন দেখতে পেলেন যে, খলীফার সঙ্গী-সাথীরা যাত্রা শুরু করেছে বটে, কিন্তু সিপাহীরা তখনও তাদের খাবার খাচ্ছে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এ বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা অত্যন্ত অশিষ্ট ভাষায় এবং বেপরোয়া ভঙ্গীতে এর উত্তর দান করে। হাজ্জাজ তখন এদেরকে বেত মারার নির্দেশ দেন। তাদের তাঁবুগুলোতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এসব তাঁবুর মধ্যে স্বয়ং রূহ ইব্ন যানবাগের তাঁবুও ছিল। হাজ্জাজ রূহের ব্যক্তিগত চাকর-বাকরগুলোকেও বেত দিয়ে পিটান। তখন রূহ ইব্ন যানবাগ খলীফার নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেন ঃ যে লোক (হাজ্জাজ) কাল পর্যন্তও তার অধীনস্থ সামান্য কর্মচারী ছিল, আজ তার ধৃষ্টতা এতটা বেড়ে গেছে যে, সে আমার ব্যক্তিগত চাকর-বাকরগুলোকেই কেবল বেত দিয়ে পিটায় নি, বরং তাদের এবং আমার ব্যক্তিগত তাঁবুও জ্বালিয়ে দিয়েছে! রূহ ইব্ন যানবাগ আরও বলেন ঃ আমীরুল-মু'মিনীন! হাজ্জাজ বড় ধৃষ্ট হয়ে গেছে। তখন খলীফা হাজ্জাজকে হাযির হবার নির্দেশ দেন। হাজ্জাজ সম্মুখে আসতেই খলীফা রাগত স্বরে বলেন ঃ তুমি এমন অশোভন আচরণ করলে কেন—বিশেষ করে তোমার নিজেরই গুরুজনের বিরুদ্ধে? হাজ্জাজ অত্যন্ত দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের সাথে জবাব দেন ঃ আমীরুল-মু'মিনীন! আমি তো কিছু করিনি। খলীফা বললেন, "তাহলে কে রূহ ইব্ন যানবাগের চাকর-বাকরগুলোকে বেত দিয়ে পিটিয়েছে এবং কে এর রক্ষীবাহিনীর তাঁবুগুলোতে আগুন লাগিয়েছে?"

উত্তরে হাজ্জাজ অত্যন্ত নির্ভীকভাবে বলেন, "খলীফার নির্দেশে তিনিই বেত লাগাবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁবুগুলো জ্বালিয়েছেন যাতে সংশ্লিষ্ট সকলেই বুঝতে পারে যে, এখন থেকে আলসেমি ও বেআদবী আর বরদাশ্‌ত করা হবে না। এখন রইল সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির প্রশ্ন! তা আল্লাহ্‌র ফযলে আমীরুল-মু'মিনীন রূহ ইব্ন যানবাগকে একটি তাঁবুর বদলে কয়েকটি তাঁবু এবং একটি গোলামের পরিবর্তে কয়েকটি গোলাম দান করতে পারেন।"

খলীফা হাজ্জাজের এই উপস্থিত জওয়াবে খুবই প্রভাবান্বিত হন। তিনি রূহ ইব্ন যানবাগকে ইন'আম দিয়ে সন্তুষ্ট করে দেন।

www.almodina.com

ফলে ফৌজের উপর হাজ্জাজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাজ্জাজ যেখানে রক্তপাত ও নির্দয়তার জন্য কুখ্যাত ছিলেন, সেখানে তিনি যোগ্য এবং রুচিশীল ব্যক্তি হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত আলিম ইয়াহ্ইয়াকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আমি লাহ্ন অর্থাৎ যের যবর ও পেশের ক্ষেত্রে কোন ভুল করি না তো?" এই প্রশ্নের উত্তর উক্ত আলিম অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভাষায় প্রদান করেন। তিনি এও বলেন, "তুমি যেরের স্থলে পেশ এবং পেশের স্থলে যের পড়ে থাক।" এর অর্থ এও হতে পারত যে, তুমি জালিম এবং অবিচারক; যে নীচাসনের পাত্র তাকে তুমি উচ্চাসন দাও আর যে উচ্চাসনের হকদার তাকে তুমি অপমানিত করে থাক।

হাজ্জাজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'ল। তিনি ইয়াহ্ইয়া বিন যা'রকে খুরাসানের কাযী নিযুক্ত করেন।

যাই হোক, মুসলিম সেনাবাহিনী চিরদিন হাজ্জাজের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে। কেননা তিনি অধঃপতনের দিকে ধাবমান একটি জাতিকে পুনরায় বিজয়ী ও সফল জাতিতে রূপান্তরিত করেন।

ফৌজ ভর্তির প্রাথমিক অবস্থা ও তার পদ্ধতি

আজকাল প্রতিরক্ষা বিভাগের যে শাখাকে রিক্রুটিং শাখা বলা হয়---তার বুনিয়াদ স্থাপন করেন হযরত উমর (রা)। প্রথম দিকে এই দফতরকে দীওয়ান বলা হ'ত। এর উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত মুসলমান অর্থাৎ মুহাজিরীন, আনসার ও তাবিঈনদের নাম ভাতার ক্রম ও পরিমাণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করা। এই দফতর গঠিত হয় সেই ঘোষণার ফলে যা হযরত উমর (রা) মুজাহিদদের ব্যাপারে দিয়েছিলেন অর্থাৎ বিজিত রাষ্ট্রসমূহে অতিরিক্ত জায়গা-জমি খরিদ করবে না, কিংবা কৃষিকর্মে লিপ্ত হবে না, ইত্যাদি। এই দফতরের আওতায় সমস্ত মুজাহিদ এবং তাদের সন্তানাদিকে নির্ধারিত হারে ভাতা দেওয়া হতে থাকে।

ফৌজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সম্পর্কে ব্যাপকভাবে খোঁজ-খবর নেওয়া হ'ত এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করে

www.almodina.com

রাখা হ'ত। যেমনঃ

(ক) দীওয়ানের অফিসার প্রথমে এটা দেখতেন যে, আবেদনকারী প্রার্থী হবার উপযুক্ত কিনা, অর্থাৎ সে স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ, উদ্যোগী, সাহসী এবং মুসলমান কিনা।

(খ) প্রার্থীর বংশ-পরিচয়, হুলিয়া (দৈহিক বিবরণ), তার বিশেষ গুণাবলী ও পরিচয়-চিহ্ন খুবই সতর্কতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হ'ত যেন একই নামের বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচিতিতে কোনরূপ বিভ্রান্তি দেখা দিতে না পারে।

(গ) ফৌজের বিন্যাস বংশ, জাতীয়তা এবং গোত্র থেকে শুরু হ'ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, আরববাসী দু' ধরনের হ'ত। যেমন, 'আদনান বংশীয় ও কাহতান বংশীয়। 'আদনানী আরবদেরকে কাহতানী আরবদের অগ্রগণ্য মনে করা হ'ত। কেননা নুবুওত তাদের বংশেই এসেছিল। কুরায়শ বংশে বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়া ইত্যাদি ছিল, কিন্তু অগ্রাধিকার ছিল বনূ হাশিমের।

(ঘ) যদি প্রার্থী অনারব হ'ত এবং কোন বংশের আওতায় না আসত তাহলে তাকে জাতীয়তার ভিত্তিতে তালিকাবদ্ধ করা হ'ত। যেমন, খুরাসানী, ফিরাউনী, পশ্চিমা তুর্কী, ভারতীয় ইত্যাদি।

বনূ উমাইয়ার যুগে এই দফতর ফৌজি দফতরে পরিণত হয়। এর কয়েকটি শাখা ছিল। যেমনঃ (ক) যোগাযোগ (বার্তা আদান-প্রদান), (খ) বেতন, (গ) ভাতা ও পুরস্কার, (ঘ) ফৌজি ব্যয় নির্বাহ, (ঙ) সামরিক ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি। এই বিষয়টিও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের হাতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

মুসলিম ফৌজের বেতনভোগী হওয়া

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' থাকায় বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বন্টন করা হ'ত। কিন্তু হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) ফৌজকে খুশী করবার জন্য তাদের বেতন নির্ধারণ করেন এবং বেতনের অতিরিক্ত অনেক কিছু তাদেরকে প্রদান করেন। মু'আবিয়া (রা) 'উলামাদেরকেও তাদের খিদমতের বিনিময় প্রদান করেন এবং তাদেরকে

www.almodina.com

ফৌজে বনী উমাইয়ার নিয়ম মাফিক বেশ কয়েকটি পন্থায় ব্যবহার করেন। মু'আবিয়া (রা)-র স্থলাভিষিক্তগণ উপহার-উপঢৌকন ও বিভিন্ন প্রকার দান-দক্ষিণার ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করেন। হাজ্জাজ বিন হউসুফ এসব কিছুকে নিয়মিত মাসিক ভাতায় রূপান্তরিত করেন।

মুসলিম ফৌজের সংখ্যা গণনা

বুখারী শরীফে আছে, হযরত (সা) বলেছেন, "যে সমস্ত লোক ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করেছে তাদের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হোক।" অর্থাৎ প্রতিটি মুসলিম পুরুষ মুজাহিদ হিসাবে পরিগণিত হবে। তবুক যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল তিরিশ হাযার। হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর যুগে এই সংখ্যা বেড়ে দেড় লক্ষে গিয়ে পৌঁছে।

বনূ উমাইয়াদের যুগে কেবল বসরা ও কূফাতে মুসলিম পুরুষের সংখ্যা ছিল দু'লক্ষের কাছাকাছি। অনুরূপ সংখ্যক নারী এবং শিশুও নিশ্চয় ছিল। সিরিয়া, মিসর, পারস্য প্রভৃতি দেশের মুসলমানদের সংখ্যা এ থেকে অনায়াসেই অনুমান করা যায়।

আঁ-হযরত (সা)-এর যমানায় প্রতিটি গোত্রে এমন একজন লোক নিযুক্ত থাকতেন যিনি রোজ সকালে সমস্ত এলাকা ঘুরে নবজাত শিশু এবং মৃত ব্যক্তিদের নাম রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতেন। অতঃপর এই হিসাব প্রাদেশিক রাজ্যসমূহের সদর মোকামে পাঠানো হ'ত এবং সেখান থেকে খলীফার সদর মোকামের রেজিস্টারে তা লিপিবদ্ধ করা হ'ত।

ফৌজি শ্রেণীক্রম ঃ মর্যাদানুসারে

জাহেলিয়া যুগে প্রতিটি গোত্রের এক-একজন রঈস বা নেতা ছিলেন। গোত্রের রঈস স্বয়ং গোত্রের বাহিনী নিয়ে যেতে না পারলে অন্য কোন ব্যক্তি এবং সাধারণত নিজের কোন নিকটাত্মীয়কে আমীর নিযুক্ত করতেন। বাহিনীর এ-ধরনের সর্দারকে 'মুনকাসিব' বলা হ'ত। প্রত্যেক 'মুনকাসিব'-এর অধীনে পাঁচজন 'আরীফ' থাকতেন। আর প্রত্যেক আরীফের অধীনে থাকত নির্দিষ্ট সংখ্যক সিপাহী।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে উল্লিখিত মূলনীতি অনুসারেই কাজ করা হয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক আরীফের অধীনে প্রথম দিকে

www.almodina.com

দশজন এবং পরবর্তী সময়ে সাতজন করে সৈন্য দেওয়া হ'ত। অবশ্য আরীফ-এর নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা ছিল না।

হযরত উমর (রা)-এর যুগে এমন একজন অফিসার নিয়োগ করা হয়, যিনি সিপাহীদের বেতন সভাপতির নিকট থেকে গ্রহণ করে তা আরীফদেরকে প্রদান করতেন এবং আরীফগণ নিজ নিজ সিপাহীদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতেন। এই অফিসারকে বলা হ'ত 'আমীর-ই-ইসবা' যাকে আমাদের যুগে Military Accounts Officer বলা হয়।

বনী উমাইয়া ও বনী 'আব্বাসের যুগে ফৌজী পদের রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ ঃ

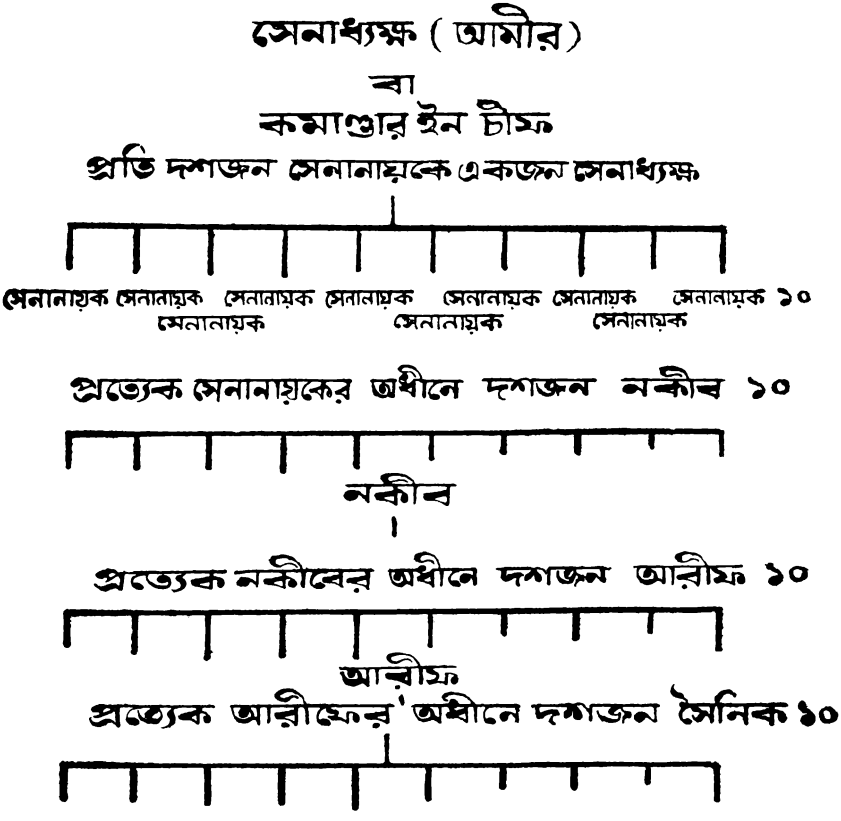

www.almodina.com

পরিদর্শন (Inspection)

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবরা যুদ্ধে রওয়ানা হবার প্রাক্কালে নিজ নিজ বাহিনী পরিদর্শন করত। আঁ--হযরত (সা) ও যখন কোন অভিযানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন তখন যাত্রার প্রাক্কালে প্রতিটি মুজাহিদকে পরিদর্শন করতেন। তিনি দুর্বল, অল্পবয়স্ক এবং বৃদ্ধ লোকদের জিহাদে যাবার অনুমতি দিতেন না। সৈন্যদের কাতার গুলোকে সোজা এবং সংঘবদ্ধাকারে কায়েম রাখার তিনি তাকীদ দিতেন। খুলাফায়ে রাশেদীনও এই নিয়ম চালু রেখেছিলেন। বনী উমাইয়া যুগের সূচনায় এর উপর আমল করা হলেও পরবর্তী সময়ে গাফিলতির কারণে তা পরিত্যাগ করা হয়। কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পুনরায় অত্যন্ত শক্তভাবে উল্লিখিত নিয়মটি চালু করেন। পরিদর্শনের সময় হাজ্জাজ প্রতিটি সৈনিককে জিজ্ঞাসা করতেন সে কে এবং তার গোত্র কোনটি। সৈনিকের অস্ত্রশস্ত্র বিশেষভাবে পরিদর্শন করা হ'ত এবং প্রতিটি সৈনিকের স্বাস্থ্যও মনোনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করা হ'ত। যে ব্যক্তি এত বড় একজন সংস্কারক ছিলেন তিনি যদি এক আধটু কঠোরতা দেখিয়েই থাকেন তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে তিনি তা করে থাকেন তাহলে তার আচরণ ঠিকই ছিল। কেননা এছাড়া বিগড়ে যাওয়া একটি জামা'আতকে সোজা পথে নিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম।[১]

ফৌজী ছাউনি

আঁ-হযরত (সা)-এর সময়ে যখন কোন শহর জয় করা হ'ত তখন তার আশেপাশে সেনাছাউনি ফেলা হ'ত যাতে এর দ্বারা শহরবাসীদের কোনরূপ অসুবিধার কারণ না ঘটে।

হযরত উমর (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এই ছাউনি যতদূর সম্ভব এমন স্থানে হবে যেখান থেকে মুসলিম ফৌজের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শত্রুপক্ষ যেন বিচ্ছিন্ন করে দিতে না পারে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, এমন স্থানে পারতপক্ষে সেনাছাউনি না ফেলার হুকুম ছিল যে স্থান এবং মদীনার মধ্যে কোন নদী বা সমুদ্র ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুসলিম

১. হাজ্জাজ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। আমরা এর সঙ্গে একমত নই। —অনুবাদক।

www.almodina.com

সৈন্য মিসরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করেনি বরং "হিস্ন-ই-বাবেল"-এর নিকটবর্তী তাঁবুতে অবস্থান করেছে এবং পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনের পরিবর্তে ফুরাত নদীর কিনারে অবস্থান করেছে। পরবর্তী সময়ে কূফা ও বসরায় (ইরাকে অবস্থিত) সেনাছাউনি নির্মাণ করা হয়।

এই কর্মপদ্ধতির সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সৈনিকদেরকে শহরের আরাম-আয়েশ ও খেল-তামাশা থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা। আমরা যে যুগের কথা বলছি তখন মুসলিম সৈনিকরা সাধারণত নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে যেতেন।

আরব সৈনিকগণ পরবর্তীকালে নিজেদের পরিবার-পরিজনদের সংগে নিয়ে যুদ্ধে যেতেন না। এমতাবস্থায়ও তারা শহরের বাইরে আলাদা জায়গায় অবস্থান করতেন। দুর্গবেষ্টিত শহরগুলোতে যতটা সৈন্য রাখা সমীচীন ছিল ততটাই রাখা হ'ত। কূফার ন্যায় কায়রোও প্রথমে একটি ইসলামী ক্যাম্প ছিল, যা পরে বড় শহরে পরিণত হয় এবং এটি বর্তমানে মিসরের রাজধানী।

সামরিক পতাকার গুরুত্ব

পতাকা যাকে "লিওয়া" (لوا) এবং "রাইয়াত" (رايات) বলা হ'ত, যুদ্ধের সময় ছিল খুবই গুরুবহ। আমার প্রথম পুস্তকগুলোতে যেমন, 'হাদীছে দেফা,'[১] এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর জীবন-বৃত্তান্তে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আঁ-হযরত (সা) বদর যুদ্ধে মুজাহিদদেরকে তিনটি পতাকা প্রদান করেছিলেন। একটি ছিল সাদা যা তিনি মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা)-কে সোপর্দ করেছিলেন। 'ইকাব নামের একটি কালো পতাকা হযরত 'আলী (রা)-এর নিকট ছিল এবং অপর কালো পতাকাটি অর্থাৎ তৃতীয়টি রসূলুল্লাহ (সা) আনসারদেরকে প্রদান করেছিলেন।

---

১. 'ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল' নামে বর্তমান অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যে প্রকাশিত ও নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বর্তমানে 'রসূলুল্লাহ ((সা)-এর রণ-কৌশল' নামে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।
—অনুবাদক।

www.almodina.com

আঁ-হযরত (সা) পতাকার হিফাজতের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। ছোট পরিমাপের পতাকাকে 'লিওয়া' বলা হ'ত যা সাধারণত অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ককে প্রদান করা হ'ত। পাশ্চাত্যের সৈনিকেরাও এই প্রথার অনুকরণ করে।

'রাইয়াত' মাপে ও আকারে 'লিওয়া' থেকে বেশ বড় ধরনের হ'ত। পতাকার মর্যাদা ও সম্মান ইরানী, রোমক ভারতীয় তথা সকলের নিকটই সমভাবে ছিল। পতাকার পতন কিংবা শত্রুহস্তে তা চলে যাওয়াকে ভারতীয় সৈনিকদের জন্য খুবই অশুভ লক্ষণ মনে করা হ'ত। এমন অবস্থা দেখা দিলে সৈনিকরা অধিকাংশ সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেত। আমরা আগামীতে আলোচনা করব যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম যদিও খুবই অল্পবয়স্ক সিপাহ-সালার ছিলেন, তথাপি তিনি ভারতীয়দের মনে পতাকার পতনের যে প্রতিক্রিয়া তা বেশ ভালভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। কেননা তিনি দেবলে অবস্থিত মন্দিরের লাল ঝাণ্ডাকে স্বীয় মিনজানীকের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছিলেন এবং এই পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতেই ভারতীয় ফৌজ তাদের মনোবল হারিয়ে বসেছিল।

আঁ-হযরত (সা) পতাকার সম্মান ও মর্যাদার উপর খুব গুরুত্ব দিতেন। অবশ্য এই সাথে তিনি এ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণও দেন যে, পতাকা ভূপাতিত হবার সঙ্গেই সঙ্গেই তা পুনরায় উঠাতে হবে এবং যদি দুশমনের হাতে গিয়ে পড়ে তাহলে সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করে তা শত্রুহস্ত থেকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এইরূপ নির্দেশ প্রদানের পেছনে রসূল (সা)-এর অভিপ্রায় সম্ভবত এই ছিল যে, অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অটুটু মনোবল কোন অবস্থাতেই হারাতে নেই। অবস্থা ও সংকট যত কঠিনই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই হতাশাকে ধারে কাছে ঘেষতে দেওয়া হবে না।

আঁ-হযরত (সা) যখনই মুজাহিদ বাহিনীকে কোন অভিযানে প্রেরণ করতেন তখন তাদের অধিনায়ককে বিশেষ পতাকা প্রদান করতেন। সাধারণত প্রতিটি গোত্রের নেতার পতাকাই ঐ গোত্রের পতাকা বলে বিবেচিত হ'ত।

www.almodina.com

এই পতাকা প্রদান মুহূর্তে আঁ-হযরত (সা) এবং পরবর্তী খলীফাগণ দু'আ ও ওসীয়ত করতেন। হযরত উমর (রা) এক অধিনায়ককে পতাকা প্রদান করবার সময় নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছিলেন ঃ

"আল্লাহ্‌র নামে, তাঁরই সাহায্য ও সহযোগিতায় আমি এই পতাকা বিন্যস্ত করেছি। আল্লাহ্‌র সাহায্য নিয়ে রওয়ানা হও। আল্লাহ তা'আলা এই পতাকাকে সমুন্নত রাখুন। বিজয় ও সাফল্যের জন্য সত্যকে আকড়ে ধরা এবং ধৈর্য অবলম্বন করা অপরিহার্য।

"তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে সেই সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়বে যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফ্‌রী করে ; কিন্তু সীমালংঘন করবে না। কেননা সীমালংঘনকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন না। শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলার মুহূর্তে ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করবেনা ; বিজয় মুহূর্তে অপব্যয় ও অপচয় করবেনা। বৃদ্ধ, অসহায় নারী কিংবা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করবে না।

"বিশাল বাহিনী যখন তোমাদের সমনে এসে দাঁড়াবে এবং লড়াইয়ের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠবে তখন প্রাণভরে লড়বে, শত্রুকে হত্যা করবে। শত্রুর উপর অতর্কিত নৈশ আক্রমণ পরিচালনা কালেও এই নিয়ম মেনে চলবে।"

ফৌজি ব্যাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

পাশ্চাত্যের প্রচার-প্রোপাগাণ্ডায় আমরা শুনেছি যে, মুসলিম সিপাহীরা ছিল অনুভূতিহীন মানুষ যাদেরকে কেবল খাওয়া, পান করা এবং মরতে শেখানো হয়েছিল। আমরা বিশ্ব-যুদ্ধ কালে এবং পরেও একথা শুনেছি। এমনকি জনসাধারণও মনে করে যে, ব্যাণ্ড পাশ্চাত্যের আবিষ্কার। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাবলী এর বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়।

আইয়ামে জাহেলিয়াতে এবং তার পরেও মুসলিম ফৌজে 'তবল' বা ঢোল এবং 'বওক'-এর ব্যবহার হ'ত। কবিগণ কবিতা আবৃত্তি করে ও গযল গেয়ে সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করতেন। অবশ্য এটা ঠিক যে, এসব উপকরণ রাষ্ট্রের গৌরব ও শান-শওকত

www.almodina.com

প্রকাশের সময়ে ব্যবহার করা হ'ত না। সে যুগে যখন যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যেত তখন সিপাহীরা মিলিত কোরাসে কিংবা পৃথক পৃথকভাবে গান গাইত। মুজাহিদ-বৃন্দের মধ্যে যে-সব কবি উত্তম কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন মুজাহিদরা তাদেরকে মৌখিকভাবেই প্রশংসা করত না, বরং তাদেরকে আর্থিক পুরস্কারও দিত। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-এর উপর অপব্যয়ের সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি একজন কবিকে কয়েক হাযার দীনার কবিতা আবৃত্তির বিনিময়ে দিয়েছিলেন।

মুসলিম ফৌজ পরবর্তীকালে রোমক ও পারসিক বাহিনীর অনুকরণ করে এবং বাজনাকে নিজেদের গৌরব ও শান-শওকতের প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে।

একটি মুসলিম ফৌজের কাছে কয়েকশ' বওক ও ঢোল থাকত। ফৌজের সদস্যরা মিলিত হয়ে গান গাইত। সৈন্যরা যুদ্ধ-যাত্রার মুহূর্তে মিলিত হয়ে গান গাইত যাতে করে সফরের দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তির লাঘব ঘটে।

অস্ত্রশস্ত্র

ভারতবর্ষে ইরান এবং রিওয়াবাসী অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর ছিল। তখনকার দিনে তাদের অস্ত্রশস্ত্রই সর্বোত্তম এবং নতুন ধরনের ছিল। অবশ্য তারা সেগুলোর ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের অভাব ছিল। যেহেতু আরব মুজাহিদরা দরিদ্র ও অভাব-অনটনের কারণে উচ্চ মূল্যের লৌহ-বর্ম খরিদ করতে পারত না, তাই তারা নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য এই ঘাটতিটুকু পূর্ণ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা পূরণ করত। যে-ভাবে ইট, সিমেন্ট ও লৌহ-নির্মিত প্রাচীর ও কেল্লা দ্বারা কোন জাতিকে রক্ষা করা যায় না, ঠিক তেমনি মানুষের দেহও লৌহ-বর্মের দ্বারা নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখা যায় না—যতক্ষণ না সেই লৌহ-বর্ম পরিহিত দেহের বাহুতে শত্রুর উপর কার্যকর আঘাত হানার শক্তি থাকে। একজন শক্তিশালী বাহুধারীর নিক্ষিপ্ত তীর খুব কম সময়ই

www.almodina.com

প্রতিহত করা সম্ভব হয়। এই তীরের আওতা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এমন বাহু দরকার যা বিদ্যুৎ বেগে তীরগুলোকে ঢালের পৃষ্ঠে লুফে নিতে পারে।

তীর-ধনুকের ব্যবহার

আরবদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বলতে ছিল তীর-ধনুক। তারা যুদ্ধকালেই কেবল তীর ব্যবহার করত না বরং হরিণ এবং উট পাখি শিকারেও তা ব্যবহার করত। আরবের যে সব লোক উন্নত মানের তীরন্দায হ'ত তাদেরকে 'রিমাতুল-হাদাক' উপাধিতে ভূষিত করা হ'ত। কথিত আছে যে, তারা পলায়নপর হরিণের চক্ষুকে তীরের অব্যর্থ নিশানায় পরিণত করতে পারত। আরবে তীরন্দাযীর অনুশীলন এবং অধিকাংশ সময় তীরন্দাযীর প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ত। সেখানে প্রচুর গুই সাপ পাওয়া যায়। এই প্রাণীটিকে গাছের সঙ্গে লটকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তীরের নিশানা বানিয়ে লক্ষ্যভেদে হাত পাকা করা হ'ত।

সমরশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়ে গড়ে উঠার জন্য মুজাহিদদের প্রতি আঁ-হযরত (সা)-এর অমূল্যবাণী

বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত (সা) তীরন্দাযী সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের পক্ষে যতখানি শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব তা করবে। আর জেনে রেখ, তীরন্দাযীর মধ্যেই শক্তি নিহিত; মনে রেখ, তীরন্দাযীর মধ্যেই শক্তি নিহিত এবং ভালভাবে অন্তরে গেঁথে নাও, তীরন্দাযীর মধ্যেই শক্তির রহস্য লুকিয়ে আছে। এব্যাপারে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

রসূল আকরাম (সা) আরো বলেছেন ঃ প্রতিটি ঈমানদার যে-সব বিষয়ে প্রবল আগ্রহ নিয়ে আনন্দ ও তৃপ্তিবোধ করবে তাহ'ল, নিজেদের ঘোড়াকে উত্তম প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তা সুস্থ ও মোটা তাজা রাখা, স্বীয় ধনুকের ভাল ছিলা দিয়ে তীরন্দাযী করা এবং স্ত্রীর সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলা। বিষয়টি নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। যারা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের

www.almodina.com

জন্য এধরনের কাজ করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে তীরন্দাযী করবে আল্লাহ্‌ তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

এ সমস্ত বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, আঁ-হযরত (সা) কিভাবে মুজাহিদদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ হয়ে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করেছেন। মুসলিম সেনাবাহিনীতে তীরন্দাযকে 'নাশ্‌শাব' উপাধিতে ভূষিত করা হ'ত। বনী উমাইয়াদের রাজত্বকাল পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে খনিজ তৈলের সাহায্যে তীর নিক্ষেপের একটি প্রক্রিয়া চালু ছিল। একে বলা হ'ত 'তাফান্নুন'। তেল ব্যবহারের জন্য লোহা কিংবা কাঠের একটি নল থাকত। এই নলের ভেতর তীর দিয়ে অন্য একটি যন্ত্রের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা হ'ত। তীরের সম্মুখভাগে খনিজ তেলে ভেজা এক খণ্ড তুলা লাগানো থাকত। এতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হ'ত। ফলে তীর দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুধু আঘাতই হানত না বরং শত্রুর উপর অগ্নি-বৃষ্টিও ঝরাত। এই পন্থার ব্যবহার শত্রুর অশ্বারোহী বাহিনীর হামলার মুকাবিলায় অত্যন্ত কার্যকর ছিল। কেননা ঘোড়া কিংবা উট আগুন বৃষ্টি দৃষ্টে ভয়ে ভড়কে যেত। মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরের হস্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে এই যন্ত্রই ব্যবহার করেছিলেন।

হিন্দুদের রামায়ণ ও মহাভারতের লড়াইগুলোতে এধরনের তীর ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। অনারব জাতি-গোষ্ঠীগুলো তাতারদের আক্রমণ রুখবার জন্য এই জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। তারা এগুলোর নাম রেখেছিল 'মুজাররাত'।

আজকাল যে ট্রেঞ্চ মর্টার (Trench Morter) ব্যবহৃত হচ্ছে তাও ঐ মূলনীতিকে অনুসরণ করেই। এতে ধাতব নির্মিত একটি নলের অর্থাৎ কার্টুজের টুপি চালনাকারী সুঁচ থাকে। ফায়ারিং কার্টুজ এই সুঁচের সাহায্যে চলে এবং নলের উচ্চতা মাফিক দুরত্ব অতিক্রম করে ফেটে যায়।

অশ্বারোহণ সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা)-এর অমূল্য বাণী

আঁ-হযরত (সা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি (সা) বলেছেন, "তোমরা নিজ নিজ অশ্বগুলোকে গভীরভাবে দেখা-শোনা ও যত্ন-

www.almodina.com

আস্তি করবে, যে-ভাবে তোমরা নিজেদের স্ত্রী-পুত্রদের দেখা-শোনা ও যত্ন-আস্তি করে থাক।" অনন্তর তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে একজন অশ্বারোহীর অংশ দুইজন পদাতিকের সমান রাখেন এবং এই প্রথা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত চালু থাকে। আঁ-হযরত (সা) এবং খলীফাগণ অশ্বারোহীদের নিজেদের ভেতর প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের মহড়ার ব্যবস্থা করতেন। তারা অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্যদের তাদের কাজের উপর উৎসাহিত, চাঙ্গা ও অনুপ্রাণিত করতেন।

অশ্বারোহী অর্থাৎ অভিজ্ঞ অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্যে মুসলমানরা দুনিয়ার ভাগ্য পাল্টে দিয়েছে। অশ্বারোহীর সাহায্যেই মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহির ও তার সেনাপতিদেরকে বিব্রত ও পেরেশান করে তোলেন এবং পরিশেষে পরাজিত করেন।

আজকাল অশ্বারোহী বাহিনীতে ঘোড়া ও উটের স্থান দখল করেছে ট্যাংক, উড়োজাহাজ ও সাঁজোয়া মোটর গাড়ি। যদিও যুদ্ধের পন্থা ও পদ্ধতি এবং সমরাস্ত্র পাল্টেছে, কিন্তু সমরনীতি এখনও তাই আছে যা আগে ছিল; ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। এজন্য ইসলামের ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করা দরকার যাতে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের মহান পূর্বপুরুষগণ কি ভাবে এবং কি করে টাকা-পয়সা, অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনী ছাড়াই দুনিয়ার বিরাট শক্তিগুলোকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন। আমি আমার 'হামারা দেফা' নামক গ্রন্থে লিখেছি, রুশরা কিভাবে ঘোড় সওয়ারের মাধ্যমে জার্মানীর ট্যাংক ডিভিশনকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছিল।

তীরন্দাযীর পর আরবরা তলোয়ার যুদ্ধে পারদর্শিতা লাভ করাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করত। কিন্তু তারা তলোয়ার সাধারণত বাহির থেকে আমদানি করত এবং এসব তলোয়ার একটা বিশেষ ধাচের হ'ত। অর্থাৎ তলোয়ারের বাট বা হাতল নিম্ন ধরনের হ'ত (নমুনা দেখুন)।

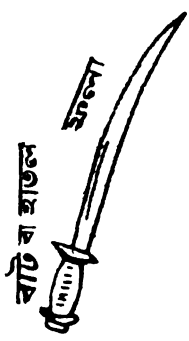

www.almodina.com

এই তলোয়ারের অগ্রভাগ বক্ষ সহ শরীরের যে কোন অংশে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় এবং এর তীক্ষ্ণ ধারের সাহায্যে মস্তক কিংবা দেহের যে কোন অংশকে মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়।

ভারতীয় তলোয়ার এবং এর নমুনা

ভারতীয় তলোয়ার দ্বারা কোপ মেরে কোন জিনিসকে কাটা কিংবা দ্বিখণ্ডিত করা চলত। কেননা এ তলোয়ারের ফলা তৃতীয়ার চাঁদের মত ঈষৎ বাঁকা। অবশ্য এই তলোয়ারের নীচে আলওয়ালা কীলক লাগানো থাকত, যাকে হাতাহাতি যুদ্ধে খুবই কার্যকর পন্থায় ব্যবহার করা হ'ত এবং শত্রুর গলায় শিরস্ত্রাণের তলায় ঢুকিয়ে দেওয়া যেত।

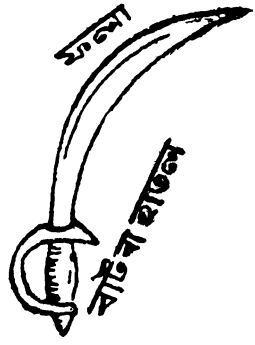

রোমান ও ইরানী তলোয়ার এবং তার নমুনা

রোমীয় ও ইরানী তলোয়ার প্রধানত পাতলা এবং একদম সোজা হ'ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেহে বিদ্ধ করবার জন্য এটা ব্যবহার করা হ'ত। কেননা ঐসব জাতিগোষ্ঠীর দেহে লৌহ বর্ম পরিহিত থাকত, যার ভেতর তলোয়ারের তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম ফলা ঢুকিয়ে শত্রুকে সহজেই ঘায়েল করা যেত। কোপ দিয়ে কাটা তলোয়ার লৌহ বর্মের বিপরীতে ততক্ষণ পর্যন্ত বেকার প্রমাণিত হ'ত যতক্ষণ না তা বিশেষ পন্থায় নির্মিত হ'ত এবং এর চালক ও বাহক অভিজ্ঞ হবার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট শক্তিশালী হ'ত।

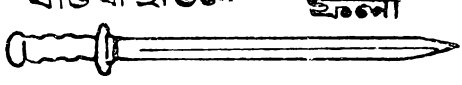

আরবে ব্যবহৃত তলোয়ার এবং তার নমুনা

আরবের লোকেরা সাধারণত য়ামনী, ভারতীয়, সিরীয় ও খুরাসানী তলোয়ার ক্রয় করত। এসব তলোয়ারকে বলা হ'ত 'সুয়ূফে আতীকা'।

www.almodina.com

য়ামনী তলোয়ার হ'ত উন্নত মানের। এর ফলার ভেতর নালা থাকত। কারণ এর ফলে এই তলোয়ার খুবই মযবুত হ'ত। একে "মাহফূরা" বলা হ'ত।

সাধারণভাবে য়ামনী তলোয়ারের হাতলে দু'টি ছিদ্র থাকত। এতে আরবের লোকেরা চামড়ার দস্তানা বাঁধত যা হাতের কবজীর চার পাশ জড়ালে হাতের মুষ্টি খুব মযবুত হ'ত। সিরীয় ও সুলায়-মানী তলোয়ারের ফলার উপর ফুল ও লতা-পাতা খোদিত থাকত। ঐসব ফুল ও লতা-পাতার দ্বারা তলোয়ারের ঔজ্জ্বল্য ও কাঠিন্য অনুমান করা যেত। অবশ্য এ জাতীয় তলোয়ার লৌহবর্ম কাটার ক্ষেত্রে বেশী সক্ষম ছিল না।

মুসলিম ফৌজে তলোয়ারবাজীর মহড়া ও অনুশীলন

মুসলিম শিবিরে তলোয়ারবাজীতে কে কত পারঙ্গম তার মহড়া প্রায়ই অনুষ্ঠিত হ'ত। একই আঘাতে উট, বলদ ইত্যাদির গর্দান উড়িয়ে দেওয়া, পদাতিক এবং আরোহী উভয় অবস্থায় তলোয়ার যুদ্ধ করা, অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দ্রুতগতিতে তলোয়ার চালিয়ে সবুজ গাছের গুড়ি কেটে ফেলা---ইত্যাদির অনুশীলন করা হ'ত।

আরব অশ্বারোহীরা নেযার ব্যবহারও খুব পরিশ্রমের সঙ্গে শিখত এবং সাধারণত শত্রুর উপর তাদের প্রথম হামলা নেযার মাধ্যমেই হ'ত। যেহেতু আরবীয় অশ্ব খুবই দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং ফুর্তিবাজ হ'ত এবং তার প্রশিক্ষণও হ'ত বিশেষ যত্নের সঙ্গে, ফলে আরবীয় নেযার হামলাকে রোমক, পারসিক এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী খুবই ভয় করত। নেযার হামলা এবং তীরন্দাযদের তীর বর্ষণের নৈপুণ্যের মাধ্যমেই সালাহউদ্দীন আয়্যুবী ক্রুসেডার নাইটদেরকে উপর্যুপরি পরাজিত করেছিলেন।

নেযার সঠিক ব্যবহার এবং অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য লাভের জন্য সাধারণত কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া অনুষ্ঠিত হ'ত, অর্থাৎ কিছু সময় উভয় অশ্বারোহীর নিকটই মুকাবিলা করার জন্য নেযা থাকত

www.almodina.com

এবং কিছু সময় একজনের নিকট তলোয়ার এবং অন্য জনের নিকট নেযা থাকত।[১]

নেযার ফলা বা তীক্ষ্ণধার মুখ, যাকে আরবের লোকেরা "আবনীন" বলত এবং যাকে কতক লোক "ফালা"ও বলত--- কয়েক ধরনের হ'ত।

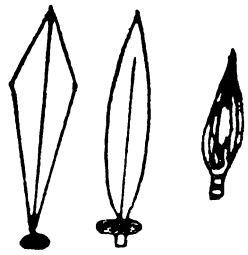

বিভিন্ন রকমের ফলা

নেযার বাঁশের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের হ'ত। যেমন--- রোমকদের নেযা হ'ত খুব লম্বা এবং তাদের বাঁশের লাঠি লোহার পাত দ্বারা ঢাকা থাকত। কিন্তু আরবীয় নেযা সাধারণত দশ-বারো ফুটের বেশী লম্বা হ'ত না।

ভারতীয় ফৌজে নেযার ব্যবহার খুব জনপ্রিয় ছিল না। ভারতীয় অশ্বারোহী সাধারণত তলোয়ার চালনা ও তীরন্দাযীর উপর গর্ববোধ করত। আরব অশ্বারোহীরা হামলার মুহূর্তে প্রথমে নেযা ব্যবহার করত এবং হাতাহাতি যুদ্ধ ও প্রচণ্ড লড়াইয়ের সময় তলোয়ার চালাত। তারা দূর থেকে তীর বর্ষণ করত। অতঃপর

১. এই গ্রন্থকার সৈন্য বিভাগের অশ্বারোহী বাহিনীতেই ভর্তি এবং পয়লা টুর্ণামেন্ট কৃত্রিম যুদ্ধ, যাকে Indian Army-তে Mounted Combat বলা হ'ত, ১৯১৪ সানের ডিসেম্বর মাসে যোগদান করেন। এই প্রতিযোগিতা লাখনৌ ছাউনিতে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হ'ত। এতে প্রতিযোগীরা ইংরেজী, ভারতীয়, ইরানী ও আরবীয় ধাঁচের তলোয়ার ও বল্লম নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতরণ করত যাতে এগুলোর একটির উপর অন্যটির যে প্রাধান্য রয়েছে তার পরিমাপ করা যায়। ১৯১৪ সনের প্রতিযোগিতাই ছিল এধরনের শেষ প্রতিযোগিতা। কেননা বিশ্বযুদ্ধে ট্যাংক ও ফাইটার বিমানের ব্যবহার ঘোড়া ব্যবহারের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে হ্রাস করে দেয়।

www.almodina.com

নেযা চালাত; সবশেষে তলোয়ারের আশ্রয় নিত। আর তলোয়ার ভেঙে গেলে খঞ্জর ব্যবহার করত।

ভালা নামকরণের কারণ এবং এর ব্যবহার

কোন কোন সময় 'ভালা' শব্দটি ভুলবশত নেযার স্থলে ব্যবহার করা হয়। ভালা মূলত পদাতিক সৈন্যদের একটি হাতিয়ার, যা পদাতিক সৈন্যরা সাধারণত আরোহী শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করত। তারা প্রথমে ভালার সাহায্যে শত্রুর ঘোড়ার গতি পাল্টে দিত; অতঃপর তলোয়ারের আঘাত হেনে তার কম্ম সাবাড় করে দিত। ভারতের ইউ, পি, নেপাল প্রভৃতি রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে আজও ভালার ব্যবহার একটি সাধারণ ব্যাপার।

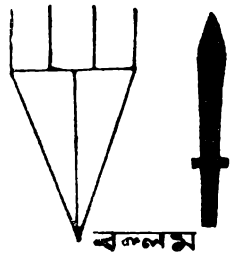
বল্লম

ভারতীয় ভালা এক ডালের হ'ত, আবার কয়েক ডালেরও হ'ত। আরবীয় ও ভারতীয় ভালা লম্বায় আট ফুটের কাছাকাছি হ'ত। অবশ্য রোমক ভালা ২৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা হ'ত। রোমকরা দৌড়ে গিয়ে শত্রুর উপর ভালা নিক্ষেপ করত যাতে করে বহু দূরে অবস্থিত শত্রুর উপরও আঘাত হানা যায়। এভাবে তারা শত্রুর জীবনহানি ঘটাত। বর্তমান যুগে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জ্যাভেলীন নিক্ষেপ এই অস্ত্র চালনারই স্মৃতি বহন করছে।

বল্লম

ঢাল এবং এর প্রয়োজনীয়তা

তলোয়ারের সঙ্গে ঢাল ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। শত্রুর তলোয়ারের আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য এটাকে ব্যবহার করা হ'ত। ঢালের ব্যবহার সাধারণত পায়দল যুদ্ধের মধ্যেই সীমিত।

ঢাল বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন প্রকারের হ'ত। কোনটি গোল, আবার কোনটি সমান্তরাল ক্ষেত্রের ন্যায়। ঢাল গণ্ডারের

www.almodina.com

চামড়া, লোহা, তামা, ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত হয়। এটা পদাতিক সৈন্যকে তীর, তলোয়ার, বল্লম এবং নেযার আঘাত থেকে রক্ষা করে। আরবদের ঢাল তৈরী হ'ত উটের চামড়া দিয়ে, যাকে তাম্রপত্র দ্বারা আরও মযবুত করা হ'ত। ঢালের উপর আরবের লোকেরা চিত্রাংকন করত; বিভিন্ন বাণী কিংবা শ্লোক উৎকীর্ণ করত। এই নিয়ম অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর ভেতরও প্রচলিত ছিল।

লৌহবর্মের গঠনাকৃতি, ব্যবহার ও তার প্রয়োজনীয়তা

আরবে সর্বাধিক মশহুর লৌহবর্মের নাম ছিল 'দিলামন' যা ইস্পাত লৌহ ও কাতান সহযোগে নির্মাণ করা হ'ত। সর্বোত্তম লৌহবর্ম রোম ও পারস্যে নির্মিত হ'ত। দামী হবার কারণে বর্ম সাধারণত অধিনায়করাই পরিধান করতেন। পরবর্তী সময়ে আরব অশ্বারোহী বাহিনীর অশ্বারোহীরাও তা পরিধান করত। অবশ্য রোমক অশ্বারোহী বাহিনীর সব অধিনায়ক ও সৈনিকই বর্ম পরিধান করত। রোমক বাহিনীর পদাতিক সৈন্যরাও কখনো কখনো লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করত।

বর্মের যে অংশ বক্ষকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখে তাকে 'জওশন' বলে। কোন কোন সময় দারিদ্র্যের কারণে কিছু লোক কেবলমাত্র 'জওশন'ই পরিধান করত।

লৌহ শিরস্ত্রাণ (হেলমেট) মস্তকের হিফাজতের জন্য ব্যবহার করা হয়। আরবীতে একে 'বায়দা' এবং 'মিগফার' বলে। শির-স্ত্রাণের আকার-আকৃতি হ'ত কয়েক প্রকারের। আমীর-উমারাদের শিরস্ত্রাণে কারুকার্য ও চিত্রাংকণ থাকত। কোন কোনটির উপর আরবীতে আয়াতে কুরআনীও লিখিত থাকত। রোম ও পারসিকরা শিরস্ত্রাণের উপর নিজেদের ভাষায় চিত্রাংকন ছাড়াও নানা ধর্মীয় শ্লোক উৎকীর্ণ করত।

খঞ্জরের ব্যবহার

খঞ্জর অধিকতর কাছাকাছি অবস্থায় হাতাহাতি যুদ্ধে ব্যবহৃত হ'ত। কোন কোন সময় শত্রুর উপর দূর থেকেই খঞ্জর নিক্ষেপ

www.almodina.com

করা হ'ত। এধরনের আঘাত খুবই কার্যকর হ'ত। আরবের লোকেরা এতে বিশেষ পারদর্শী ছিল।

কুড়াল ব্যবহার

পারসিক এবং রোমকরাই হাতিয়ার হিসাবে কুড়াল ব্যবহার করত। আরবরা এর ব্যবহার থেকে বিমুখ থাকে।

অবরোধ ভেঙে ফেলার যন্ত্রপাতি

আরবরা উন্মুক্ত প্রান্তরের অধিবাসী ছিল বিধায় তাদের কোন কেল্লা ছিল না। অতএব তাদের নিকট অবরোধ ভেঙে ফেলার কোন যন্ত্রও ছিল না। সর্বপ্রথম যিনি এই যন্ত্র সার্থকভাবে ব্যবহার করেন তিনি হচ্ছেন আঁ-হযরত (সা)। রসূলুল্লাহ্‌র দূরদর্শিতা শীঘ্রই মুসলমানদেরকে এই যন্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী করে তোলে।

মিনজানীক

প্রাচীনকালে ফিনিসীয়রাই সর্বপ্রথম মিনজানীক ব্যবহার করে। গ্রীক এবং য়াহূদীরা তাদের নিকট থেকেই এর ব্যবহার শিখেছিল। গ্রীসের রাজা ফিলিপ এই যন্ত্রকে খুবই কার্যকর পন্থায় ব্যবহার করেন। পারসিকরা গ্রীকদের কাছ থেকে এর ব্যবহার শেখে।

মুসলমানরা যখন খায়বার উপত্যকা জয় করে তখন সেখান থেকে কয়েকটি মিনজানীক এবং দুবাবা তাদের হস্তগত হয়। আঁ-হযরত (সা)-এর পরামর্শক্রমে হযরত সালমান (রা) পরে কয়েকটি নতুন যন্ত্র তৈরী করেন।

মিনজানীক কয়েক প্রকারের হ'ত। কতকগুলো তো ট্রিগার টিপলেই চলত। ট্রিগারের Action হ'ত স্প্রীংয়ের উপর। মিনজানীক তীর, পাথর অথবা পেট্রোল জাতীয় তৈলপূর্ণ শিশি শত্রুর উপর নিক্ষেপ করত। কতকগুলো মিনজানীক রশির সাহায্যে ঘুরিয়ে তার দ্বারা বিভিন্ন অস্ত্র শত্রুর উপর নিক্ষেপ করা হ'ত। সাধারণত পাথরই ছিল এমন অস্ত্র যা খুব দূরে এবং খুব জোরে নিক্ষেপ করা যেত।

www.almodina.com

রাশিয়ানরা ১৯৪০-৪৪ সনের যুদ্ধে জার্মান ট্যাংকের উপর

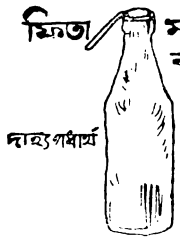

আত্মঘাতী গেরিলা মারফত 'মলোটভ ককটেল'-এর বোতল রশির শিকায় করে ও অন্যান্য নানা উপায়ে ব্যবহার করে এবং এর সাহায্যে তারা জার্মান ট্যাংকে আগুন লাগিয়ে দেয়। অবশ্য এর আগে ট্রেঞ্চ মর্টার ও flame thrower-এর ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। flame thrower-এর অনুরূপ ঐকটি অস্ত্র মিসরের শাসনকর্ত্রী শাহযাদী শুজা'উদ্দুর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাফল্যের সংগে ব্যবহার করে তাদের দাবাবা ও নৌ-বহরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে ছিলেন। এই মুসলিম বীরাঙ্গনা ক্রুসেডারদের বিরাট বাহিনীকে যা গোটা য়ুরোপের সম্রাটগণ ঐক্যবদ্ধভাবে তৈরী করেছিলেন, এমন ভাবে পর্যুদস্ত করেন যে, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্য শক্তিগুলো মুসলমানদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত পায়নি। অতএব একথা ঠিক নয় যে, অগ্নিশিখা নিক্ষেপের যন্ত্রের উদ্ভাবক পাশ্চাত্য দেশীয়---যারা বিশ্বযুদ্ধে এটি তৈরী করে ছিল। মিনজানীকের সাহায্যে এধরনের বস্তু—যেমন দাহ্য তেল ভর্তি শিশি নিক্ষেপ করতে চাইলে দাঁড়ির পাল্লার মত টাঙিয়ে এবং ঘুরিয়ে তা নিক্ষেপ করা হ'ত। এধরনের জিনিসের ওজন হাল্কা বিধায় এর সঙ্গে সীসার গোলা বেঁধে দেওয়া হ'ত যাতে করে এই হাল্কা বস্তুটি বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এভাবে বিশেষ ধরনের তামার নলের ভেতর পুরে ধনুকের সাহায্যে শত্রু সৈন্যের উপর মুষলধারে তীরও নিক্ষেপ করা হ'ত। নীতি ছিল সেই একই যা আজকাল ট্রেঞ্চ মর্টার (Trench Mortar) থেকে গোলা নিক্ষেপের জন্য অবলম্বন করা হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর সর্ববৃহৎ মিনজানীকের নাম ছিল "উরূস" যার কামান টানবার জন্য পাঁচশত লোকের দরকার পড়ত। এই মিনজানীক দ্বারা মুহাম্মদ বিন কাসিম বিরাট বিরাট পাথর নিক্ষেপ করে দেবলের মন্দিরের পতাকা ভূপাতিত করে ছিলেন। এ ঘটনা ৮৯ হিজরীর।

www.almodina.com

দাবাবা এবং তার ব্যবহার

দাবাবা আসলে কাষ্ঠ-নির্মিত একটি চলন্ত দুর্গ। কিছু সৈন্য এর ভিতর ঢুকে শত্রু সৈন্যের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে কেল্লার নিকটে পৌঁছে যেত। তারপর দাবাবার মীনারের সাহায্যে সিড়ি লাগিয়ে দুর্গ-প্রাচীরের উপর আরোহণ করত। দাবাবার অভ্যন্তর ভাগ নিরাপদ হবার কারণে সম্মুখে অগ্রসর হবার সময় শত্রু বাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীরের হাত থেকে তারা বেঁচে থাকত। কতক দাবাবার সম্মুখ ভাগে লোহার তীক্ষ্ণ ফলকযুক্ত দণ্ড থাকত যার দ্বারা কেল্লার দরজায় অথবা প্রাচীরে ছিদ্র করা হ'ত।

এই যন্ত্রটি মিনজানীক অপেক্ষাও প্রাচীন। এটি সর্বাগ্রে মিসর-বাসী, অতঃপর গ্রীক ও পারসিকরা ব্যবহার করে। মুসলমানদের হাতে এই যন্ত্রটি খায়বার থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে আসে।

মুসলমানরা এই যন্ত্রের ভেতর নতুনত্ব আনেন। তারা দাবাবাকে সিরকা (টক ও ঝাঁঝযুক্ত পানীয়)-সিক্ত পশমী কাপড় দ্বারা মুড়িয়ে দেন। ফলে এই কাষ্ঠ-নির্মিত কেল্লাটি শত্রুর আগুনের হাত থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। কেননা সিরকায় সাধারণত আগুন ধরে না।

ক্রুসেডাররা এই রহস্য জানত না। তাই শাহযাদী শুজা'উদ্দুর-এর মুজাহিদ বাহিনী ক্রুসেডারদের দাবাবাতে সহজেই আগুন লাগিয়ে দেয়। ক্রুসেডাররা এ ধরনের আক্রমণের সঙ্গে পরিচিত ছিল না বিধায় তাদের অসংখ্য সৈনিক এ সব দাবাবার ভেতর জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্রুসেডাররা এর নাম দিয়েছিল 'শয়তানী আগুন'। কাষ্ঠ-নির্মিত দাবাবাকে সিরকা-সিক্ত করে আগুনের হাত থেকে নিরাপদ করার এই গোপন রহস্য দীর্ঘকাল যাবত আরব ছাড়া অন্য সকলের কাছেই অজ্ঞাত ছিল।

কাব্‌শ

কাব্‌শ দাবাবা জাতীয়ই একটি অস্ত্রের নাম। দাবাবার মাথাকে বারবার প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে প্রাচীরের মধ্যে ছিদ্র এবং ফোঁকরের

www.almodina.com

সৃষ্টি করা হ'ত। কিন্তু এটা এমন সব কেল্লার ক্ষেত্রে বেকার প্রমাণিত হ'ত—যে কেল্লার প্রাচীরের আশেপাশে পরিখা খনন করা থাকত। এই পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য কাবৃশ তৈরী করা হয়। এতে একটি লম্বা মোটা বলি লাগান থাকত যার সম্মুখ ভাগে নলের মাথায় থাকত সূঁচালো লোহা। এই লম্বা বলির সাহায্যে পরিখার অপর পারের প্রাচীর গাত্রে জোরে জোরে আঘাত হানা হ'ত। এতে প্রাচীরে ফাটল ও ছিদ্রের সৃষ্টি হ'ত।

মুসলমানরা তাদের বাহিনীতে বিভিন্ন রকমের মিনজানীক, দাবাবা ও কাবৃশ রাখত। কোন কোন সময় ঐ সব দাবাবা ও কাবৃশ-এর সাহায্যে পরিখা ভরাট করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের সাজ-সরঞ্জাম, যেমন---লাকড়ী, বালির বস্তা প্রভৃতি বহন করে নিয়ে যাওয়া হ'ত। অনেক সময় তীরন্দায কাবৃশ-এর ভেতর বসে থেকে নিকট থেকে দুর্গের ভেতর অবস্থানকারী শত্রুর উপর তীর নিক্ষেপ অথবা কেরোসিন তেলের সাহায্যে দুর্গের দরওয়াজায় আগুন লাগিয়ে দিত।

গ্রীক-অগ্নি

গ্রীক-অগ্নি আসলে এশিয়াবাসীর আবিষ্কার। রোমকরা কালিংকূস নামীয় একজন সিরীয়বাসী থেকে এটি খরিদ করে এবং এর সাহায্যে তারা কনস্টান্টিনোপল জয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কয়েকটি আরব হামলা ব্যর্থ করে দেয়। রোমকরা এর আসল নাম ও কার্য-প্রকৃতি গোপন রাখার উদ্দেশ্যে এর নাম দেয় 'গ্রীক-অগ্নি'।

আরবরা শেষাবধি এর রহস্য জেনে ফেলে এবং ক্রুসেড যুদ্ধে মিসরীয়রা এটি সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিল। আরবরা গন্ধক তৈল জাতীয় কিছু বস্তু এবং কেরোসিন তেলের সংমিশ্রণে এটা বানাত। এই উপকরণসমূহ তারা জাহাজের সম্মুখে রক্ষিত তামার নলের মাধ্যমে শত্রুর উপর নিক্ষেপ করত। অতঃপর সেই দাহ্য বস্তুতে তীরের সাহায্যে আগুন লাগিয়ে দিত। এই উপকরণ ও মৌলিক পর্দাথকে কাপড়ের টুকরোর উপর ফেলে কেল্লা কিংবা জাহাজের উপর মিনজানীক দ্বারা নিক্ষেপ করে তার ভেতর বিভিন্ন পন্থায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হ'ত।

www.almodina.com

হুসায়ন বিন নুমায়র 'আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়রকে অবরোধ করবার সময় খানায়ে কা'বার 'গিলাফ' এই উপকরণের সাহায্যেই জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

বারুদের ব্যবহার

বারুদ আবিষ্কারের কৃতিত্বও আরবদেরই। এটা ঠিক নয় যে, ফিরিঙ্গীরা এটি আবিষ্কার করেছিল। কেননা ফিরিঙ্গীদের দাবী অনুসারে বারুদ আবিষ্কারের কৃতিত্ব 'শুয়ারেঞ্জ' নামক এক ব্যক্তির যিনি ১৩২০ ঈসায়ীতে এটি ব্যবহার করেন। অতএব এটির আবিষ্কারক যে আরবরাই---সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

যুদ্ধ-পদ্ধতি এবং আরব

বেদুঈন গোত্রগুলো ইসলাম-পূর্ব অন্ধকার যুগে একটি বিশেষ ধারা ও রীতিতে যুদ্ধ করত। এই রীতিকে বলা হ'ত 'কার' ও 'ফার'- -যার শাব্দিক অর্থ শান-শওকত ও ধুমধাম।

আরবরা ছিল স্বাধীন প্রকৃতির। তবে কবীলার সরদারের আনুগত্যকে তারা ফরয জ্ঞান করত। কিন্তু এই আনুগত্য হ'ত শৃংখলা-বিহীন। যুদ্ধের জোশে তারা একেবারে প্রতিপক্ষের উপর ঝাপিয়ে পড়ত এবং সকল সরদারই একে অপরের মুকাবিলায় সম্মুখে এগিয়ে যাবার প্রয়াস পেত। যার ফল হ'ত এই যে, এরা শত্রুর উপর একই সময় সংহতভাবে হামলা করতে পারত না। আর ঘটনাচক্রে যে সব লোক অবশিষ্ট লোকদের তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে যেত—তারা মারা গেলে কিংবা আহত হ'লে বাকী সকলেই সুবিধা মাফিক সময় হামলা করার অপেক্ষায় থাকত।

যুদ্ধের সময় হামলা করবার পূর্বে এরা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র ও সওয়ারী উটগুলোকেও একত্র করে একটি সুরক্ষিত স্থানে রেখে যেত। একে তারা বলত 'মাজহোযা'। জয় ও পরাজয় উভয় অবস্থায়ই তারা এইস্থানে একত্রিত হ'ত।

আমরা (গ্রন্থকার) যখন ১৯১৪-১৬ ঈসায়ীতে আরব গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করি, তখনও সাধারণ বেদুঈন গোত্রগুলোর মধ্যে

www.almodina.com

এই রীতির প্রচলন দেখেছি। মনে হচ্ছিল যেন এই সব লোক আঁ-হযরত (সা)-এর উদ্ভাবিত যুদ্ধ-পদ্ধতি ভুলে গেছে। তিনি (রসূল করীম) স্বীয় পন্থার নাম দিয়েছিলেন 'যাহ্·ফ'—আর তা এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে ঃ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক নিশ্চিতই সেই সব লোককে ভালবাসেন যারা আল্লাহ্র রাস্তায় 'সীসা ঢালা প্রাচীরের' ন্যায় কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে।"

হাদীছ পাকেও ইরশাদ করা হয়েছে--

"একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় যার এক অংশ অপর অংশকে শক্ত রাখে।" এরই ভিত্তিতে আঁ-হযরত (সা) মুজাহিদবৃন্দকে এমন সোজা করে কাতারবন্দী করতেন যেমনটি সালাতের জন্য করা হ'ত। হামলার সময় লক্ষ্য রাখা হ'ত যেন কাতার বরাবর সোজা থাকে।

হযরত 'আলী (রা) সিফ্ফীন যুদ্ধের সময় (৩৭ হি.) স্বীয় বাহিনীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"নিজেদের কাতার সোজা, সুদৃঢ় ও মযবুত প্রাচীরের ন্যায় বানিয়ে নেবে। বর্মধারীদেরকে সম্মুখে রাখবে। যারা বর্মহীন তারা বাহিনীর পেছনে থাকবে। অটুট মনোবল নিয়ে এগিয়ে যাবে। বল্লমের ফলাগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে এবং লক্ষ্য-বস্তুর দিকে তাক করে রাখবে ; চীৎকার করবে না। লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানতে নিশানা অব্যর্থ রাখবে, পতাকা অবনত হতে দেবে না। কেবলমাত্র তারাই পতাকার মুহাফিজ হবে যারা বাহাদুর। সত্যকে আঁকড়ে ধরবে এবং ধৈর্য অবলম্বন করবে। আর ধৈর্যের মাধ্যমেই কেবল বিজয় ও আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসে।"

এই বিধান ও নির্দেশ অটল। তবে একে সঠিকভাবে কাজে লাগানো অধিনায়কের বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে। এ যুদ্ধ-নীতি আঁ-হযরত (সা) কায়েম করেছিলেন। যেহেতু হযরত 'আলী (রা) কয়েকবার আঁ-হযরত (সা)-এর নেতৃত্বাধীনে লড়াই করেছিলেন, তাই তিনি তাঁর যুদ্ধের মূলনীতি সম্পর্কেও ওয়াকিফ ছিলেন। সময় অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা এই যুদ্ধ-

www.almodina.com

নীতির সঠিক তাৎপর্য ভুলে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ইমাম ইব্‌রাহীম বিন 'আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন 'আলী (রা) যখন 'আব্বাসী খলীফা মনসূর প্রেরিত ফৌজের মুকাবিলায় এসে উপস্থিত হন, যার আমীর ছিলেন 'ঈসা বিন মূসা, তখন ইমাম ইব্‌রাহীমকে তাঁর উপদেষ্টাবৃন্দ পরামর্শ দেন যেন তিনিও স্বীয় ফৌজকে 'ক্রডিস"-এর যুদ্ধনীতির উপর পরিচালনা করেন। কিন্তু ইমাম এই যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, "আমরা ইসলামের কাতারবন্দী ভিন্ন অন্য কোন কাতারবন্দী এখতিয়ার করতে পারি না।" যুদ্ধে ইমাম ইব্‌রাহীমের পরাজয় ঘটে। এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে আঁ-হযরত (সা)-এর যুদ্ধনীতি (আল্লাহ্‌র পানাহ্ চাই) এত স্বল্পকালের ব্যবধানেই কি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল? যদি তা না হয় তাহলে এই পরাজয় কেন হ'ল?

ক্রডিস-এর উপর এক নজর

এই প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য আমরা প্রথমে 'ক্রডিস'-এর যুদ্ধ নীতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

ক্রডিস-এর সংজ্ঞা

ক্রডিস গ্রীক শব্দ (Croat) থেকে উদ্ভূত। এটি ছিল একটি যুদ্ধ-পদ্ধতি; সম্ভবত আলেকজাণ্ডার কিংবা তাঁর পিতা ফিলিপ এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। এই যুদ্ধনীতির অধীন অধিনায়ক তাঁর অধীনস্থ ফৌজকে নিম্নরূপ বিন্যস্ত করতেন ঃ

মুকাদ্দামা---(Advance Guard) অগ্রগামী বাহিনী।

মায়মানা---(Right flank) দক্ষিণবাহু।

কাল্‌ব আল-জায়শ---(Main body), মূল বাহিনী যেখানে সম্রাট কিংবা সর্বাধিনায়ক পতাকাসহ অবস্থান করেন।

মায়সারা---(Left flank), বাম বাহু।

সাকা---(Rear Guard), পশ্চাদ রক্ষী বাহিনী।

এই যুদ্ধনীতির অধীন গ্রীকরা, অতঃপর রোমকরা নিজেদের বাহিনীকে কয়েক অংশে বিভক্ত করে সেই সব অংশকে বৃত্তাকারে দাঁড় করিয়ে দিত যাতে করে শত্রুবাহিনী এক অংশকে চাপ দিয়ে

www.almodina.com

পর্যুদস্ত করে দিলেও অন্য অংশ আপন স্থানে অটল থেকে শত্রুর অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে পারে। এ লক্ষ্য সোজাসুজি কাতারে অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ মূতার যুদ্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে রোমকদের যুদ্ধনীতি পরখ করে দেখেন। অতঃপর এই নীতিকে নতুন রূপে ও নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজিয়ে রোমকদের বিরুদ্ধে প্রথমে মূতার যুদ্ধে, অতঃপর ইয়ারমূক যুদ্ধে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তা প্রয়োগ করেন। এতে তিনি যে পরিবর্ধন করেন তা হ'ল, বাহিনীর প্রতিটি অংশে এই নীতিমালাকে দৃঢ়তার সাথে বজায় রাখা যাতে মুজাহিদদের ভেতর ঐক্য ও সংহতি কায়েম থাকে এবং তারা একটি প্রাচীরের ন্যায় অগ্রসর হয়ে শত্রুর উপর আঘাত হানতে পারে। উপরন্তু তিনি অশ্বারোহী প্লাটুনকে এক জায়গায় এবং পদাতিক বাহিনীকে অন্য জায়গায় সন্নিবেশিত করেন।

খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর কাতারকে হাদীছে নববীর নির্দেশিত পন্থায় সোজা ও মিলিতাবস্থায় রাখেন। অবশ্য Echelon-এর মূলনীতি অনুযায়ী তিনি তাদেরকে নিম্নরূপ অগ্র-পশ্চাৎ করে দাঁড় করান ঃ

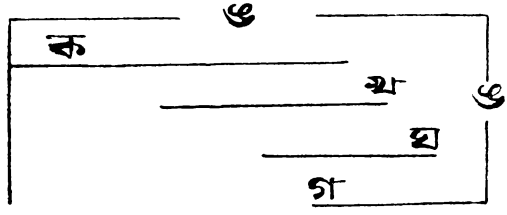

ফলে শত্রুরা মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারেনি। সমরকুশলী খালিদ (রা) তাঁর অল্প সংখ্যক সৈন্যকে শত্রুর সামনে এমনভাবে পেশ করেন যে, তাদেরকে সংখ্যায় অনেক বেশী দেখায়। ফলে শত্রুরা হয়ে পড়ে ভীত-সন্ত্রস্থ।

এই যুদ্ধনীতির ফলে বাহিনীর প্রতিটি পার্শ্ব শত্রুর অতর্কিত ও আকস্মিক হামলার হাত থেকে নিরাপদ থাকে। ঘটনাচক্রে দুশমন ফৌজের একটি অংশকে কুপোকাত করে ফেললেও অপরাংশ

www.almodina.com

তাদের সাহায্যে এগিয়ে এ সে শত্রুর উত্তাল গতিকে থামিয়ে দিতে পারত। মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর পূর্বসূরী প্রখ্যাত সিপাহসালার খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদের সত্যিকার অর্থেই শাগরিদ ছিলেন। কেননা তিনিও কয়েকটি যুদ্ধে এই নীতি অবলম্বন করে জয়লাভ করেছিলেন।

আঁ-হযরত (সা)-এর উপযুক্ত শাগরিদ হযরত আবূ বকর (রা) এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ তাঁদের বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেভাবে বিন্যস্ত করতেন তা হ'ল,

১. দ্বিতীয়ার চাঁদের মত বাঁকা ফলাযুক্ত অথবা এই রকম 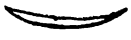 সোজা। এই যুদ্ধনীতি দ্বারা শত্রু ফৌজকে ঠিক সেভাবে দাবানো হ'ত যেভাবে একজন কুস্তীগীর তার প্রতিপক্ষকে দুই বাহুর মাঝে দাবিয়ে ফেলে।

২. সংযুক্ত চাঁদ অর্থাৎ গোটা বাহিনীকে তিন অংশ ভাগ করে দেওয়া হ'ত এবং তিনটি অংশকে চাঁদের আকারে দাঁড় করান হ'ত। এই মূলনীতি সাধারণত অশ্বারোহী বাহিনীর ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হ'ত যাতে করে শত্রু সেনাকে জয়লাভের ক্ষেত্রে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলা যায়। পরাজয়ের অবস্থায় নম্বর ১ এবং নম্বর ৩ চন্দ্র নম্বর ২ কে সাহায্য করত।

৩. তৃতীয় পন্থা চতুর্ভুজ কিংবা সমান্তরাল ক্ষেত্রের ন্যায় ক্রডিস। এই পন্থা পদাতিক বাহিনীকে অশ্বারোহী বাহিনীর হামলা থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবলম্বন করা হ'ত। বিশেষ করে ছাউনী ফেলার সময় অথবা রাত্রিকালীন অতর্কিত হামলার হাত থেকে বাঁচবার জন্য এই পন্থা অনুসরণ করা হ'ত।

৪. উল্টা চাঁদ ; এই পন্থা সাধারণত জঙ্গল কিংবা অসমতল ভূমিতে অগ্রসর হবার মুহূর্তে অবলম্বন করা হ'ত, যাতে

www.almodina.com

করে জ্ঞাত দিক থেকে হামলাকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা যায়। এই নীতি সাধারণত অশ্বারোহী প্লাটুন স্বীয় সেনাদলকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে অনুসরণ করত।

৫. চতুর্ভুজ অথবা সমান্তরাল ক্ষেত্র ; এটি ছিল রোমক ও পারসিক পদ্ধতি। ইসলামী ফৌজ এ পদ্ধতি ব্যবহার করেনি। অবশ্য ইংরেজরা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে এই যুদ্ধনীতিকে সফল ও সার্থকভাবে অনুসরণ করেছিল।

৬. ত্রিভুজ যুদ্ধনীতিকে মুসলিম মুজাহিদবৃন্দ সেকেন্দ্রা ও দারার যুদ্ধে ইরানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিল।

ইসলামী ফৌজ যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রিবেলা বিশ্রাম নেওয়ার সময় এবং শত্রুর আকস্মিক ও অতর্কিত হামলা থেকে নিরাপদ থাকবার জন্য এই যুদ্ধনীতিকে প্রয়োগ করত। মিত্রশক্তি ও জার্মানী কয়েক-বার বিশ্ব-যুদ্ধগুলোতে সাফল্যের সঙ্গে হামলার মুহূর্তে এই যুদ্ধনীতির পুনরাবৃত্তি করে।

'আন্-নাফীর! আন্-নাফীর!' যখন ফৌজের আমীর কিংবা অধি-নায়ক "আন্-নাফীর" বলে আওয়াজ দিতেন তখন এর অর্থ হ'ত, 'হামলা কর'।

'আর-রাজ'আ! আর-রাজ'আ!' স্বীয় আমীরের মুখ থেকে 'আর-রাজ'আ' আওয়াজ শুনে সেনাবাহিনী মনে করত যে, এসময় হামলা করা সমীচীন হবে না।

'আল-খায়ল!' আওয়াজে অশ্বারোহী বাহিনী শত্রুর উপর আক্রমণোদ্যত হ'ত।

'আল্-আব্‌দ!' আওয়াজ শ্রবণ করতেই আরোহী তার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়ত যেন জানোয়ারগুলো বিশ্রাম পায়।

মোট কথা, আজকাল যেমন বিউগল, আওয়াজ কিংবা ইশারা-ইঙ্গিতে নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া হয়—ঠিক তেমনিভাবে মুসলিম ফৌজে বিভিন্ন ধরনের গতিবিধির জন্য বিভিন্ন বিধি-বিধান ও ইশারা-ইঙ্গিত

www.almodina.com

চালু ছিল। যেমন---ইত্তিবা'উ'ল-মায়সারা, ইত্তিবা'উ'ল-মায়মানা, জায়শ মাখরাফ, জায়শ মুস্তাকীম, জায়শ সূরাব, তাকাদ্দুম, হাশ্‌ও তারতীব বা'দ, তারতীব আল-ইনকিলাব, আল-ইনফিতাল ইত্যাদি।

'হূজওফা'---'হূবরা'! যে সময় অধিনায়ক এটা চাইতেন যে, স্বীয় সেনাবাহিনীকে কোন দিকে টেনে নিয়ে যাবেন অথবা তাকে বিশেষ কোন অবস্থা অর্থাৎ যুদ্ধনীতি, যেমন---চাঁদ ইত্যাদি মুতাবিক সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত করবেন তখন সৈন্যেরা ঐসব শব্দ শোনার পর স্বীয় অধিনায়কের ইঙ্গিতের অপেক্ষা করত। যেমন, "হূজওয়া" শুনতেই সৈন্যরা স্বীয় অধিনায়কের দিকে চলা শুরু করত এবং "হবরা" শোনার পর এর বিপরীত কর্মটি করত অর্থাৎ ফিরে যেত।

'শি'আর!' একে আজকাল Pass word বলা হয়। আঁ-হযরত (সা) এটির প্রচলন করেন যেন ইসলামী ক্যাম্পে তথা মুসলিম সেনা-শিবিরে কোন গুপ্তচর (বিশেষ করে) রাত্রিবেলা আসতে না পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুহাজিরদের সাংকেতিক চিহ্ন ছিল, 'ইয়া বনী 'আবদি'র-রাহ'মান!' এবং আনসারদের ছিল,---'ইয়া বনী 'উবায়দুল্লাহ!' এই সাংকেতিক চিহ্ন কিন্তু বরাবর পরিবর্তিত হ'তে থাকত যাতে করে আপন ও পরের মাঝে পরিচয় খুঁজে বের করা যায়।

এখন আমরা কাতারবন্দী সম্পর্কে আমাদের মতামত পেশ করা সমীচীন মনে করছি। উক্ত যুদ্ধ পদ্ধতি প্রচলন করার সময় আঁ-হযরত (সা)-এর সম্ভবত নিম্নরূপ উদ্দেশ্য ছিল (আল্লাহ্‌ই সঠিক জানেন) ঃ

১. ফৌজ---বিশেষ করে অশ্বারোহী বাহিনী এমন একটি প্রাচীরের মত শত্রুর দিকে অগ্রসর হবে যার ভেতর কোন ফাটল থাকবে না এবং তা কোনরূপ অসমঞ্জস কিংবা বাঁকা-তেড়া হবে না।

ফাটলের কারণে উৎসাহী দুশমন মুজাহিদদের কাতারের ভেতর ঢুকে পড়তে পারে এবং এর প্রতিক্রিয়া প্রায় সময়ই খারাপ হতে বাধ্য।

অসমঞ্জস হবার কারণে হামলার টক্কর শত্রুর উপর একই সঙ্গে গিয়ে পড়ে না। এটা খুবই স্পষ্ট যে, যখন কয়েক হাযার সিপাহীর প্রচণ্ড ভীড় ও চাপ শত্রুর উপর আছড়ে পড়ে তখন তাদের সমস্ত আশা-ভরসা ও হিম্মত কর্পূরের মতই উবে যায়।

www.almodina.com

২. কাতারসমূহ সুবিন্যস্ত করবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এতে শত্রুর হামলার আঘাত বরাবর উপর্যুপরি পড়তে থাকবে। পশ্চিমা ভাষায় আধুনিক নীতিতে একে Successive Attacks বলা হয়। এই মূলনীতি পাশ্চাত্য অধিনায়কগণ অশ্বারোহী বাহিনীর ক্ষেত্রে এবং আজকাল ট্যাংক ও বিমান হামলার সময় প্রয়োগ করে থাকেন।

জার্মান ফৌজ ১৯৪০ ঈসায়ীতে এই যুদ্ধনীতিকে (মূলত যা ইসলামী) সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে সমগ্র মিত্রবাহিনীকে য়ুরোপ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। মিত্রশক্তির সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেন হাওয়ার এই সোনালী নীতির অধীনে ১৯৪৪ ঈসায়ীতে রাইন নদী অতিক্রম করেছিলেন।

ব্রুডিস নীতি মিত্রবাহিনী এবং জার্মান জেনারেল রোমেল উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধগুলোতে এখতিয়ার করেছিলেন। দু'পক্ষের যেসব সেনানায়ক এই মূলনীতিকে যত সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন তার বাহিনী প্রতিপক্ষের উপর তত বেশী জয় লাভ করেছে।

ত্রিভুজ—এই যুদ্ধনীতিকে পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞগণ Spear Head নামে অভিহিত করেন। হিটলারের কমাণ্ডার-ইন-চীফ এই মূলনীতির উপর আমল করে ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রতিরক্ষা মোর্চা মেজনিউ লাইন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

চন্দ্র ও যুক্ত চন্দ্র—এমন যুদ্ধনীতি ছিল যা মিত্র বাহিনী এবং ট্যাংক ফৌজের কম্যাণ্ডারগণ উত্তর আফ্রিকায় প্রয়োগ করেন।

উল্লিখিত নীতিগুলোকে মুহাম্মদ বিন কাসিম মওকামত সাফল্যের সংগে প্রয়োগ করেন।

এই আলোচনা সাধারণের জন্য কিছুটা বিস্তারিতভাবে এজন্য করা হ'ল যেন তারা সেই সমরনীতি—যার বুনিয়াদ স্বয়ং আঁ-হযরত (সা) নিজ হাতে রেখেছিলেন এবং মুসলিম সেনাপতিগণ বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, পাশ্চাত্য বিশ্ব তার মধ্যে যে খুব কমই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে, তা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

ভাবতে কষ্ট লাগে, আমরা আজ ভুলেই গেছি যে, আমরা অতীতে কি ছিলাম! ঐ সব কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই

www.almodina.com

আমার এ লেখনী চালনা। আশা করি, আমার চেয়েও যোগ্য ও উপযুক্ত কোন লেখক এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন এবং প্রকৃত ঘটনা সাধারণের সামনে তুলে ধরবেন যাতে আমাদের আত্মসত্তা পুনরায় জাগ্রত হয় এবং আমরা পুনরায় মর্দে ময়দান ও মর্দে মুজাহিদ হবার যোগ্যতা অর্জন করি।

এ কাজ যে সহজ নয় তা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো আর চলবে না। যথাসাধ্য দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। হযরত আবু বকর (রা) বলেছেন ঃ মুসলমানগণ! তোমাদের মধ্যে কেও যেন জিহাদ থেকে বিমুখ না হয়। কেননা কোন জাতিগোষ্ঠী একবার জিহাদ পরিত্যাগ করলে আল্লাহ তাদেরকে অপদস্থ না করে ছাড়েন না।

ইসলামে নৌ-বহর

মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযানে নৌ-বাহিনীর সহযোগিতা খুবই কাজে লেগেছিল। এজন্য আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ ফৌজী শাখা সম্পর্কেও কিছু তথ্য পেশ করাকে অপরিহার্য বিবেচনা করছি।

হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা মুতাবিক মুসলিম বাহিনী যখন যু'ল-কিসসা থেকে রওয়ানা হয় তখন হযরত মু'আবিয়া এবং তাঁর ভাই য়াযীদ বিন আবী সুফিয়ান (রা) "ছাগূর" অর্থাৎ সমীন্তবর্তী স্থান-গুলো জয় করার নির্দেশ পান। ছাগূরকে 'আব্বাসী খলীফা হারূনুর রশীদ "আওয়াসিম" নামে অভিহিত করেন। সিরিয়ার সীমান্ত এলাকা এবং তার আশেপাশের স্থানগুলো ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

এসব সমুদ্রোপকূলীয় এলাকা যেমন—বায়রূত, জাবীল, সায়দা ইত্যাদি মুসলমানরা প্রথম আক্রমণেই রোমকদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু অল্প দিন পরই রোমকরা ঐ সব শহরের উপর পুনরায় কবজা জমিয়ে বসে। কেননা রোমকেরা তাদের নৌ-বহরের সাহায্যে অতি সহজেই তাদের ফৌজ, সমরাস্ত্র রসদ-সম্ভার ও সাহায্যকারী বাহিনীকে সমুদ্রোপকূলের যে কোন জায়গায় নামিয়ে দিতে পারত।

হযরত মু'আবিয়া (রা) যখন সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন তখন তিনি হযরত ওমর (রা)-এর নিকট নৌ-বহর নির্মাণের অনুমতি

www.almodina.com

প্রার্থনা করেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) অনুমতি দেন নি। হযরত 'উছমান (রা)-এর খেলাফত আমলে হযরত মু'আবিয়া (রা) মুসলিম নৌ-বহরের বুনিয়াদ রাখেন এবং খুব শীঘ্রই সেটাকে শক্তিশালী করে তোলেন। আরববাসী সাধারণভাবে এবং হেজাযবাসী বিশেষভাবে সামুদ্রিক সফরে ভয় পেত। এজন্য তাদের যেসব তেজারতী কাফেলা মিসর ও আবিসিনিয়ায় যেত সেগুলো কেবল শুষ্ক রাস্তা এখতিয়ার করত। অথচ ঐ সমস্ত রাস্তা সমুদ্র পথের চেয়েও বেশী দুরূহ ও দীর্ঘ ছিল। ২৮ হিজরীতে কাবরিস (সাইপ্রাস) জয় এবং ৭২০০ মুদ্রা বার্ষিক জিয়য়া প্রাপ্তি মুসলমানদেরকে সমুদ্র সফরের প্রতি উৎসাহী করে তোলে।

হযরত মু'আবিয়া (রা) রোমক বন্দীদের সাহায্যে আরবদেরকে নৌ-চালনা বিদ্যা ও জাহাজ নির্মাণের কলা-কৌশল শিখাবার একটি কেন্দ্র খোলেন। সেখানে জাহাজের উপযোগী যুদ্ধাস্ত্রও তৈরী হ'ত। ঐসব নৌ-স্কুলকে আরবরা "নরসানা" নামে অভিহিত করত। আর যেখানে নৌ-বহর একত্র করা হ'ত তাকে বলা হ'ত "উসতুল"। উসতুলগুলো ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল।

উন্নত মানের "নরসানা" সর্বপ্রথম তিউনিসে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যুদ্ধ বহরের সঙ্গে আরবরা জাহাজের উপর নিজেদের বাণিজ্য-সম্ভারও চাপিয়ে দেয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধুর উপর হামলা পরিচালনার পূর্বে আরবদের বাণিজ্য জাহাজ এবং সেই সঙ্গে ইসলামের প্রচার ব্যাপদেশে 'উলামা ও মুবাল্লিগবৃন্দ চীন ও শ্রী-লংকায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। ঠিক এধরনেরই একটি সামুদ্রিক কাফেলা লুট করবার অভিযোগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরের উপর হামলা করেন। সবচেয়ে বড় ধরনের জাহাজকে "শূনা" বলা হ'ত। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এতে সৈন্য আরোহণ করত এবং শত্রু জাহাজের উপর হামলা চালিয়ে তাকে পরাভূত করত।

'হাওয়াফা' ধরনের জাহাজে 'মিনজানীক' স্থাপন করা হ'ত। এর সহায্যে শত্রুর জাহাজের উপর তৈল সংযুক্ত অগ্নি-গোলক নিক্ষেপ করা হ'ত এবং শত্রু জাহাজে আগুন ধরিয়ে তা জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ত। সমুদ্রে ব্যবহার উপযোগী মিনজানীককে 'উরাদাহ' নামে অভিহিত করা হ'ত।

www.almodina.com

'তার্রাদাহ' বলা হ'ত এক প্রকার দ্রুত গতিসম্পন্ন নৌকাকে। সাধারণত তা সংবাদ সংগ্রহ ও গোয়েন্দাগিরীর কাজে ব্যবহৃত হ'ত।

যে সব নৌকা নদীতে চলত সেগুলোকে 'আশশারিয়াত', 'গুলুন্দাত', এবং 'মিসতাহাত' নামে অভিহিত করা হ'ত। 'আশশারিয়াত' নদীতে যুদ্ধ জাহাজের ভূমিকা পালন করত, কিন্তু 'গুলুন্দাত' ও 'মিসতাহাত' অপরাপর কাজে ব্যবহৃত হ'ত।

নৌ-সেনাদের হাতিয়ার ছিল নিম্নরূপ ঃ

যেরা, খোদ, ফলা, ঢাল, ভালা, কামান, তীর, কালালীব এবং বাসী-কাফ। লৌহ শৃংখলকে 'বাসীকাফ' বলা হ'ত। এর অগ্রভাগে আকড়া লাগান থাকত। শত্রু জাহাজের কাছে গিয়ে তা টেনে নিয়ে উক্ত আকড়ার সাহায্যে নিজেদের জাহাজের সংগে বেঁধে ফেলা হ'ত। এভাবে সৈন্যরা শত্রু জাহাজের উপর আরোহণ করে তাদেরকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করত।

আরবরা সামুদ্রিক যুদ্ধের নতুন পন্থা আবিষ্কার করে। তারা জাহাজের মাস্তুলের উপর সিন্দুক বানায়। সৈন্যরা ঐ সিন্দুকে বসে সুযোগমত দাহ্য তেল সংযুক্ত অগ্নি-গোলা বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে শত্রুর জাহাজের উপর নিক্ষেপ করত। তারা 'আর্রাদাহ্র মাধ্যমে সাপ ও বিচ্ছু ভর্তি পাত্রও শত্রু জাহাজের উপর নিক্ষেপ করত।

শত্রু জাহাজকে ডুবিয়ে দেবার জন্য আরব জাহাজগুলোর সম্মুখ ভাগে তীরের মত, আবার কখনো বর্শার মত, হাতিয়ার লাগান হ'ত। এই তীর কিংবা বর্শাকে জাহাজীরা ইচ্ছা মাফিক যে কোন দিকে ঘোরাতে পারত। হাতিয়ারের কার্যকর আঘাত শত্রু জাহাজে ফাটলের সৃষ্টি করত। অতঃপর এই ফাটল দিয়ে পানি ঢুকে জাহাজ ভর্তি হয়ে যেত। এই হাতিয়ারকে "লিজাম" এবং "আসতাম" বলা হ'ত।

জাহাজীদের জন্য রাতের বেলা আগুন জ্বালানো অথবা গান গাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। জাহাজের উপর মোরগ কিংবা কুকুর রাখারও অনুমতি ছিল না। সাধারণত জাহাজগুলোকে উপকূলের পরিবেশ মাফিক রাঙিয়ে দেওয়া হ'ত যাতে দুশমনরা ঐ সব জাহাজকে দূর থেকে দেখতে না পারে। এ ধরনের কাজকে আজকাল Camouflage বা দৃষ্টিভ্রম ঘটানো বলা হয়।

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিম সামুদ্রিক নৌ-বহরকে ভারী মালামাল পরিবহনের কাজে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি নদীগুলোতে নৌকার সাহায্যে পুল বানাবার কাজও জাহাজীদের উপর সোপর্দ করে ছিলেন। মোট কথা, এই যোগ্য ও উপযুক্ত মহান অধিনায়ক স্থল-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীকে সমভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। একে আজকাল Combined operation নামে অভিহিত করা হয়।

আরবেরা নিজেদের জাহাজগুলোকে শত্রুর অগ্নি হামলা থেকে বাঁচাবার জন্য রেশম কিংবা পশমী চট সিরকায় ভিজিয়ে জাহাজের চতুর্দিক মুড়িয়ে নিত এবং শত্রুর আগুনের গোলাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য সিরকা ও এক প্রকার উদ্ভিদ দ্বারা খামীরকৃত মাটি ব্যবহার করত। এসব জিনিস "গ্রীক অগ্নি"কে ঠাণ্ডা ও অকেজো করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ছিল।

ছাউনী এবং পদ্ধতি

মুহাম্মদ বিন কাসিম এই নীতি নির্ধারণ করেছিলেন যে, যেখানেই কিছুদিনের জন্য ছাউনী ফেলা হবে সঙ্গে সঙ্গে তার আশে-পাশে পরিখাও খনন করা হবে। ছাউনীকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হ'ত। পরিখা পাহারা দেবার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত হ'ত যারা দরকারী মুহূর্তে রিজার্ভ বাহিনীকে সংবাদ দিত।

রাস্তার চৌকীগুলি সর্বাবস্থায় নিজ নিজ অবস্থানে অবিচল থাকত। মধ্য ভাগে নারী, শিশু, অসুস্থ মানুষ এবং সর্বাধিনায়ক অবস্থান করতেন। রসদ-সম্ভার এবং সমরাস্ত্র এখানেই থাকত।

সংবাদদাতা

প্রতিটি ফৌজের সঙ্গে লিপিকারদের একটি দল থাকত যাদের কাজে ছিল সর্বাধিনায়ককে শত্রুর অবস্থা সম্পর্কে লিখিতভাবে অবহিত করা। এরা রাজধানীকেও স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে অবহিত রাখত। এমনকি সর্বাধিনায়কের ভেতর বিশৃঙখল ও ভারসাম্যহীন অবস্থা পরিলক্ষিত হলে সে সম্পর্কেও কেন্দ্রকে নির্ভীকভাবে লিখে জানাত।

www.almodina.com

প্রচারকদল

ফৌজের সঙ্গে ইসলাম প্রচারকারী একটি দলও থাকত। এঁরা ছিলেন ইসলামের বিধি-বিধান পরিপূর্ণরূপে পালনকারী। যেহেতু ইসলামে রক্ত ও বংশগত কোন ভেদাভেদ নেই, তাই এই দলে কালো, সাদা, উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল সব বর্ণেরই লোক থাকতেন। এঁদের দেখলে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ছবি ভেসে উঠত। এটি ছিল ইসলামের সার্বোত্তম ধরনের প্রচার যা শত্রুরাষ্ট্রে করা হ'ত। ভারতীয় জাতি-গোষ্ঠি যারা জাত-পাত, উঁচু-নীচু এবং ছ্যুৎ-অচ্ছ্যুতের অভিশাপে জর্জরিত ছিল, এই ধারার ইসলাম প্রচারে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

ডাক ব্যবস্থা

চিঠিপত্রের বিনিময় বা যোগাযোগ ব্যবস্থা দৃষ্টেও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। হাজ্জাজের হুকুমে স্থানে স্থানে ডাক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এতে করে হাজ্জাজের নির্দেশনামা এক সপ্তাহের মধ্যেই দেবলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নিকট পৌঁছে যেত। যারা এই এলাকা আমার মত কয়েকবার ঘুরে ফিরে দেখেছেন তারা এই সাধারণ ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবেন। হাজার মাইলের অধিক দূরত্ব আজকাল এত স্বল্প সময়ে শুধু জীপ[১] গাড়ীর সাহায্যেই অতিক্রম করা সম্ভব। তখন পশুপৃষ্ঠে আরোহণ করেই এই সময়ের মধ্যে উল্লিখিত দূরত্ব অতিক্রম করা হ'ত। প্রতিটি ডাক-হরকরা ১৫০ মাইলের অধিক পথ একদিনে অতিক্রম করত। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, তখন সে এলাকায় এমন শান্তি কায়েম হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলিম ডাক-হরকরাগণ কোন-রূপ ভয়-ভীতি ছাড়াই দিবারাত্রি অবাধে সফর করতে পারত। তখন-কার ডাকের রাস্তা ছিল বসরা, আহওয়ায, শীরায, সীরজান, নওমা শহর, ফাহরাজ, কাসরকান্দ, নীয, কীয ও আরমাঈল হয়ে দেবল।

---

১. গ্রন্থকার মারী ভাগটি গোত্রকে একদিনে প্রায় শ' মাইল সফর করতে দেখেছেন। সওয়ারের জন্য ঘোড়ার ডাক বসিয়ে দেওয়া হ'ত।
আমি ১৯২০ ঈসায়ীতে দেখেছি যে, এ. জি. জি. বেলুচিস্তানের ডাক, আরোহী হরকরার মাধ্যমে, মাঝরাত্রে কোয়েটা থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরের পর কালাত পৌঁছে যেত। এই দূরত্বও নব্বই মাইলের কাছাকাছি। এ কাজের জন্য ঘোড়া ও আরোহীকে পরিশ্রমী ও শক্ত প্রাণের হওয়া অপরিহার্য।

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

সমরশাস্ত্র, সমরাস্ত্র এবং সে যুগের অবস্থাদির একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া চিত্র তুলে ধরার পরে আমরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের জীবন নিয়ে আলোচনা করছি।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পূর্ণ নাম ইমদাদ উদ্দীন মুহাম্মদ। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম।

শৈশবাবস্থায়ই পিতার স্নেহ-ছায়া মাথার উপর থেকে উঠে যায়। তাঁর মা একজন সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তিনি শিশুর নৈতিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ নিজেই দেন এবং মসজিদে লেখাপড়া শেখান। মুহাম্মদ ঘোড়ায় চড়া, দৌড়াদৌড়ি এবং সমরশাস্ত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁর মা তাঁকে তাঁর খালার নিকট পাঠিয়ে দেন। তাঁর খালা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের স্ত্রী। সম্পর্কের দিক দিয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদের খালু এবং আপন চাচা হতেন। সেখানে তিনি তাঁর আগ্রহের নিবৃত্তি ঘটাবার মওকা পাবেন—এটাই ছিল তাঁর মায়ের ঐকান্তিক আকাংক্ষা।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রথম জীবনে একজন শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বভাবগত ঝোঁক ছিল রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ও ব্যবস্থা-পনার দিকে। ফলে সে যুগে শিক্ষকতা একটি সম্মানজনক পেশা ও জীবিকার্জনের মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও তিনি পুলিশের চাকুরী গ্রহণ করেন। শীঘ্রই পুলিশ বিভাগে তিনি তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর এ প্রতিভা দৃষ্টে খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে সামরিক বিভাগে অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেন যাতে তিনি সেনাবাহিনীকে সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার অধীনে নিয়ে আসতে পারেন। এ বিষয়ে ইতিপূর্বেও আমরা আলোচনা করেছি।

www.almodina.com

হেজাযে 'আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রা) উমাইয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে (তাদের অত্যাচার ও অনাচারের কারণে) বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে রেখেছিলেন। এই বিদ্রোহ উমাইয়া খিলাফতের জন্য খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। 'আবদুল মালিকের পূর্ববর্তী দু'জন খলীফা খুবই দুর্বল থাকায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে অরাজকতা ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। শক্ত হাতে এই বিশৃংখলা দমনের প্রয়োজন ছিল যাতে অন্য কেউ মাথা তুলতে সাহসী না হয় এবং এ দৃষ্টান্ত থেকেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

'আবদুল মালিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে যোগ্য বিবেচনা করে তার উপরই এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হাজ্জাজ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিমকে খুবই আদর ও স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি দ্বারা পরিমাপ করতে পেরেছিলেন যে, এই বালক একদিন অবশ্যই যোগ্যতম মুজাহিদ হিসেবে পরিগণিত হবেন। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে অল্প বয়স থেকেই সমরশাস্ত্রে অভিজ্ঞ করে তুলবার জন্য যুদ্ধ ও সংঘর্ষের প্রতিটি পর্যায়ে নিজের সঙ্গে রাখেন যেন সে সমরশাস্ত্রকে হাতে কলমে আয়ত্ত্ব করে নিতে পারে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কৌশলে 'আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রা)-এর দু'পুত্র হামযা এবং হাবীবকে স্বপক্ষে টেনে নেন। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি কোথাও কঠোরতা—আবার কোথাও কোমলতার আশ্রয় নেন এবং সত্বরই তা দমন করতে সক্ষম হন। হাজ্জাজও 'আবদুল মালিককে রাজনৈতিক কূটকৌশল অবলম্বনের এবং উদার ব্যবহার দ্বারা হেজাযবাসীদের অন্তর জয় করার উপদেশ দেন। অনন্তর 'আবদুল মালিক হেজায এলাকায় পানির ন্যায় দু'হাতে টাকা ছড়ান। ফলে কেবল হেজাযেই নয়, বরং সিরিয়া এলাকায়ও শান্তি ফিরে আসে। রোম সম্রাট, যিনি সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এ অবস্থাদৃষ্টে স্বীয় অপবিত্র বাসনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এই সাফল্যে হাজ্জাজের খ্যাতি দারুণভাবে বৃদ্ধি পায়। ইরাকে গোলযোগ দেখা দিলে 'আবদুল মালিক হাজ্জাজকে সেখানকার

www.almodina.com

গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠান। ইরাকের গোলযোগ খুবই বিপজ্জনক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাওয়াবীন (অনুতপ্ত ও অনুশোচনাকারী), যারা ইমাম হুসায়ন (রা)-কে কূফায় আহ্বান করে অগণিত শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় একাকী ছেড়ে গিয়েছিল—এখন তারাই বনূ উমাইয়াদেরকে সিংহাসন চ্যুত করার উদ্দেশ্য নিয়ে শহীদ ইমামের হত্যাকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কৃত্রিম মহড়া দিচ্ছিল। তাওয়াবীনগণ হাজ্জাজের হাতে চরম মার খেয়ে 'আবদুর রহমান বিন আশ'আছকে তাদের শিখণ্ডী নিযুক্ত করে সারা দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে থাকে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাদের এ হাঙ্গামা কঠোরভাবে দমন করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতরও আপন পিতৃব্যের সাথে থেকে অনেক কিছুই শেখেন। সে যুগে মুসলিম ফৌজ তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে রাখতেন। ফলে মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর খালাতো বোন হাজ্জাজের একমাত্র কন্যার সাথে শৈশব কাটান। তাদের দু'জনের শৈশব ও বাল্যের এই বন্ধুত্বই বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ও ভালবাসায় পরিণত হয়। কূফার চতুর্দিকে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হলেই হাজ্জাজের দৃষ্টি মুসলিম রাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে পড়ে। একদা ভারতের রাজা দাহির আরব বণিকদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করে। হাজ্জাজ মাকরানের গভর্নর সা'ঈদ বিন আসলাম বিন যার'আকে রাজা দাহিরের নিকট পাঠান যাতে বিষয়টির একটি নিষ্পত্তি করা যায়। কেননা সে সময় খুরাসানে মুসলিম ফৌজ জিহাদে মশগুল ছিল এবং হাজ্জাজ সেই চিন্তায় ছিলেন বিভোর। এদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমও নিশ্চিন্ত ও নিরূপদ্রব জীবনে হাঁপিয়ে উঠেন। কুতায়বা বিন মুসলিম যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে খুরাসান, খাওয়ারিযম ও তুর্কিস্তান অভিমুখে রওয়ানা হন তখন মুহাম্মদ বিন কাসিমও এই খ্যাতিমান জেনারেলের সঙ্গী হন। সেখানে তিনি তাঁর মেধা, প্রতিভা, সাহসিকতা, বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের এমনই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন যে, সেনাপতি কুতায়বা তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে স্বীয় সহকারী নিযুক্ত করেন।

স্বীয় সহকারী হিসাবে ৯২ হিজরীতে কুতায়বা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে হাজ্জাজের নিকট একটি জরুরী পরামর্শের জন্য পাঠান।

www.almodina.com

নিরাপদ ও শান্তি এলাকায় অগ্রাভিযান কোন দিক থেকে করা হবে—সে বিষয়ে হাজ্জাজ ও কুতায়বার মধ্যে ভিন্নমত সৃষ্টি হচ্ছিল বলে অনুমিত হয়। কুতায়বা এবং হাজ্জাজ বসরা থেকে রওয়ানার পূর্বে একটি পরিকল্পনার উপর ঐক্যমতে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিপাহসালার কুতায়বাকে নিজ যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে এতখানি প্রভাবিত করেন যে, তিনি তাঁর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। আর এই পরিবর্তনের কারণেই শত্রু পরাজিত হয়। কিন্তু হাজ্জাজ তাঁর অনুমতি ছাড়া পরিকল্পনা পরিবর্তন করায় কুতায়বার উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। তিনি কুতায়বার নিকট এ ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করেন। জবাবে কুতায়বা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেন--যাতে করে তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে এই প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার পরিবর্তনের কারণগুলো সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলতে পারেন এবং আরও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের ব্যাপারে অনুমতি চাইতে পারেন। কেননা সকলেই হাজ্জাজের কঠোরতার কারণে আতংকিত ছিল। কুতায়বা সমীচীন মনে করেন যে, এ ব্যাপারটি চাচা-ভাতিজা মিলিতভাবে নিষ্পত্তি করুন, অধিকন্তু হাজ্জাজ তাঁর ভাতিজার যোগ্যতা সম্পর্কেও অবহিত হোন। শেষ পর্যন্ত চাচা-ভাতিজার মোলাকাত খুবই মধুর ও চিত্তাকর্ষক হয়। চাচা ছিলেন আত্মগর্বী বিখ্যাত জেনারেল। এতদ্ভিন্ন তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে তাঁর শাগরিদ ও মকতবের ছাত্র ভেবেছিলেন। এদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম তখনও ষোল-সতের বছর বয়সের তরুণ মাত্র। তবু তিনি অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী, অটুট মনোবলসম্পন্ন, শান্ত ও স্থির মস্তিষ্ক এবং যুক্তিবাদী বক্তা হিসাবে প্রমাণিত হন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ বিন কাসিমের সুদূরপ্রসারী প্রতিরক্ষা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজের পরাজয় স্বীকার করেন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রস্তাব সমর্থন করে তাকে পুনরায় কুতায়বার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাকে একটি চিঠিও দেন। ঐ চিঠিতে হাজ্জাজ কুতায়বাকে লিখেন যে, তিনি যেন মুহাম্মদ বিন কাসিমকে বসরায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। কেননা ঠিক তখনই 'উবায়দুল্লাহ্‌র—যাকে হাজ্জাজ রাজা দাহিরের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন,

www.almodina.com

তার হত্যার খবর কূফায় এসে পৌঁছে। সে সময় হাজ্জাজ মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কুতায়বার নিকট পাঠাতে যাচ্ছিলেন। হাজ্জাজ তখন রাজা দাহিরকে পর্যুদস্ত করবার জন্য মুহাম্মদ বিন কাসিমকেই নির্বাচিত করে ফেলেন।

প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার উপর আলোচনা-সমালোচনা হাজ্জাজের মনের উপর খুবই প্রভাব ফেলেছিল। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সম্পর্কে তাঁর শৈশবকাল থেকেই আশান্বিত ছিলেন বটে, তবে তাঁর ভেতর এই অতিরিক্ত উন্নতি লক্ষ্য করে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন এবং খুবই আনন্দিত হন। কেননা প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার যে স্বপ্ন তিনি এতদিন মনে মনে এঁকে রেখেছিলেন তার সত্যায়ন এভাবে দেখতে পান যে, একদিক থেকে কুতায়বা দুনিয়ার সর্বাধিক জনবহুল এলাকা চীনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, আর অন্য দিক দিয়ে তাঁর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিম জিহাদের পতাকা উড্ডীন করে ভারতবর্ষ পদানত করে কুতায়বার সাথে মিলিত হচ্ছে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম খাওয়ারিযম থেকে ফিরে এলে হাজ্জাজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে খলীফার দরবারে পাঠান যাতে এই প্রতিশ্রুতিশীল সমরনায়ক আরব রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সিন্ধুতে অভিযান পরিচালনার যৌক্তিকতা খোদ আমীরুল-মু'মিনীনকে বুঝাবার সুযোগ পান।

হাজ্জাজ খলীফাকে এও লিখে দিয়েছিলেন যে, আমীরুল-মু'মিনীন যত অর্থ বায়তুল মাল থেকে এই অভিযানের জন্য ইরাকের শাসনকর্তাকে কর্জস্বরূপ দেবেন—তার দ্বিগুণ অর্থ বায়তুল মালে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম এমন সময় দামিশকে পৌঁছান যখন সেখানে যুদ্ধ ও খেলাধূলার বার্ষিক প্রতিযোগিতামূলক মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম খলীফার দরবারে হাযির হন। হাজ্জাজের পত্র পাঠের পর খলীফা দীর্ঘক্ষণ ধরে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেন। অতঃপর তাঁকে সম্বোধন করে বলেন, "প্রথমে কিছু চিত্তাকর্ষক খেলাধূলায় অংশ

www.almodina.com

গ্রহণ কর। আর যদি সাহস হয় তাহলে প্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধেও অবতরণ কর। এতে লোকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাতিজাকে দেখবার সুযোগ পাবে। আর তুমিও তোমার অশ্বারোহণের ক্ষিপ্রতা ও তলোয়ারবাজীর নৈপুণ্য দেখাতে পারবে।"

মুহাম্মদ বিন কাসিম এই আনুষ্ঠানিক ও সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অসন্তুষ্ট হন। তাঁর অন্তরের লালিত আকাংক্ষা অন্তরেই থেকে গেল। কেননা খলীফা তখন পর্যন্ত সিন্ধুর উপর হামলা, তার গুরুত্ব ও সময় পরিকল্পনার উপর আলোচনা করার কোন সুযোগই তাকে দেন নি। দামিশকের কৃত্রিম যুদ্ধের আখড়ায় সুলায়মান বিন 'আবদুল মালিক তাঁর বন্ধুবান্ধবসহ উপস্থিত ছিলেন। সুলায়মান তাঁর মুসাহিবদের তলোয়ারবাজী, নেযাবাজী ও বর্শা লড়াইয়ের অপূর্ব দক্ষতায় খুবই গর্বিত ছিলেন। তাঁর আশা ছিল, ওয়ালীদ বিন 'আবদুল মালিকের পর তিনি খলীফা হবেন, যদিও ওয়ালীদ তাঁর পুত্রকেই খলীফা বানাতে চাইতেন।

সুলায়মানের দলবল আখড়ায় নেমে তাদের মুকাবিলায় অবতরণের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়। যে-ই সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুকাবিলায় নামছিল সেই পরাজিত হ'চ্ছিল। সুলায়মানের বন্ধু-বান্ধব একের পর এক প্রতিযোগিতায় অবতরণ করছিল। কিন্তু খলীফা ঐ সব ক্রীড়াশৈলীতে খুশী হতে পারছিলেন না।

মুহাম্মদ বিন কাসিম এ সব কিছুই নেহায়েত অধৈর্যের সঙ্গে অবলোকন করছিলেন। শেষাবধি তিনি ময়দানে সুলায়মানের ঐ তলোয়ারবাজের মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন—যে উপর্যুপরি কয়েক বছর যাবত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হচ্ছিল এবং কেউই তার মুকাবিলায় এগিয়ে আসার সাহস পাচ্ছিল না। এ দুই প্রতিযোগীর মধ্যে ছিল আসমান-যমীনের ফারাক। সুলায়মানের মুসাহিব সর্বোত্তম অশ্ব, উন্নত মানের সমরাস্ত্র ও লৌহবর্মে সজ্জিত ছিল। এদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের ঘোড়া ছিল মা'মুলী ধরনের। আর তাঁর সাজ-সামানও সফরের কারণে জীর্ণ-শীর্ণ দেখাচ্ছিল। লোকেরা এই অখ্যাত নওজোয়ানকে আখড়ার সর্বাধিক অভিজ্ঞ যোদ্ধার মুকাবিলায় নামতে নিষেধ করে। যাই হোক, মুকাবিলা হ'ল এবং

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিম তাতে জয়ী হলেন। তলোয়ার যুদ্ধের পর নেযাবাজীর মুকাবিলায়ও মুহাম্মদ বিন কাসিম অপরাজিত থাকেন।

খলীফা সব কিছুই দেখছিলেন। সেখানেই তিনি মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে সিন্ধু গমনরত বাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্তির ঘোষণা দেন। তিনি হাজাজের পত্রটিও সজোরে পাঠ করবার নির্দেশ দেন এবং প্রকাশ্যে জিহাদ ঘোষণা করেন। খলীফা সন্ধ্যা-বেলা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে দরবারে ডেকে পাঠান এবং সে সুযোগে তাঁকে তাঁর চাচার (হাজ্জাজের) প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সকলের সামনে তুলে ধরার মওকা দেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম এ দায়িত্ব সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করেন। আমীরুল-মু'মিনীন খুবই খুশী হন এবং তাঁকে খেলাত দ্বারা সম্মানিত করেন।

দামিশ্‌ক থেকে প্রায় দু'হাযার মুজাহিদ নিয়ে তিনি বসরা পেঁৗছেন। বসরা পেঁৗছুতেই তাঁর চাচা আপন কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম এবার আপন বাহিনী তৈরীতে মনোনিবেশ করেন। এটা ছিল সেই সময় যখন 'আবদুল মালিকের ফৌজ মিসর, সিরিয়া ও তুর্কিস্তানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ক্ষতচিহ্নও খুব একটা নিরাময় হয়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায় মুজাহিদদের একত্রে সমাবেশ খুব একটা সহজ কাজ ছিল না।

অতএব এই অতিরিক্ত অভিযান পাঠানো থেকে 'আবদুল মালিকের সুদৃঢ় ইচ্ছা-শক্তি, ধীর-স্থির মিযাজ ও উন্নত মানের মনোবলের পরিচয় পাওয়া যায় এবং বোঝা যায়, নামকরা খলীফা কত সত্বর সমস্ত অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর কাবু জমিয়ে বাইরের অব্যাহত বিজয়ের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এবং জিহাদের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের স্পৃহাকে মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় কিভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন।

হাজ্জাজের অবদান কেবল উমাইয়া হুকূমতের জন্যই নয় যে, তিনি তাদের ভেঙে পড়া ফৌজকে ধসে যাওয়া ও বিবর্ণ হওয়ার হাত থেকে সজীব করে তুলে একটি বিশ্ববিজয়ী ফৌজে রূপান্তরিত

www.almodina.com

করেছিলেন, বরং তাঁর অবদান গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্যও বটে যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা ও উদ্দীপনাকে পুনরায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে দ্বিতীয়বারের মত একটি সুশৃঙ্খল জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত করেন। এ অবস্থা সৃষ্টিতে কিছু কঠোর ও নির্মম ব্যবস্থা তিনি নেন। অবশ্য তাঁর এই কঠোর আচরণ সে ধরনেরই কঠোর ও নির্মম আচরণের ন্যায় যা কোন অচল অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেটে কিংবা ছেঁটে ফেলার মুহূর্তে একজন অভিজ্ঞ সার্জন করে থাকেন, এই উদ্দেশ্যে যেন অন্যান্য সুস্থ অঙ্গ-প্রতঙ্গে রোগ সংক্রামিত হতে না পারে এবং অসুস্থ রোগী রোগের হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। সে যুগের অবস্থা সম্পর্কে ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখলে নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে যে, তৎকালীন অবস্থার মুকাবিলা করে পরিস্থিতি আয়ত্তাধীনে আনবার জন্য কার্যকর কৌশল ও প্রয়াসের সঙ্গে জোর-যবরদস্তীরও দরকার ছিল।

সে যাই হোক, মুহাম্মদ বিন কাসিম খুবই যোগ্য উস্তাদের কাছে সামরিক পশিক্ষণ লাভ করেন। এই সঙ্গে তিনি কোমল ও কঠোর ব্যবহারের উপকারিতা ও অপকারিতার সঠিক পরিমাপ করতেও শেখেন। এ দু'টি বিষয় তিনি কোন মাদ্‌রাসা কিংবা কোন মকতব থেকে শেখেননি বরং যুদ্ধক্ষেত্রে লাভ করে কর্ম-ক্ষেত্রে তা পরীক্ষা করেন।

এই অল্প বয়সেই তিনি নিজের উপর এতখানি আস্থাশীল ছিলেন যে, হাজ্জাজ ও কুতায়বার মত খ্যাতিমান অধিনায়কদের সামনে স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কীয় মতামত অত্যন্ত নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করেন। তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ, ভাষার ক্ষেত্রে নির্ভীক এবং দৈহিক ও শারীরিক দিক দিয়ে পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি বিলাসিতাকে পসন্দ করতেন না। সৈনিক জীবনের জন্য যে সব অভ্যাস ও স্বভাবের দরকার—তার সম্মান ও কদর বুঝতেন। হাজ্জাজের শিক্ষানবীশী করার ফলে তিনি ফৌজের শাসন-শৃংখলা, প্রশিক্ষণ, বিন্যাস এবং মূলনীতি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

www.almodina.com

অশ্বারোহণ, তলোয়ারবাজী, অপরিসীম ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, মনোবল, সাহসিকতা ও বীরত্বের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদের কিছু তো তাঁর প্রকৃতিগতই ছিল। অনুশীলন ও চর্চার ফলে সেগুলোর ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে একজন সর্বাধিনায়ক হওয়া তাঁর পক্ষে বিস্ময়কর কিছু ছিলনা বরং এমনটিই হওয়াই তাঁর দরকার ছিল এবং তিনি তা হয়েও ছিলেন।

সর্বাগ্রে মুহাম্মদ বিন কাসিমের যুগে সিন্ধুর অর্থাৎ রাজা দাহিরের এলাকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বিবরণ পেশ করা প্রয়োজন মনে করছি। এতে আমরা ঐসব সমস্যা চিহ্নিত করতে পারব, এই মহান মুসলিম সিপাহসালার তাঁর প্রতিরক্ষা ও রাজনৈতিক মূলনীতি, শাসন-শৃংখলা ও সমরশাস্ত্রের পন্থা-পদ্ধতি কার্যকর করতে গিয়ে যেগুলোর সম্মুখীন হয়ে ছিলেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তার সমাধানও করেছিলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পূর্বে ঐ এলাকা ছিল গ্রীক ও পারসিকদের অনুরাগ ও উচ্চাশার ক্রীড়াক্ষেত্র। ধাতব দ্রব্য, তলোয়ার, উত্তম মদ, উন্নত মানের কাপড়, স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত গহনা-পত্র প্রভৃতির ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঐ এলাকা সমগ্র এশিয়া ও য়ুরোপের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। এই বাণিজ্য কেন্দ্রটি দখল করবার উদ্দেশ্যে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু তাঁর ফৌজ শতদ্রু নদী পার হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে এবং তিনি সিন্ধুনদের পথ ধরে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ সময় তিনি সিন্ধুনদের (মিহরান) পাড়ে একটি বন্দর গড়ে তোলেন এবং তার নাম রাখেন পাটালা।

অনেক ঐতিহাসিক সিন্ধু সমেত ঐ এলাকাকে যা কেপমুন্য থেকে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত—মিহরান নামে অভিহিত করেন। শুধু সিন্ধু এলাকা থেকে নয় বরং গোটা ভারতবর্ষ থেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে খতম করে দিয়েছিল এবং এখানকার অধিকাংশ রাজার ধর্ম বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অবতরণের পূর্বে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং ব্রাহ্মণ্য শক্তি ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের-কে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কার করতে শুরু করে। বৌদ্ধরা

www.almodina.com

বর্মা, তিব্বত, সিন্ধু এবং পেশাওয়ারের দিকে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

যে যুগে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর উপর হামলা করেন সে যুগে সিন্ধুর রাজা দাহির এবং তাঁর সহযোগী রাজন্যবর্গ ও অধিকাংশ সর্দার হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সিন্ধু, মুলতান প্রভৃতি এলাকার প্রজাবৃন্দও ছিল প্রধানত হিন্দু। অনেক বৌদ্ধও ছিল। তবে এদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ব্যবহার ছিল খুবই খারাপ। অবশ্য সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরের এলাকা– যা দাদু, জ্যাকবাবাদ, বেলুচিস্তান, মাকরান, খারান, লাসবেলা প্রভৃতি নামে পরিচিত, সেখানকার অধিকাংশ সহযোগী রাজন্যবর্গ ও প্রজাকুল ছিল বৌদ্ধধর্মের অনুসারী।

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী করদ রাজন্যবর্গের এবং প্রজাবৃন্দের অধিকাংশই ছিল জাট ও মিও জাতিগোষ্ঠিভুক্ত। ব্রাহ্মণ্যকুল এদেরকে জাতি হিসেবে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের তুলনায় নীচু শ্রেণীর মনে করত। জাট ও মিও জাতি খুবই বীর ও যুদ্ধবাজ ছিল। এরাই আলেকজাণ্ডারকে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল এবং এরাই প্রথমে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সর্বাধিক বিরোধী ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে তারা সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এই জাটেরাই সুলতান মাহমূদ গযনবীকে সোমনাথ থেকে ফিরবার পথে বেশ খানিকটা বিব্রত করেছিল। এদের এই অপকর্মের শাস্তি দানের জন্যই মূলত পরবর্তী বছরই তাঁকে পুনরায় সিন্ধুর উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে হয়।

এ যুগের কিছু আগে ইরানের সাসানী হুকুমত দুর্বল হতেই তারা বিভিন্ন রাজন্যবর্গের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয় এবং সে সময়ই সাসানী বংশের শাহযাদা বাহরাম গোরের বিয়ে জনৈকা হিন্দু রাজকুমারীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এ ভাবেই সে দেশে গোদরহন বংশের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বলা হয় যে, বাহমনাবাদ এই বংশেরই আবাদকৃত শহর। ইরানী ও ভারতীয়দের মধ্যকার এই ঐক্য ২২৬ ঈসায়ী থেকে ৬৫০ ঈসায়ী পর্যন্ত খুবই নিবিড় ছিল।

৬২০ ঈসায়ীতে সিন্ধু এলাকার রাজা ছিলেন রায়সহিংস। রাজা রায় চাচ নামীয় একজন ব্রাহ্মণকে তাঁর পরামর্শদাতা নিযুক্ত

www.almodina.com

করেন। চাচ সায়িজ নামক জনৈক গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। তিনি (চাচ) ছিলেন খুবই সুপুরুষ, ধী-শক্তিসম্পন্ন ও যোগ্য। ৬৩০ ঈসায়ীতে রাজা রায়-এর মৃত্যু হলে তাঁর তরুণী সুন্দরী বিধবা স্ত্রী রাণী শুদ্ধানী চাচের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর চাচ নিজেকে সিন্ধুর রাজা বলে ঘোষণা করেন। চিতোরে সে সময় রাজা মহতরাজ রাজত্ব করছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা রায়ের ভাই। স্বাভাবিকভাবেই চাচের রাজা হওয়া এবং তাঁর মৃত ভাই-এর বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করা মহতরাজের বিরক্তি উৎপাদন করে। তিনি রাজা চাচের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। কিন্তু যুদ্ধে রাজা মহত মারা যান এবং পরিণামে রাজা চাচ রাজা হিসেবে ৪০ বছর যাবত অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন। তাঁর সাম্রাজ্য বিপাশা নদীর তীর ধরে বাবীহ, মুলতান, সিন্ধু প্রভৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৬৭০ ঈসায়ীতে রাজা চাচের মৃত্যু হলে তদস্থলে তাঁর ভাই চন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬৭৮ ঈসায়ীতে রাজা চন্দ্র মারা গেলে চাচের কনিষ্ঠ পুত্র দাহির সিংহাসনে উপবেশন করেন। দাহির রাজা হয়েই জ্যোতিষীদের নির্দেশ মুতাবিক আপন বোনকে বিয়ে করেন। রাজার এই নৈতিকতা বিরোধী কর্মে তাঁর প্রজাকুল খুবই ক্ষুব্ধ হয়; কিন্তু রাজার ভয়ে নীরব থাকে।

রাজা দাহিরের করদ রাজ্যসমূহ

রাজা দাহিরের অধীনে নিম্নোক্ত করদ রাজ্যসমূহ ছিল ঃ

রাজন্যবর্গের নাম	রাজধানী
রাজা জাহীম বুদ্ধ	দেবল
রাজা সুমানা	নীরূনকোট
রাজা বিজওয়া (রাজা চন্দ্রের পুত্র)	সহওয়ান
লোহানা সম্প্রদায়ের রাজা	বাহমনাবাদ
বুদ্ধ (রাজা দাহিরের পুত্র)	সিবী

রাজা দাহিরের রাজধানী ছিল আলোর।

www.almodina.com

বিখ্যাত কেল্লা

আওজ, মিথিলো, হ্রদ, সোরাই, দেবল, নীরূন, সিবী, বাহ্‌মনাবাদ, বেলা, স্কালিন্দার ও মুলতান।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ

রাজা দাহিরের সাম্রাজ্য নিম্নোক্ত প্রদেশগুলোতে বিভক্ত ছিল ঃ

(১) আরোর ঃ (আলোর) সিন্ধু এবং হিন্দের রাজধানী।

(২) সুস্তান ঃ বুদ্ধিয়া, ঝানকান, কোহিস্তান, রেজিয়ান (সিবী অথবা সিব্বী), সীমান্ত মাকরান।

(৩) কারওয়ান ঃ কায়কান (কালাত), হাস, তুরান।

(৪) ব্রাহ্মণাবাদ ঃ দেবল, নীরূন, লোহানা, মুখ্যাপত, সুমানা।

(৫) স্কালিন্দা ঃ চাচপুর, সুওয়ারিয়া, জাজপুর, ডোহিস্ত, বাবীনা।

(৬) মুলতান ঃ ব্রহ্মাপুর, ইশতিহার ও কুন্ড, দক্ষিণ কাশ্মীর, সুখাকুর্দ।

প্রাকৃতিক বিভাগ

প্রাকৃতিক দিক দিয়ে রাজা দাহিরের সাম্রাজ্য নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ

১. উত্তর এলাকা—বর্তমান বেলুচিস্তান এবং (বেলুচিস্তানী ইউনিয়ন) যা নদী তীর থেকে উঁচু। এটি পার্বত্য এলাকা ; এ এলাকায় শীতকালে প্রচণ্ড শীত পড়ে। এ এলাকায় প্রাকৃতিক ঝর্নাধারা রয়েছে। তবে পানীয় জলের পরিমাণ খুব কম। বেশীর ভাগ এলাকা উষর ও বসতিহীন। সে যুগে পাহাড় খুব ঘন ঝোপঝাড় ও বৃক্ষপূর্ণ ছিল।

২. মধ্য এলাকা অর্থাৎ সেই অংশ যাকে সিন্ধুনদ উর্বরতা দান করে। সিন্ধুনদের কিছু অংশকে মেহরান এবং কিছু অংশকে বুঘ বলা হ'ত। এখানে পানি প্রচুর। জমি খুবই উর্বর ও শস্য-শ্যামল।

যখন নদীতে প্লাবন আসত তখন ঐ প্লাবনের পানি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে গম, জোয়ার, পন্না ইত্যাদি উৎপন্ন হ'ত। অবশ্য মশার উপদ্রবের কারণে এখানে জ্বরের প্রকোপ ছিল বেশী।

www.almodina.com

৩. মরু এলাকা—অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা ঃ এখানেও পানির স্বল্পতা ছিল। কূয়ার পানিও ছিল লবণাক্ত। এটা ছিল আরবের মরু এলাকার অনুরূপ।

৪. সিন্ধুনদের নিকট তীরবর্তী সেই অংশ যা চড়াইপূর্ণ ছিল। এটা ছিল লালাজ নামে পরিচিত। আজকাল এ অংশের বিখ্যাত শহর লারকানা, দাদু প্রভৃতি। এ এলাকা খুবই উর্বর ও শস্য-শ্যামল ছিল। তবে আবহাওয়া ছিল খুবই আর্দ্র। এসব মানুষ ও জীব-জানোয়ার উভয়ের জন্য ক্ষতিকর, বিশেষ করে আরবদের জন্য ছিল খুবই কষ্টকর। কেননা আরবরা ছিল মরু এলাকার বাশিন্দা। আর মরু এলাকার আবহাওয়া সাধারণত শুষ্ক হয়ে থাকে।

আরবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সিন্ধুর বাণিজ্য শহর

আরব সিপাহীরা সিন্ধুর নানাবিধ ধাতব পদার্থ, তলোয়ার, কাপড়, কর্পূর, তেল, নীল, নারকেল, খাদ্য-দ্রব্য ,খেজুর, ইক্ষু, আম, কয়লা, গম, লেবু ও চাউলের খুবই প্রশংসা করেছেন।

সিন্ধুর সেই এলাকা যাকে আজকাল কাশমূর বলে, জ্যাকবাবাদের একটি তহসীল ছিল। এখানকার চামড়া শিল্প ছিল খুবই বিখ্যাত। এই এলাকা তখন বুদ্ধিয়া নামে পরিচিত ছিল। কাষাওয়ার (খফদার কালাতে অবস্থিত) ছিল তূরানের রাজধানী এবং আঙ্গুর, আনারস, সেব, নাশপাতি ইত্যাদি ফলের জন্য খুব বিখ্যাত ছিল। অবশ্য কাষাওয়ারের পানি সম্পর্কে আরবদের অভিযোগ ছিল যে, এই পানি পান করলে দেহ ফুলে যায়। এ শহর খোরাসান ও বসরার পথের সংযোগ স্থলে হবার কারণে একটি প্রসিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

মাহমূদ গযনবী এই রাজ্যকে ভারতবর্ষ আক্রমণের পথে প্রতিবন্ধক জেনে একেবারে ধ্বংস করে দেন যাতে করে শত্রুর বিপদাশংকা চিরদিনের তরে তিরোহিত হয়ে যায়। এখন এ শহর আবার গুরুত্ব লাভ করছে। কেননা এর আশেপাশে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে।

www.almodina.com

ইরাক ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী শাহী সড়ক

স্থল পথ—(১) ইরাক থেকে কিরমান, কসর কন্দ, পহলপুর, আস্কা, ওয়ার্কা, পঙ্কগোর, (একে ফেজপুর এবং ভাজপুর নামেও ডাকা হয়), কীযকান (কালাত)—এখান থেকে কোয়েটার পথে কান্দাহার, অতঃপর দেবল।

১. কমরকুন্দঃ কীয মাকরানের রাজধানী (কীয মাকরান-কীযে কিওয়ান)।

নৌপথঃ বাগদাদ থেকে বস্‌রা, খার্ক উপদ্বীপ, লাওয়ান, চিনান, হরমুয, নারা, দেবল।

বিভিন্ন প্রকার জীব-জানোয়ার

ইরান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এই রাজ্যের ব্যাবসা-বাণিজ্য ছিল। এখানে দুই কুঁজওয়ালা উটের খুব চাহিদা ছিল। কৃষকেরা খুব আগ্রহ ভরে পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে বহুল পরিমাণে তা পালতো। সিন্ধুর বাসিন্দারা আরবী ঘোড়া নিয়ে এসে নিজেদের দেশে উত্তম জাতের ঘোড়া পয়দা করত। এখানকার গাভী এবং মহিষও খুব প্রসিদ্ধ ছিল। ইরান, সিরিয়া ও ইরাকে এর খুব চাহিদা ছিল। এ-ব্যবসা ছিল জাট ও মিওদের হাতে। মুহাম্মদ বিন কাসিম জাট অধিবাসীদের একটি অংশকে কিরমান ও বসরায় জীব-জানোয়ারের বংশ বৃদ্ধির জন্য পাঠিয়ে দেন। তারা সেখানে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানেও তাদের বংশধর সেখানেই বাস করছে। এজন্য এই এলাকায় বোঝা বহনের উত্তম জাতের পশু আজও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

মৌসুমী আবহাওয়া

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পাহাড়ী অর্থাৎ উত্তর এলাকায় শীতকালে মৌসুম শুষ্ক এবং খুবই ঠাণ্ডা হ'ত। এই মৌসুমে সাধারণত বরফপাত ও বৃষ্টি হয়ে থাকে। মাকরান ও বেলার প্রান্তর এলাকা খুবই শুষ্ক এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে খুবই গরম। এখানে দিনের বেলা সফর করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

www.almodina.com

সিন্ধু উপত্যকায় শীত মৌসুমে ঠাণ্ডা পড়ে। কিন্তু এতটা নয়, যতটা হলে খারাপ লাগতে পারে। তথাপিও গ্রীষ্ম মৌসুমে নিম্ন এলাকায় মৌসুম খুবই গরম ও আর্দ্র থাকে। বর্ষাকালের পশুর মধ্যে এক ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। একে আজকাল 'সারা' বলা হয়। এ রোগ খুবই ধ্বংসাত্মক। মানুষও অধিকাংশ সময় জ্বর-জ্বালা ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়।

ভারতীয় ফৌজে সমরাস্ত্র

সিন্ধী ফৌজের নিকট উন্নত ধরনের তলোয়ার ছিল। তীর, ধনুক, বর্শা, ভালা এবং ঢাল ছাড়াও প্রায় সমস্ত সৈনিকের নিকটই সাধারণত লৌহ বর্ম থাকত। সিন্ধুতে রথের প্রচলন ছিল। অসংখ্য স্যাঁতসেঁতে নদী-নালা থাকার কারণে ফৌজে হাতীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। এসব হাতীকে আক্রমণ ও দুর্গ ভেঙে ফেলার কাজে ব্যবহার করা হ'ত।

সিন্ধী অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে সাধারণত তলোয়ার ও খঞ্জর থাকত। নেযা কিংবা বল্লমের রেওয়াজ খুব কম ছিল। আরোহী বাহিনী ঘোড়া কিংবা হাতীর পিঠে আরোহণ করত।

ভারতীয় সৈনিক

ভারতীয় সৈনিকরা আত্মোৎসর্গী ও নির্ভীক হ'ত। কিন্তু দুর্বল ও অযোগ্য সিপাহসালারের কারণে তাদের এই সাহসিকতা, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণা অনেক সময় ভীষণ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াত।

ভারতীয় সিপাহসালার

ভারতীয় সিপাহসালাররা বিলাসী ও আরামপ্রিয় ছিল। অবশ্য স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে জীবনের বাজী ধরাকে তাঁরা নিজ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত মনে করত। সেনাপতির পদ সাধারণত শাহী প্রভাব ও সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ ধরনের অধিনায়কের সামরিক যোগ্যতা ছিল খুবই নীচু মানের।

www.almodina.com

প্রতিরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

নিজেদের দুর্গের মযবুতী, রসদ-সম্ভার ও সমরাস্ত্রের প্রাচুর্যের কারণে ভারতীয় সেনারা খুবই অহংকারী ছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতা, বিদ্যুৎবেগে হামলা এবং কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই অগ্রাভিযান পরিচালনা ইত্যাদি জাতীয় সমস্যা নিয়ে তারা কখনো গভীরভাবে মাথা ঘামায় নি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে, যেহেতু আমরা কেল্লার মধ্যে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারি, তাই আক্রমণকারীরা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে একদিন না একদিন পালিয়ে যাবেই।

হামলা

ঐসব কেল্লার ভিতরে অবস্থান করে তারা শত্রুর উপর চরকীর সাহায্যে পাথর নিক্ষেপ ও রেণ্ডীর তেলে ভেজা জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে মারত। এ ধরনের অন্যান্য পন্থায়ও তারা হামলাকারীদের উপর অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করত।

সিন্ধীরা হাতীর সাহায্যেও শত্রুর উপর আক্রমণ করতে জানত। হাতীগুলোকে লৌহ-বর্ম দিয়ে সুরক্ষিত করা হ'ত। হাতীর শুড়ের সঙ্গে দু'দিক দিয়ে তলোয়ার বেঁধে দেওয়া হ'ত এবং হাতী শুড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আক্রমণ করে শত্রুব্যূহ তছনছ করে ফেলত। এমনি ধরনের দু'ধারী তলোয়ারকে 'কর্ণেল" নামে অভিহিত করা হ'ত। এসব হাতীর শুড়কে সাধারণত রেশমী গেলাফ দ্বারা আচ্ছাদিত করে শত্রুর তলোয়ারের কোপ থেকে রক্ষা করা হ'ত।

প্রতিটি হাতীর সঙ্গে প্রায় ৫০০ পদাতিক ও আরোহী সৈনিক মোতয়েন করা হ'ত। হাতী শত্রুব্যূহে ঢুকে পড়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করত এবং সৈনিকরা শত্রুর উপর তলোয়ার নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে তাদের কচু কাটা করে ছাড়ত।

প্রায় এমনি ধরনের পন্থা পাশ্চাত্যের দেশগুলো বিশ্বযুদ্ধে অবলম্বন করে ছিল। অর্থাৎ ট্যাংকের আড়ালে ও ছত্র ছায়ায় তাদের পদাতিক বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়ত।

www.almodina.com

সিন্ধী ফৌজ

লড়াইয়ের মুহূর্তে বিভিন্ন সর্দার এবং রাজা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে জমায়েত হ'ত। প্রকৃতপক্ষে এই ফৌজ সামগ্রিকভাবে সুসংহত, সুশৃংখল ও একাত্ম হতে পারত না। কেননা প্রতিটি সেনাবাহিনীতেই অশ্বারোহী বাহিনী, উষ্ট্রারোহী বাহিনী, হস্তী বাহিনী, পদাতিক সৈন্য থাকত যারা ছোট ছোট কোম্পানী ও ব্যাটেলিয়ানে বিভক্ত হয়ে লড়ত। অধিকাংশ সময় এমনও হয়েছে যে, ভারতীয় ফৌজে সাকুল্যে ২০ হাজার ঘোড় সওয়ার, ২০ হাজার উষ্ট্রারোহী, পাঁচশ'র মত হাতী এবং ৫০ হাজারের মত পদতিক বাহিনী থাকত, কিন্তু এরা ছোট ছোট গ্রুপে নিজ নিজ সর্দারের অধীনে বিভক্ত থাকার কারণে চরম মুহূর্তে পরস্পর থেকে ছিটকিয়ে পড়ত। রাজা দাহিরও এ ভুল করেছিলেন। তিনি তাঁর ফৌজকে সমবেত করতে চেষ্টা করেননি। এ ভুলের পরিণতি ও ফলাফল কি হয়েছিল তা আমরা যুদ্ধের ঘটনাবলীতে দেখব। এখানে আমরা বলতে চাই যে, শাসন-শৃংখলা, ব্যবস্থাপনা, বিন্যাস, প্রশিক্ষণ, চলাচল ও গতিবিধির যোগ্যতাকে যে অধিনায়ক সঠিকভাবে ব্যবহার করেন তিনি হামেশাই সফল হন। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, রাজা দাহির নদী পথে নৌ-মাধ্যম ব্যবহার করেন নি। তিনি সিন্ধুনদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের সঙ্গে মেলাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি, বরং তাঁর রাজধানীকেও সিন্ধুনদের দুটি স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত করে রেখেছিলেন।

ফারুকী (রা) খিলাফত আমলে সিন্ধু এলাকার গোয়েন্দা রিপোর্ট

"সেখানকার পানি অগভীর, ফল বিস্বাদ এবং চোরেরা সাহসী ও বীর পুরুষ। ফৌজ যদি কম হয় তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে আর বেশী হলে না খেয়ে মারা যাবে।"

হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফত যুগে জনৈক আরববাসীর একটি পত্র ঃ

"আরে! তুমি মাকরান যাবে কি নিয়ে আসবার জন্য? সেখানে আছেই বা-কি! এটা এমন জায়গা যেখানে না যুদ্ধের

www.almodina.com

মজা আছে, না আছে ব্যবসা-বাণিজ্যের। ওখানকার লোক ক্ষুধার্ত, আর অল্প-স্বল্প যা কিছু স্থান (সেনাছাউনী) আছে তা খুবই বিপজ্জনক।"

রাজা দাহিরের রাজ্যের কতিপয় মশহুর শহর

মুহাম্মদ বিন কাসিমের হামলার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্য সে সব শহরের সাথে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন যে সব শহর তখনো ছিল এবং যে-গুলোর কিছু কিছু এখনো বিদ্যমান আছে।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ অভিযান খুবই গুরুত্বের দাবীদার। আরবরা এ এলাকার উপর তিন শ' বছরেরও অধিক কাল শাসন-কর্তৃত্ব চালায় এবং এ এলাকাকে ইসলামী রঙে এমনভাবে রঞ্জিত করে যে, তার প্রভাব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও অত্যন্ত সন্তোষজনক রূপে বিদ্যমান ছিল। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের অভিযানের পর উক্ত এলাকার ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে প্রমাণিত হয়, 'ইসলাম তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে' শত্রুদের এ প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা কত ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের হামলার সামনে ব্রাহ্মণ-দের জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্যদের সাথে তাদের নির্যাতনমূলক ব্যবহারের খারাপ দিকগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং ভারতীয় জাতিগোষ্ঠি দেখতে পায় উদারতা, সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং ঈমানদারী কাকে বলে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম বসরা থেকে সিন্ধু অভিমুখে রওয়ানা হন। বসরা ছিল ইরানের শাসনকর্তার রাজধানী। বর্তমানেও এটি ইরাকের একটি মশহুর শহর। পথিমধ্যে এরপর শীরায পড়ে। এটি তেজারতী কাফেলার বিখ্যাত কেন্দ্র এবং ইরানে অবস্থিত। বর্তমানেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট, তবে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে এখন খুব বেশী প্রসিদ্ধ নয়। এখান থেকে রাজা দাহিরের রাজ্যের সীমারেখা শুরু হয়।

১. ফীরোযপুর

ফীরোযপুর বা ভাজপুর যাকে আজকাল "পাঞ্জুগোর" বলা হয়—বর্তমানে মাকরান রাজ্যের রাজধানী। পায়ে চলা কাফেলা

www.almodina.com

আজও এই রাস্তা দিয়ে মাকরান থেকে খেজুর নিয়ে আসে। এ শহরের আবহাওয়া বাকী এলাকার চেয়ে মাঝামাঝি রকমের এবং বেশ আরামদায়ক।

২. আরমল

সম্ভবত ইহা সেই শহর যা আজকাল দীবেজী নামে পরিচিত। কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা, মুহাম্মদ বিন কাসিম এখান দিয়েই নদী পার হয়েছিলেন এবং এই রাস্তা ধরেই আজকাল পায়ে চলা কাফেলা কালাত ও কোয়েটা গমন করে। এ রাস্তা দিয়েই আজকাল পশম, দুম্বা ও বকরী সাবেক বেলুচিস্তান থেকে আসে।

৩. দেবল

রাজা দাহিরের আমলে এ শহর ছিল একটি বিখ্যাত বন্দর নগরী। অনুমান করা হয় যে, সেখানে আজকাল 'ঘারো'[১] নামে একটি ছোট পল্লী বিদ্যমান এবং ১৯৪৭ ঈসায়ীর পূর্বে এখানে যথেষ্ট পণ্য-সামগ্রী সমুদ্র পথে ইরান ও বাহরাইন থেকে আমদানী-

১. জেনারেল হেগ সিন্ধু নদের জলস্রোতের নদীপথ গভীরভাবে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর ধারণা, শত শত বছর ধরে নদী-বাহিত পলিমাটির দ্বার ঘারো নদীর গভীরতা কমে গেছে। এজন্য বন্দর হিসাবে এর প্রসিদ্ধি আর তেমন নেই। তাঁর ধারণা মতে, সিন্ধু নদের পূর্ব-নদী সম্ভবত বর্তমান নার নদী কচ্ছ উপসাগরে (Bay of Kutch) গিয়ে পড়ত। আমি এই নদীর তীর এবং রান অব কচ্ছ পর্যন্ত সফর করে দেখেছি এবং আমিও জেনারেল হেগের সংগে একমত যে, এ নদী শুক্কুর বাঁধের পূর্বেই গুরুত্বের দাবীদার ছিল। যেখানে এই নদী কচ্ছ উপসাগরে গিয়ে পড়ত, সেখানে একটি বিরাট হ্রদ ছিল। এ-এলাকার পাহাড়ী অংশে নগর পারকার শহর অবস্থিত। এখানে সুলতান মাহ্‌মূদ গযনভী নির্মিত একটি মসজিদ অদ্যাবধি বর্তমান। এই হ্রদের নিকট দিয়ে আলেকজাণ্ডার সিন্ধু নদ পার হয়েছিলেন। সোমনাথ বিজয়ের পর সুলতান মাহ্‌মূদ এ রাস্তা দিয়েই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং এখানেই জাটেরা তাঁকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। এ মসজিদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৯০% ভাগ হিন্দু ঠাকুরের বাস এবং তারা আল্লাহ্‌র এই ঘরের দেখাশোনা খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে করে থাকে। তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, মসজিদের গাছের পাতা খেলে সব রকমের রোগ-ব্যাধির নিরাময় হয়।

www.almodina.com

রফতানী হ'ত। এখানকার হিন্দু বণিকেরা খুব ধনী ছিল। এখন আর এ শহরের অস্তিত্ব নেই।

ঘারোর ব্যাপারে অনুমান এ জন্য যে, ঐতিহাসিকেরা একে কুম্ভ নদীর নিকটবর্তী লিখেছেন এবং এ নদীকে সিন্ধুনদের শাখা বলেছেন। বর্তমানে এটি হায়দারাবাদের দক্ষিণ দিকে ৭৫—৮০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এখানে রাজা দাহিরের যুগেও বেশীর ভাগ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী বণিক অবস্থান করত। এ নদী শত শত বছর ধরে নদী বাহিত পলিমাটির দ্বারা ভরাট হয়ে গেছে।

৪. নীরূন

এখানে একটি মযবুত দুর্গ ছিল। এটা ছিল রাজা সুমানার রাজধানী। এ দুর্গ নদী পথে এবং সুস্তান, তুরান এবং মাকরানের স্থল পথে হবার কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দাদু এবং দুহালিয়া ছিল এর নিকট বর্তী কেল্লাঘেরা শহর। এখানকার রাজাসহ অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

৫. সহওয়ান অথবা জীবন

এটা রাজা চন্দ্রের পুত্র রাজা বজ্রের রাজধানী ছিল। এ শহর রাজা দাহিরের চাচা তাঁর পুত্রকে এ-জন্য দিয়েছিলেন যাতে সে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এলাকার করদ রাজাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাখে। কিন্তু এখানকার বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী অধিবাসীরা বজ্র ও তার ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিল। তাই যুদ্ধ কালে তারা সংগত কারণেই তাদের রাজার সংগে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়নি। মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী তাদের উপাসনালয়ের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেন এবং তাদের ধর্মীয় পুরোহিতদের সাথে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করেন তখন আশেপাশের বাসিন্দারা স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁর অগ্রাভিযানেও সহায়তা প্রদান করে।

৬. সহওয়ান

যদি আমরা কোটরী থেকে কোয়েটার দিকে রেলপথে যাই তাহলে এ শহর পথে পড়বে। আজকাল এটি সিন্ধুর দাদু জেলায়

www.almodina.com

অবস্থিত। মুহাম্মদ বিন কাসিমের হামলার সময় কুন্তনদী এ শহর থেকে ১০ মাইল দূরত্বে ছিল। আজকাল এখানে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে।

৭. সীম অথবা সিব্বী

আজকাল এটা সিব্বী নামে পরিচিত। কচ্ছ নদীর একটি শাখার উপর ছিল এর অবস্থান। রাজা কাকার পুত্র বুদ্ধ এখানকার করদ রাজা ছিলেন। এটি বুদ্ধিয়া এলাকার কেন্দ্র ছিল। আজকাল শীত মৌসুমে বেলুচিস্তানের রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

৮. সিবী থেকে মুহাম্মদ বিন কাসিম তন্দাবীল, ইশহার, জাহ্‌ম এবং কোটালের শহরগুলো জয় করতে করতে ঠাঠ গিয়ে পৌঁছেন।

ঠাঠকে আজকাল ঠাঠ্‌টা বলা হয়। এ শহর পরবর্তীকালে (মুসলিম শাসকদের আমলে) রাজধানীও ছিল। এখানে আবিষ্কৃত বহু বিখ্যাত ধ্বংসাবশেষ এর ঐতিহ্যমণ্ডিত অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

৯. সাকেরাহ

আজকাল মীরপুর সাকরো নামে পরিচিত। এখানে বহুদিন পর্যন্ত মুহাম্মদ বিন কাসিমের ছাউনী ছিল। এর নিকট দিয়েই মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুনদ পার হয়েছিলেন। এ এলাকা খুবই উর্বর।

১০. ভেট

সিন্ধু নদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এটি খুব উর্বর ও জনবহুল এলাকা ছিল। কিন্তু বর্তমানে অনুর্বর ও উষর এলাকায় পরিণত হয়েছে।

১১. নারানী অথবা নারায়ণ

এর অবস্থান সম্ভবত নওয়াব শাহ ও খায়ের পুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল। গোরী, ওয়াহ অথবা জয়পুরও এই অঞ্চলেই কোথাও ছিল।

www.almodina.com

১২. রাওর, আরোর বা আলোর

রাজা দাহিরের রাজধানী ছিল। অনুমানের উপর ভিত্তি করে একে রোহড়ীও বলা যেতে পারে। রাজা দাহিরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফেনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এ শহরের আলোচনা আমরা আগামীতে করব।

১৩. সুকরালীদ

মেদ-এর পুল; আজকাল শুক্কুর নামে পরিচিত। শুক্কুরের পুল বর্তমানেও প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈসায়ী ৭১২ সনের জুন মাসে মুহাম্মদ বিন কাসিম এই পুল দিয়ে সিন্ধুনদ পার হয়েছিলেন।

১৪. বাহারো

এর অবস্থান এখন অজানা। সে যুগের বিখ্যাত শহর এবং কেল্লা ছিল। দহলীলা ও কেল্লাবন্দ একটি বিখ্যাত শহর ছিল।

১৫. বাহ্‌মনাবাদ অথবা বাহমনওয়া

লোহানা সম্প্রদায়ের রাজার রাজধানী। সম্ভবত বর্তমান নারা নদীর তীরে ছিল এর অবস্থান। মীর খাসের নিকটে কোথাও এই বসতি থাকা সম্ভব। প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এ শহর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা কাথিয়াওয়াড় এবং গুজরাটের প্রান্তর পথে এ শহর ছিল তত্ত্বাবধায়ক। এ গুরুত্ব বর্তমানে মীরপুর খাস লাভ করেছে।

১৬. বাহরার দিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন ৯ই অক্টোবর, ৭১২ ঈসায়ীতে পার্শ্ববর্তী এলাকার মিঠাল, সুমাসনও, লোহানা সুইটাসের বাশিন্দারা নিজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর অধীনতা স্বীকার করে নেয়।

১৭. স্কালিন্দাহ

মুলতানের রাস্তায় একটি মশহূর কেল্লা ছিল।

www.almodina.com

১৮. মুলতান

এটি একটি বিরাট প্রদেশের রাজধানী ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম এখানে বিরাট পরিমাণ গুপ্তধন পান। মুলতানের নিকট শিখা নামে একটি বিরাট কেল্লা ছিল। আজকাল মুলতান একটি বিরাট বড় শহর।

১৯. বাবিয়া

মুলতান থেকে মুহাম্মদ বিন কাসিম বিপাশা নদীর তীরে অবস্থিত বাবিয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং ফিরবার পথে ভীলম্যান অর্থাৎ গুজরাটের কাথিয়াওয়াড়-এর দিকে যান।

www.almodina.com

সিন্ধুর উপর হামলার কারণ

বোম্বাই সমুদ্রোপকূলে হামলা

১৫ হিজরীতে 'উছমান বিন 'আস কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। আরব বণিকেরা বোম্বাই-এর বন্দর গানখানায় এবং সিন্ধুর অন্তর্গত দেবলে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে যেত। কিছু সংখ্যক দস্যু ও লুটেরা কয়েকবার এসব বণিকদের মালপত্র লুট করে। এদেরকে শায়েস্তা করবার জন্য শেষ পর্যন্ত 'উছমান ইব্ন 'আসকে একটি নৌ-বহর দিয়ে পাঠান হয়। ঐ অভিযানে নৌ-বহরের জীবন কিংবা সম্পদের কোন ক্ষতি হয়নি, তবুও হযরত ওমর (রা)-এর বিনা অনুমতিতে তা পাঠাবার কারণে 'উছমানকে কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হয়। হযরত ওমর (রা) নৌ-অভিযানের বিরোধী ছিলেন।

ভারতবর্ষের উপর হামলা

২২ হিজরীতে মুসলিম মুজাহিদবৃন্দ ইরান জয় করে আরও সম্মুখে অগ্রসর হন এবং মাকরান, কিরমান ও সুস্তানের সীমান্তরেখা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন।

মাকরানের শাসনকর্তা সিন্ধুর রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এতদসত্ত্বেও মুসলিম সেনাপতি ইবনে 'আমের সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করেন। ইবনে 'আমের এসব যুদ্ধের বিবরণ দরবারে খেলাফত পাঠিয়ে দেন। এতে তিনি ঐ এলাকা সম্পর্কে লিখেন, "এই পাহাড়ী ও ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বিরাট সেনাদল চলাফেরা করতে পারেনা। এখানে পানীয় জল ও রসদ-সামগ্রীরও দারুণ অভাব।" এই প্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা) মুজাহিদ-দের অগ্রাভিযান বন্ধ করে দেন।

www.almodina.com

৪৪ হিজরীত মুহাল্লাব বিন আবী সফরা কাবুলের রাস্তা দিয়ে খায়বার গিরিপথ জয় করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য মুসলিম ফৌজের বিজয়ের দরজা খুলে দেন। বলা হয় যে, ফিরবার পথে মুসলিম ফৌজ কায়কান (কালাত) এবং কান্দাবীল (কান্দাহার), যাকে গান্দারীও বলা হ'ত, বিধ্বস্থ ও পদানত করে।

সিন্ধু আক্রমণের কারণ

৭৫ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফী বসরার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হন। তিনি সা'ঈদ বিন আসলাম বিন যুর'আকে মাকরান সন্নিহিত এলাকার শাসক নিযুক্ত করেন। এ-এলাকার বনী আসার কবীলার সর্দার মুহাম্মদ আলাফী বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সা'ঈদ সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু মুহাম্মদ আলাফী তার বহু সৈন্য-সামন্তসহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং রাজা দাহিরের আশ্রয়াধীনে বসতি স্থাপন করেন। এখান থেকে তিনি উপর্যুরি আরব বণিক এবং আরব এলাকাগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন এবং হত্যা ও ধ্বংসের বিভীষিকা কায়েম করেন।

হাজ্জাজ মুহাম্মদ আলাফীকে দমন করতে ব্যর্থ হয়ে আলাফী গোত্রের সর্দার সুলায়মানকে, যিনি সে সময় আরবে ছিলেন, হত্যা করেন। এতে মুহাম্মদ আলাফী অনুগত হবার পরিবর্তে আরও উগ্র হয়ে উঠেন। অবশেষে হাজ্জাজ মুহাম্মদ আলাফীকে ফেরত পাঠাবার জন্য রাজা দাহিরের কাছে দাবী জানান। রাজা দাহির সে দাবী মানতে শুধু অস্বীকৃতিই জানাননি—বরং তিনি হাজ্জাজের প্রেরিত মুসলিম দূতকেও হত্যা করেন। হাজ্জাজ মুহাম্মদ আলাফীর বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠান। আলাফী রাজা দাহিরের সহায়তায় ঐ ফৌজকে পরাজিত করেন। ফৌজের সদস্যদের সংখ্যাল্পতাই ছিল এ পরাজয়ের অন্যতম কারণ। অবশ্য ফৌজের অধিনায়কের দ্বারা কতিপয় প্রতি-রক্ষাগত ত্রুটিও সংঘটিত হয়। খলীফার বাহিনী খেলাফতের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের পর তখন শাম ও তুর্কিস্তানের দিকে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। বায়তুলমালেও অর্থ সংকট চলছিল। ফলে হাজ্জাজকে বাধ্য হয়েই চুপ থাকতে হয়। তিনি মুহাম্মদ বিন হারূন এবং বুদায়লের পরাজয়

www.almodina.com

যেমন কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না, তেমনি এর বদলাও নিতে পারছিলেন না ।

রাজা দাহিরের অগ্রাভিযান

রাজা দাহিরের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, আরবদের জন্য তিনি স্থলপথ বন্ধ করে দিয়েছেন। এবার তিনি তাদের নৌ-বাণিজ্যও খতম করবার দৃঢ় সংকল্প নেন। সে সময় লংকায় (সরন্দীপ) যাকে আরবরা "সীলন" নামে অভিহিত করত, আরবদের বেশ বড় রকমের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সেখানে তাদের বেশ বড় রকমের বসতিও গড়ে উঠেছিল। সীলন (সিলোন)-এর জনপ্রিয়তার কারণ ছিল সেখানকার রাজার সংগে মুসলিম খলীফার বিশেষ বন্ধুত্ব। কোন কোন ঐতিহাসিক তো এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন যে, সীলনের রাজা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

মুসলিম বণিকদের একটি দল যখন সীলন থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে এবং ব্যবসার পণ্য-সামগ্রী নিয়ে জাহাজযোগে রওয়ানা হন তখন তাদের সংগে কিছু বিধবা মহিলা ও য়াতীম শিশু ছিল। ঐসব মহিলার আত্মীয়-স্বজন জাহাজ ডুবিতে মারা গিয়েছিল। সরন্দীপের রাজা য়াতীম শিশু ও বিধবা মাহিলাদেরকে উপহার-সামগ্রী এবং আর্থিক সাহায্য দিয়ে কাফেলার সংগে হেজাযে পাঠিয়েছিলেন, সেই সংগে বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ তিনি বেশ কিছু উপঢৌকনও খলীফার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই কাফেলা সমুদ্র পথে দেবলের কাছে পৌছুলে কাফেলার যাবতীয় মালপত্র লুট করা হয় এবং লোকদেরকে বন্দী করে রাজা দাহিরের নিকট তাঁর রাজধানীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে খারবু কবীলার একজন য়াতীম বালিকা ছিল। সে অত্যন্ত সুকৌশলে আপন রক্তে একটি চিঠি লিখে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে পাঠিয়ে দেয়। চিঠিটা ছিল খুবই মর্মস্পর্শী। চিঠি পড়া মাত্রই হাজ্জাজ রাগে ও উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠেন। চিঠিটি এমন সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল যখন তিনি নির্দেশনামাসহ মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কুতায়বার নিকট পাঠাচ্ছিলেন।

আমরা এখানে একটি কাহিনী উল্লেখ করতে চাই যার স্মরণে আজ পর্যন্ত ঐ সব বিধবা ও য়াতীম সম্পর্কে সিন্ধুবাসীদের হৃদয়-মন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

www.almodina.com

সিন্ধুনদের মাঝখানে একটি ছোট উপদ্বীপ রয়েছে যাকে রোহড়া বলে এবং শুক্কুরের সেতু মূল স্থলভাগের সাথে মিলিত করে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময় একে সুকরালীদ বলা হ'ত। এই ছোট্ট উপদ্বীপটিতে একটি অনাবাদী ঘর রয়েছে। এই ঘর সম্পর্কে প্রসিদ্ধি এই যে, রাজা দাহির আরবের মুসলিম কুমারীদেরকে এখানে বন্দী করে রেখে-ছিলেন। রাজা দাহিরের কর্মচারীরা যখন তাদের সতীত্ব-সম্ভ্রম নষ্ট করার অসৎ উদ্দেশ্যে উক্ত ঘরে প্রবেশ করতে উদ্যত হয় তখন সেখানে একটি বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে রাজার সকল কর্মচারী মারা যায়। এরপর যারাই সে ঘরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছে তারাই মারা গেছে। ধারণা করা হয় যে, আরব বন্দিনীরাও উক্ত ঘরেই নিহত হয়ে থাকবে।

জনশ্রুতি এইরূপ যে, প্রায় ১৩০০ বছর যাবত সেঘরে কেউই প্রবেশ করেনি। ঘরের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। কাহিনীর সকল বিবরণীই যে সত্য তেমন কথা বলা যায় না। তবে উক্ত কাহিনী থেকে মুসলিম নারীদের মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ সম্পর্কে সিন্ধুর বর্তমান অধিবাসীদের অনুভূতি অনায়াসে আঁচ করা যায়।

উক্ত উপদ্বীপেই ছিল রাজা দাহিরের রাজধানী রাওর। এটা ছিল দুর্গের মত। এর সকল প্রাচীরই ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু এঘরটি এখনো টিকে থেকে রাজা দাহিরের কেল্লার ধ্বংসাবশেষের উপর যেন বিলাপ করছে এবং ভবিষ্যত বংশধরদেরকে মুসলিম বালিকা-দের সম্ভ্রমবোধ, সাহসিকতা, আত্মোৎসর্গ ও কর্মকৌশলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছে—চরম অবস্থায় কিভাবে ঐসব উচ্চমনা ও পবিত্র রমণীদের একজন বালিকা প্রতিনিধি হাজ্জাজকে নিজেদের বিপদের ব্যাপারে অবহিত করেছিল এবং এরপর সময় মত সাহায্য না আসা সত্ত্বেও হতাশা ও নিরাশাকে কাছে ঘেঁষতে না দিয়ে নিজেদের সতীত্ব-সম্ভ্রম ও ব্যক্তি-সত্তার হেফাজত করেছিল।

রাওর কেল্লা

জনশ্রুতি আছে যে, রাজা দাহিরের রাজধানী যদিও রাওর ছিল, কিন্তু রাওর মহলের বাইরে ছিল কেল্লা, যাকে আলোর বা (আরোড়)

www.almodina.com

বলা হ'ত। রাওরে একটি ছোট্ট কেল্লার মত শহর ছিল। শাহী মহল এবং মন্ত্রীদের বাসাবাড়ী সেখানেই ছিল।

আপনি যদি পূর্ব নারা নদীর দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হন তাহলে নদীর উজান দিকে একটি পুল পাবেন। আপনি যদি পুল থেকে পশ্চিম দিকে দু'মাইলের মত অগ্রসর হন তাহলে সেখানকার বাশিন্দারা আপনাকে একটি বড় মত গৃহাঙ্গণ দেখাবে। তাদের ধারণা মতে, এখানে মুহাম্মদ বিন কাসিমের শিবিরের লোকেরা সালাত আদায় করত এবং এর আশেপাশেই শিবির ও ছাউনী ছিল। এখন আপনি যদি সেখানে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকান, তাহলে আপনি একটি ছোট্ট পাহাড় পদ্ম ফুলের মত উপরের দিকে প্রস্ফুটিত দেখতে পাবেন। জনসাধারণের ভাষ্য অনুযায়ী আলোর দুর্গ, ফৌজের ছাউনী এবং শহর এখানেই ছিল। এর শাসনকর্তা ছিলেন রাজা দাহিরের ছোট ভাই রাজা গোপী। রাওর প্রাসাদ জয় করার পর মুহাম্মদ বিন কাসিম এ দুর্গও জয় করেন। এখন পর্যন্ত তার কিছু ধ্বংসাবশেষ উক্ত পাহাড়ের উপর বিদ্যমান আছে।

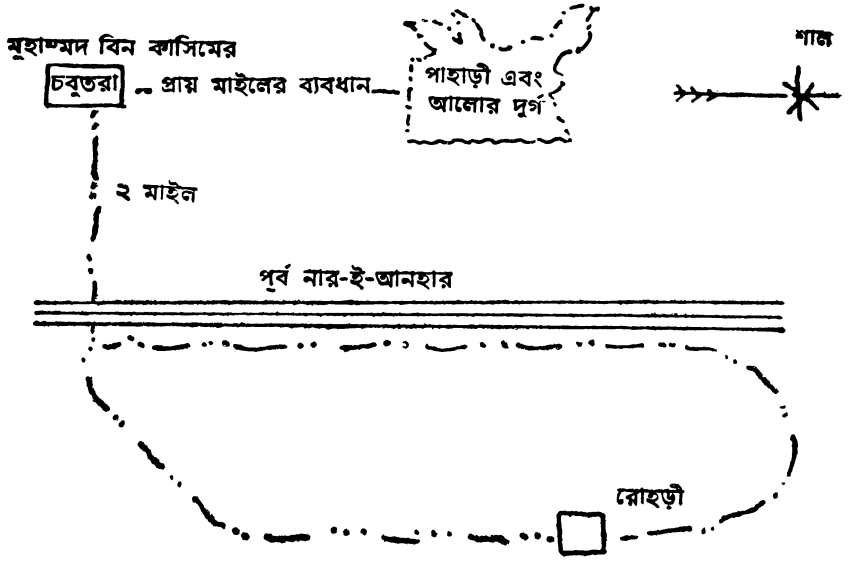

www.almodina.com

অভিযানের প্রস্তুতি

হাজ্জাজ একদিকে জরুরী ভিত্তিতে অভিযান প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মাধ্যমে খলীফার কাছে দরখাস্ত পাঠান এবং অন্যদিকে মাকরানের শাসনকর্তা 'উবায়দুল্লাহ্‌কে লিখে পাঠান যেন তিনি স্বয়ং রাজা দাহিরের কাছে গিয়ে ঐ সমস্ত কয়েদী-দের মুক্ত করে দেবার দাবী জানান।

কিন্তু রাজা দাহির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করেন। এতে মুহাম্মদ বিন আলাফীরও হাত ছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ প্রথম দিককার ব্যর্থতার কারণ বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। দামিশক থেকে প্রায় দু'হাজার মুজাহিদ বসরা এসে-ছিল। বসরার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আরও প্রায় দু'হাজার মুজাহিদ পাওয়া গেল। এরপর তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে শীরায গিয়ে অবস্থান করতে নির্দেশ দেন--যাতে করে সেখানে সিরিয়া ও ইরাক থেকে আরও মুজাহিদ পাঠানো যায়, আর এই মধ্যবর্তীকালীন সময়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বীয় ফৌজের শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক করে নিয়ে এবং তাদেরকে সমরশাস্ত্রের মূলনীতি মুতাবিক তা'লীম দিয়ে একটি বিরাট অভিযানের জন্য প্রস্তুত করে নিতে পারেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বীয় শ্বশুর ও পিতৃব্য হাজ্জাজের নিকট থেকে ফৌজ সুসংগঠিত ও সুশৃংখল করার কৌশল আয়ত্ব করেছিলেন এবং এ বিষয়টা তাঁর মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়েছিল যে, ফৌজকে পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হতে হবে। অধিকন্তু আরবদের সাফল্য ছিল অশ্বারোহী বাহিনীর বিদ্যুৎ গতির উপর নির্ভরশীল। মুহাম্মদ বিন কাসিম বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ঐ সব মুজাহিদকে অনেকগুলি প্লাটুনে সুসংগঠিত করেন। তাদের উপর বিভিন্ন পদাধিকারী অফিসার নিযুক্ত করেন। এ ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করতে ছ' মাস লেগে গেলেও মুহাম্মদ বিন কাসিম ঐ দিনগুলোকে অযথা নষ্ট করেননি। তিনি গুপ্তচর ও ঘোড়সওয়ারের মাধ্যমে সিন্ধুর রাস্তা-ঘাট, দুর্গ ও রাষ্ট্রীয় অবস্থাদি সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে অবহিত হন। প্রথম অভিযানে ভারতীয় দুর্গ এবং হস্তীবাহিনী আরবদেরকে পেরেশান করেছিল। কিভাবে এর প্রতিবিধান করা যায় সে ব্যাপারে তিনি চিন্তা-ভাবনা করেন

www.almodina.com

এবং স্বীয় সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের আলোকে ফৌজের সামরিক মহড়ার ব্যবস্থা করেন।

এতদ্ভিন্ন তিনি ভারতীয় রোগ-ব্যাধি—যেমন জ্বর, আমাশয় ইত্যাদির জন্য ঔষধ-পত্র সঙ্গে নেন। ৭১১ ঈসায়ীতে এই ফৌজ তৈরী হয়ে গেলে হাজ্জাজ দুর্গ-বিধ্বংসী যন্ত্র ও অন্যান্য ভারী যুদ্ধাস্ত্র বসরা থেকে নৌ-বহরের মাধ্যমে সিন্ধুর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। ঐসব মালপত্র দেবল বন্দরের পরিবর্তে সোম মিয়ানী নামক অখ্যাত, কিন্তু বেশ সুন্দর—একটি বন্দরে নামানো হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে সমস্ত লোক প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে গভীরভাবে পড়াশোনা করেছেন তাঁরা জেনে থাকবেন যে, মিত্র বাহিনী ফৌজের চলাচল ও গতিবিধির ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট বৃটিশ মিলিটারী স্টাফ অফিসাররা বৈদ্যুতিক তার, ওয়ারলেস, আধুনিক নৌ-বহর ও বিমানের সহায়তা সত্ত্বেও কি কি ভুল করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৃটিশ ফৌজ যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বসরা পৌছে তখন ভারী সামান জাহাজে চাপানো ছিল এবং সেসব নামানোর জন্য যে ক্রেন (Crane) আনা হয়েছিল তা ছিল ভারী মাল-পত্রের নীচে। ফলে এই নৌ-জাহাজকে পুনরায় বোম্বাই পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে পুনরায় ঠিক-ঠাক করে সামান চাপিয়ে বসরা পাঠান হয়। এই বৃটিশ ফৌজের সাথে আমরা ছিলাম। আমরা যখন দ্বিতীয়বার বসরা পৌঁছলাম তখন জানতে পারলাম যে, অশ্বারোহী বাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনীর ঘোড়া নামাবার জেটি তৈরী করা সম্ভব হয়নি। কেননা এর কিছু আসবাব—পত্র বোম্বাইয়ে যে জাহাজে উঠানো হয়েছিল, ইঞ্জিন খারাপ হবার কারণে সে জাহাজ বসরা পৌঁছুতে পারেনি। ফলে ঘোড়াগুলোকে জাহাজের উপর থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় এবং আমরা উপকূলে পানিতে দাঁড়িয়ে থেকে উপকূলের দিকে সাতরে আসা ঘোড়াগুলোকে পাকড়াও করতে থাকি। বাকী থাকল যুদ্ধাস্ত্র, যেমন—জীন, তলোয়ার, রাইফেল ইত্যাদি,—সেগুলোকেও ছোট ছোট নৌকায় বোঝাই করে কূলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমের মিনজানীক 'আছম'—যা পাঁচ 'শ' মানুষের সাহায্যে চালান হ'ত এবং সেটা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয়

www.almodina.com

পাথর এবং অন্যান্য ভারী সামান নৌ-বহর মারফত ভিন দেশের শত্রু এলাকায় যথাসময়ে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে পদাতিক ফৌজকেও নৌ-বহরের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে আসা হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বীয় স্থল-বাহিনীকে দ্রুত গতিতে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করবার যোগ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর বাহিনীতে আনুমানিক ছ'হাজার আরোহী অর্থাৎ ঘোড়-সওয়ার এবং ছ'হাজার উষ্ট্রারোহী ছিল। এদের সংগে প্রায় তিন হাজার ভারবাহী উটও ছিল। ঐ ফৌজ দেখলে মনে হয়, মুহাম্মদ বিন কাসিম দেবল বিজয় পর্যন্ত শত্রুদের কোন মযবুত কেল্লা তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে—তেমনটি চিন্তা করেন নি।

কুষপুর-পাঞ্জগোর ছিল মাকরানের রাজধানী। এই দুর্গ মুহাম্মদ বিন কাসিম কয়েক মাসের অবরোধের পর জয় করেন। এবং এখানে বসে কুষপুর থেকে দেবলের দুরুহ রাস্তা পার হবার প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করেন। পাঞ্জগোরের যুদ্ধে মুহাম্মদ বিন কাসিম এটা জানতে পেরেছিলেন যে, মামুলী দুর্গ জয় করবার জন্যও পদাতিক ফৌর্জের দুর্গ বিধ্বংসী অস্ত্রের দরকার পড়বে যা সেখানে বর্তমান ছিল না।

প্রকৃতি কাসবেলা (লাসবেলা) এলাকাকে পশ্চিম থেকে আগত হামলাকারীদের জন্য একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক করে রেখেছিল। এসব এলাকা ছিল ছোট ছোট পাহাড় দ্বারা—যা মাত্র কয়েক 'শ' ফুট উঁচু—সাটানো। এসব পাহাড় কেয়ার পাহাড় শ্রেণীর শাখা-প্রশাখা মাত্র এবং এ উপত্যকায় বর্ষাতি নালাগুলো বেশ গভীর এবং প্রান্তরে বেশ প্রশস্ত হয়ে প্রবাহিত হ'ত। এসব নালা বৃষ্টির সময় খুবই বিপদজনক হ'ত। এসব পাহাড় ও নালা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রসারিত ছিল। পাহাড়ের উপর ঘন জঙ্গলের আচ্ছাদন ছিল এবং উপত্যকায় বিশেষ বিশেষ নালার ভেতর খননকৃত কূয়া এবং পাহাড়ী ঝর্ণা ছাড়া অন্যত্র পানি ছিল খুবই দুষ্প্রাপ্য। বর্ষাতি পুকরগুলোর পানি খুবই লবণাক্ত হ'ত। সাধারণ কূয়ার পানি স্থানীয় অধিবাসী-দের কাছে অভ্যাসগত কারণে মিঠা লাগলেও বিদেশী মুসাফির

www.almodina.com

ও পর্যটকদের কাছে তা ছিল নোন্‌তা। ঐ পানি পান করলে পেট খারাপ হ'ত। ফলে আমাশয় ও দাস্তের অভিযোগ সেখানে ছিল একটি সাধারণ ব্যাপার।

যদিও আজকাল সে এলাকার জঙ্গল খুব তাড়াতাড়ি নিঃশেষ যাচ্ছে, কিন্তু চিহ্ন দৃষ্টে মনে হয়, কোন এক যুগে ঐ এলাকা দুরতিক্রম্য এবং কাঁটাপূর্ণ ঝোপঝাড়ে পূর্ণ ছিল। আরব, তুর্কী, ইরানী, তুর্কী, পাঠান এবং মোগল আক্রমণকারীরা সেখানকার যুদ্ধবাজ বাশিন্দাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ঐ ঝোপ-ঝাড় জ্বালিয়ে দিয়েছিল যাতে করে শত্রুরা লুকিয়ে আড়াল থেকে আক্রমণকারী ফৌজের উপর হামলা চালাতে না পারে।

সিন্ধুতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের যুদ্ধ

মুহাম্মদ বিন কাসিমের ফৌজ যখন বেলার দিকে অগ্রসর হয় তখন স্থানীয় লোকেরা এবং ভারতীয় ফৌজ (যার সংখ্যা ছিল ২৫ হাজারের মত) তাদেরকে প্রতিরোধ করতে শুরু করে। হিন্দু সেনাপতি স্বীয় ফৌজকে সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে রেখেছিলেন। ফৌজের বিভিন্ন প্লাটুন ও কোম্পানী নদী-নালা ও পাহাড়ী জঙ্গল থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে এসে আরব ফৌজের উপর আক্রমণ চালাত এবং আরব ফৌজ তাদের উপর পাল্টা আঘাত হানার আগেই তারা জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেত।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সৌভাগ্য যে, ভারতীয় সেনাপতি পরিশ্রমী ও সাহসী ছিলেন না। অধিকন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন কুষপুর থেকে রওয়ানা হন তখন তিনি তাঁর এই অগ্রাভিযানের কথা একেবারে গোপন রাখেন। ফলে ভারতীয় ফৌজ আরবীয় ফৌজের উপর তখনই হামলা শুরু করে যখন তিনি বেলার একেবারে নিকটে পৌঁছে গেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতীয় ফৌজ বেশ দৃঢ়তার সাথে লড়াই শুরু করে। ফলে আরবীয় ফৌজ, যার ভেতর অধিকাংশই ছিল আরোহী এবং মাল ও সামানবাহী, খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে এবং তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

www.almodina.com

অতঃপর মুহাম্মদ বিন কাসিমের জন্য মাত্র দু'টো রাস্তাই খোলা ছিল ঃ

১. বর্তমান রাস্তা ছেড়ে দিয়ে উপকূল বরাবর তুলনামূলক খোলা প্রান্তর দিয়ে লড়াই করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ;

২. শত্রুবাহিনীর অবস্থান-স্থল বেলা দুর্গের উপর হামলা করা এবং এভাবে দুশমনকে একস্থানে একত্র হয়ে লড়বার জন্য উৎসাহিত করা। কেননা গেরিলা ধরনের লড়াই আরব ফৌজকে—বিশেষ করে এর রসদবাহী ফৌজকে—বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

গেরিলা তীরন্দায লুকিয়ে থেকে রসদবাহী পশু এবং মুজাহিদদের উপর বড় রকমের আঘাত হেনে চলেছিল। অনন্তর স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য মুহাম্মদ বিন কাসিম এ-চাল চালেন যে, স্বীয় ফৌজের অগ্রগামী বাহিনীর গতিকে সিপাহী সিংহের (Spai Singh) ফাঁড়ির নিকট থেকে আগোর (Aghor) বন্দরের দিকে ফিরিয়ে দেন। এমনটি করার পূর্বে তিনি স্বীয় গুপ্তচর মারফত রটিয়ে দেন যে, আরব ফৌজ এখন উপকূল ভাগ দিয়ে অগ্রসর হবে এবং সেখানে আরব নৌ-বহর তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এখবর তিনি বেশ দৃঢ়তা সহকারে ও সুকৌশলে শত্রুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন।

এরপর তিনি স্বীয় ফৌজকে দু'অংশে বিভক্ত করেন। বড় অংশের নেতৃত্ব দেন মুহাম্মদ বিন হারূনকে এবং নির্বাচিত একটি কোম্পানী, যার সংখ্যা হবে হাজারের মত, নিজের সংগে নেন এবং রাতের বেলা তাদেরকে নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েন। বড় অংশ নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্ধেক রাত্রির পূর্বে, যখন গোটা বিশ্ব-প্রকৃতি চন্দ্রালোকিত, অগ্রযাত্রা শুরু করে এবং দিনের বেলায়ও ধীরে সুস্থে সে যাত্রা অব্যাহত রাখে।

ভারতীয় সেনাপতি এই সামরিক চালে হেরে যান। তিনি যেই শুনলেন যে, আরব ফৌজ প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হবার চিন্তা করছে, অমনি তিনি স্বীয় ফৌজকে একত্র হবার নির্দেশ দেন, যাতে করে আরব ফৌজকে খোলা ময়দানে বের হবার পূর্বেই পরাজিত ও ধ্বংস করে দেওয়া যায়। এ সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তিনি সাধারণ নিরাপত্তা নীতিকে লংঘন করেন অর্থাৎ দুর্গে খুবই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য

www.almodina.com

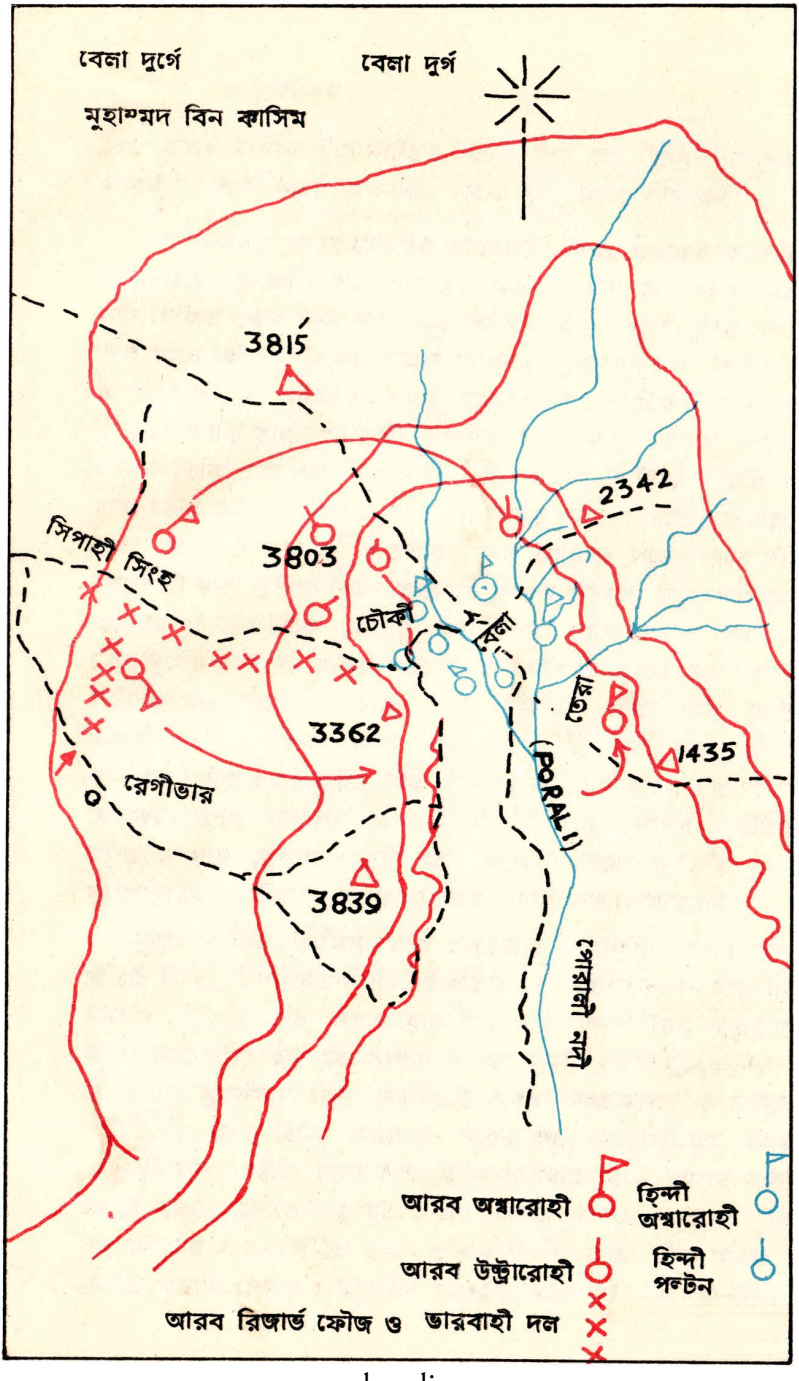

www.almodina.com

রেখে যান। কেননা তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি খুব সত্বর আরব ফৌজকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দুর্গে ফিরে আসবেন।

মোট কথা, আরব ফৌজের অগ্রযাত্রার কথা শুনতেই ভারতীয় সেনানায়ক তাৎক্ষণিকভাবে রাতের বেলায়ই স্বীয় গেরিলা ফৌজের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়েন যাতে করে তিনি তার সমগ্র ফৌজকে একত্র করতে পারেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের গুপ্তচর তাঁকে মুহূর্তের খবর মুহূর্তেই দিয়ে চলছিল। যা-হোক, হিন্দু সেনাপতি তার অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে দ্রুত বেরিয়ে পড়েন। কেননা তিনি তার পদাতিক বাহিনীকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ভোর বেলার পরিবর্তে আরব ফৌজের মধ্য-রাত্রিতে অগ্রযাত্রার খবর শুনে তিনি আরও দ্রুততার সংগে বেরিয়ে পড়েন যাতে স্বীয় কোম্পানী দ্বারা দু'দিক থেকে আক্রমণ করে মুহাম্মদ বিন কাসিমের আগোর বন্দরের দিকে অগ্রসর হবার পথ রোধ করতে পারেন। বেলা দুর্গের পদাতিক ফৌজকে তিনি এ উদ্দেশ্যেই নিজের সঙ্গে নেওয়া সমীচীন মনে করেন। কেননা তাঁর ফৌজের অধিকাংশই গোটা এলাকায় ছড়িয়ে ছিল। ফলে তার ধারণা ছিল যে, তার গেরিলা পদাতিক ফৌজ একত্র করত সময় লাগবে। তাই যথা সত্বর দ্রুত আরব ফৌজের উপর কার্যকর আঘাত হানতে তিনি দুর্গের পদাতিক ফৌজকে সঙ্গে নেওয়া জরুরী মনে করেন। আসলে তিনি তখন মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতিরক্ষা চালে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর চলাচল ও গতিবিধি গোপন রেখে প্রতিটি বিষয়ে উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। মুহাম্মদ বিন হারূনের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। মুহাম্মদ বিন হারূনের ভালভাবেই জানা ছিল যে, সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাকে দুর্গের দিকে ফিরে এসে মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে মদদ দিতে হবে। এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তিনি ফয়সালা করেন যে, তার ফৌজের কিছু অংশ রিজার্ভ ফৌজ হিসাবে শত্রুর মুকাবিলায় ছেড়ে যাবেন যারা লড়াই করতে করতে পিছু হটবে এবং হটতে হটতে নিজেদের বড় মূল ফৌজের সংগে মিলিত হবে। ওদিকে হিন্দী ফৌজ সঠিক পরিমাপ করতে পারেনি, আরব সেনাপতির প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা কি! যা-হোক,

www.almodina.com

চাঁদ যখন অস্তমিত হচ্ছিল এবং ভোরের শুকতারা উদিত হচ্ছিল ঠিক তখন মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বীয় অশ্বারোহী বাহিনী সমেত দুর্গের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেন। ঘোড়াগুলো তখন লুকিয়ে ফেলা হয় এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের দুরন্ত বাহিনী পায়ে হেঁটে দুর্গের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যদিও দুর্গটি ছিল মাটি নির্মিত—তথাপি হামলা করার সময় সতর্কতা অবলম্বনের দরকার ছিল।

দুর্গের অধিবাসীরা সারাদিনের ক্লান্তিতে ছিল অবসন্ন। তাদের সেনাপতিও তখন চলে গিয়েছিল। অপরদিকে আরব সেনাপতিও তখন চলে গিয়েছিলেন। আরব ফৌজ তাদের থেকে প্রতি মুহূর্তে দূরে সরে যাচ্ছিল বলে তারা অলস ও অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। কিছু পাহারাদার ঘুমিয়ে ছিল। আর কিছু ছিল আধা জাগ্রত। তারা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে থেকে থেকে "হো-শি-য়া-র! খবর-দা-র!" ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছিল।

চাঁদ ডোবার মুহূর্তে মুহাম্মদ বিন কাসিম বাছাই করা কিছু দুঃসাহসী সৈনিকসহ দুর্গ প্রাচীরের উপর আরোহণ করেন এবং বিশেষ কোন প্রতিরোধ ছাড়াই দুর্গের দরজা খুলে দেন। খোলা দরজা পেয়ে অবশিষ্ট সৈনিকও দুর্গাভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম সহজেই দুর্গের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন।

চারিদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠছিল, এমনি সময় মুহাম্মদ বিন কাসিম তিনজন দুঃসাহসী সৈনিকের মাধ্যমে মুহাম্মদ বিন হারূনকে ফিরে আসবার জন্য নির্দেশ পাঠান। সেখানে তখন ভীষণ লড়াই চলছিল এবং হিন্দী ফৌজ অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করছিল।

ইতিমধ্যে দুর্গ থেকে পালিয়ে গিয়ে কিছু হিন্দী সৈন্য তাদের সেনাপতির নিকট দুর্গ বিজিত হবার দুঃসংবাদ প্রদান করে। এখবর সেনাপতি ও হিন্দী সৈনিকদের কাছে বজ্রাঘাত তুল্য মনে হয়। তারা তাদের শেষ ভরসাটুকুও এতে খুইয়ে বসে। তবু সেনাপতি শেষ বারের মত সিদ্ধান্ত নেন, শত্রুর হাত থেকে দুর্গটি তাৎক্ষণিকভাবে ফিরিয়ে নিয়ে সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে। তিনি তার সমস্ত ফৌজকে দুর্গের দিকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে

www.almodina.com

দুর্গের দিকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন যাতে তড়িৎ গতিতে দুর্গটি অবরোধ করা যায় এবং অবশিষ্ট আরব ফৌজ মুহাম্মদ বিন কাসিমের ফৌজের সাথে, যারা দুর্গ মধ্যে অবস্থান করবে, মিলিত হতে না পারে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম দুর্গের উপর থেকে সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন এবং সে অনুযায়ী উপস্থিত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করছিলেন। তিনি ভারতীয় ফৌজের চলাচল ও গতিবিধি থেকে তাদের সেনাপতির অভিপ্রায় যখন বুঝতে পারলেন তখনই মুহাম্মদ বিন হারুনের মাধ্যমে হিন্দী ফৌজের উপর আঘাত হানবার পরিকল্পনা নেন। এ পরিকল্পনা তিনি প্রথম থেকেই নিজেদের মধ্যে আলোচনাক্রমে ঠিক করে রেখে-ছিলেন। ভাগ্যক্রমে ভারতীয় ফৌজ পুনরায় ভুল করে আরব ফৌজের জালে ধরা পড়বার জন্য ছুটে আসছিলে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরিকল্পনা নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল ঃ

১. পলাতক হিন্দী সৈন্যরা তাদের সেনাপতিকে অবহিত করে থাকবে যে, দুর্গে বিজয়ী আরব ফৌজের সংখ্যা খুবই কম।

২. ভারতীয় সিপাহ্সালারের মেযাজে ক্ষিপ্রতা থাকলেও তিনি তার ব্যক্তিগত মান-সম্ভ্রমের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করবেন।

৩. হিন্দী ফৌজ বিক্ষিপ্ত থাকার দরুন ছোট ছোট দলে বিভক্ত থাকবে এবং তাদের সেনাপতি ধৈর্য্যহারা হবার কারণে তাদেরকে তাড়াহুড়ার ভেতরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত অবস্থায়ই আক্রমণের নির্দেশ দেবেন।

এই প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ বিন কাসিম ফয়সালা করলেন ঃ

১. তিনি হিন্দী ফৌজের মনোযোগ দুর্গ দখল করার দিকে ঘুরিয়ে দেবেন।

২. মুহাম্মদ বিন হারুন তার ফৌজের বিরাট অংশকে তিনভাগে ভাগ করবেন । যেমন ঃ

ক. একটি কোম্পানী রিজার্ভ ফৌজ হিসাবে হিন্দী ফৌজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে দুর্গের দিকে পিছু হটবে। রসদবাহী তাদের

www.almodina.com

সঙ্গে থাকবে, কিন্তু প্রতিটি মুজাহিদ এমনভাবে লড়ে যাবে যাতে দুশমন এ কোম্পানীর শক্তি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হতে না পারে।

খ. বাকী ফৌজকে দু' অংশে ভাগ করে দেওয়া হবে। উষ্ট্রারোহী-দের সংক্ষিপ্ত পথে দ্রুততার সংগে দুর্গের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

গ. অশ্বারোহী কোম্পানী উপত্যকা ও নালাগুলোর ভেতর দিয়ে পার হয়ে কেল্লার দক্ষিণ দিক থেকে এমন সময় হামলা করবে যখন দুশমন পুরোপুরি ময়দানে অবতরণ করেছে।

যে সময় আরব অশ্বারোহী বাহিনী শত্রুর উপর আক্রমণোদ্যত হবে তখন উষ্ট্রারোহী বাহিনীও অন্য দিক থেকে তাদের উপর অতর্কিতে হামলা করবে। এভাবে ভারতীয় ফৌজকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা হবে।

অপর দিকে হিন্দু সেনাপতির প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক. যখন মুসলিম ফৌজ (অর্থাৎ রসদবাহী রিজার্ভ ফৌজ) লাক চৌকীর (Luck Chouki) মুজাহিদ কেল্লার নিকট পৌঁছুবে তখন হিন্দী ফৌজ আরব ফৌজকে এভাবে ঘেরাও করে ফেলবে যে, তারা তাদেরকে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে বাহ্যত দুর্গের দিকে অগ্রসর হতে দেবে। কেননা সে-স্থানে তিনি তার পদাতিক ফৌজ এবং তীরন্দায বাহিনীকে আরবী ফৌজের অপেক্ষায় গুপ্ত ঘাটিতে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

খ. হিন্দী সেনাপতি কিছু হিন্দী অশ্বারোহী কোম্পানীকে দুর্গ অবরোধের জন্য রেখে বাকী কোম্পানীগুলোকে কয়েকটি প্লাটুনে ভাগ করে নেন যাতে তারা আরব ফৌজের উপর বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে।

হিন্দী ফৌজ এই তাড়াহুড়োর ভেতর নিজেদের সংবাদ আদান-প্রদানের দিকে মনোযোগ দেয়নি। উভয় ফৌজই নিজ নিজ সিপাহ্-সালারের পরিকল্পনা মুতাবিক অগ্রসর হচ্ছিল। আরব সেনাপতি কৌশলের সংগে স্বীয় অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী বাহিনীর বড় প্লাটুন-গুলোকে গোপন রাস্তায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। হিন্দী সিপাহ্-সালার এদের এ সামরিক চাল ও গতিবিধি সম্পর্কে আদৌ জানতে পারেনি।

www.almodina.com

বেলা তিন প্রহর। যদিও হিন্দী ফৌজের অধিকাংশ অংশই গেরিলা হামলা বন্ধ করে দিয়েছিল, তথাপি মুসলিম ফৌজ (রিজার্ভ ও রসদ-বাহী) নকশার উপর নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লড়তে লড়তে এবং পিছু হটতে হটতে বেলা দুর্গের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আরবী ফৌজ লাক চৌকীর ঘাটির নিকট পৌঁছুলে গুপ্তচর তাদেরকে হিন্দী ফৌজের ওঁৎ পেতে থাকা অংশ সম্পর্কে অবহিত করে। ফলে আরবী ফৌজ হিন্দী বাহিনীর উপর ঝড়ের বেগে ঝাপিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর মুসলিম ফৌজ সেসব পাহাড় দখল করে ফেলে এবং তাদের সিপাহ্‌সালারের নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকে।

মাগরিবের সময় ঘনিয়ে আসছিল। আরব ফৌজের বিভিন্ন সেনানায়ক তাদের সিপাহ্‌সালারের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। নির্দেশ পেতেই রিজার্ভ ফৌজ আস্তে আস্তে বেলা দুর্গের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। হিন্দী অশ্বারোহী বাহিনী আরব ফৌজের ধীর ও হালকা গতিকে তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত হবার কারণ বলে ধরে নিয়েছিল। অতএব হিন্দী অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী তাদের উপর তিন দিক থেকে হামলা করে বসে। যদিও রিজার্ভ ফৌজ খুবই দুর্বল ছিল, তবু তারা অত্যন্ত নির্ভীক ও বীরত্বের সংগে লড়তে থাকে। প্রচণ্ডভাবে লড়াই চলছিল, এমনি মুহূর্তে হিন্দী ফৌজের উপর দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে আরব অশ্বারোহী বাহিনী ঝড়ের বেগে ঝাপিয়ে পড়ে। হিন্দী সেনাপতি স্থীয় অশ্বারোহী বাহিনীকে একত্র করে আরব অশ্বারোহী বাহিনীর উপর পাল্টা হামলা করেন। যুদ্ধ কয়েক-দিক থেকে জোরেশেরে চলছিল, হিন্দী ফৌজ খুব সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছিল, এমন সময় মুহাম্মদ বিন কাসিম অতর্কিতে উষ্ট্রারোহী বাহিনী নিয়ে হিন্দী ফৌজের উপর হামলা করে বসেন। নতুন এ হামলা ছিল অত্যন্ত জোরালো ও মারাত্মক। ফলে হিন্দী ফৌজের সিপাহ্‌সালার আহত হন এবং তার বাহিনীর পদ-স্খলন ঘটে। আরব ফৌজ অত্যন্ত সুশৃঙখলভাবে হিন্দী ফৌজের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। হিন্দী ফৌজের শোচনীয় পরাজয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম আহত হিন্দী সৈন্য-দেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। তাদের মধ্যে তাদের সেনাপতিও ছিলেন।

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিম হিন্দু ফৌজের আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূসার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সমস্ত যুদ্ধ বন্দীদেরকে অস্ত্রমুক্ত করবার—পর মুক্তি দেন। সে সঙ্গে আহত সৈনিকদেরকেও নিরাময় ও সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দেন। এদের মধ্যে হিন্দী সেনা-পতিও ছিলেন। সেনাপতিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম বিশেষ সম্মান ও নিরাপত্তার সঙ্গে স্বীয় ফৌজ থেকে দূরে সরিরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে আসেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের মনুষ্যত্ব এবং আহত দুশমনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হিন্দী সৈনিকদের মনে গভীর রেখাপাত করে। আরব ফৌজের মধ্যে বিরাজিত সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব দৃষ্টে তারা যারপর-নাই মুগ্ধ হয়। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন তো সন্তুষ্ট চিত্তে মুসলমানই হয়ে যায়।

দেবলের উপর হামলা

মুহাম্মদ বিন কাসিম বেলা দুর্গে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করার পর এমন সময় দেবলের দিকে অগ্রসর হন যখন তাঁর ভারী অস্ত্রশস্ত্র সুময়ানীতে সামুদ্রিক নৌ-বহরের সাহায্যে পৌঁছুতে যাচ্ছিল। এসব সাজ-সরঞ্জাম পৌঁছে গেলে তিনি একটি মহরত ও শক্তিশালী কোম্পানীর রক্ষণাধীনে ভারী সরঞ্জামগুলো নিজের কাছে আনিয়ে নেন। দেবল শহরের পাশে খুবই মযবুত প্রাচীর ছিল। এর চতুর্দিকের খালে পানি ভরতি ছিল। এ শহরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি বিখ্যাত মন্দিরও ছিল। মন্দিরের গুম্বজ উচ্চতায় ছিল চল্লিশ ফুটেরও বেশী। গুম্বজের উপরে একটি লাল ঝাণ্ডা সর্বদা পতপত করে উড়ত। সাধারণ মানুষ এবং মন্দিরের পূজারীদের সাধারণ বিশ্বাস ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত এ পতাকা সগৌরবে উডডীন থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ শহর কেউ জয় করতে পারবেনা।

শহরের ভেতর বেশুমার রসদ-সামগ্রী মওজুদ ছিল। অতএব অবরুদ্ধ নগরবাসীদের কয়েক মাস পর্যন্ত ভেতরে বসে কাটিয়ে দেবার মত ব্যবস্থা ছিল। অপরদিকে অবরোধকারীরা বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কেননা শহর কিংবা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে রসদ সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা ছিলনা।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের গুপ্তচরেরা তাঁকে অবহিত করেছিল

www.almodina.com

য়ে, দেবলের বেশীর ভাগ অধিবাসী বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। এসব লোক ব্যবসায়ী এবং খুবই ধার্মিক। তবে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষু ও পুরোহিতদের মাঝে বেশ শত্রুতা রয়েছে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সুমরানী বন্দর থেকে নিজেদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র নিয়ে ৯২ হিজরীর জুম'আর দিন দেবলের সামনে গিয়ে পৌঁছেন এবং চতুর্দিক থেকে এমনভাবে অবরোধ সৃষ্টি করেন যাতে দেবলবাসীদের কাছে কোন প্রকার সাহায্য কিংবা রসদ-সামগ্রী পৌঁছুতে না পারে। কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হবার পরও দেবলবাসীরা বাইরে বেরিয়ে আরব ফৌজের মুকাবিলা করার প্রতি কোন উৎসাহ প্রকাশ করেনি। অবশ্য যখন কোন আরব সৈনিক দুবাবার আড়ালে শহর প্রাচীরের নিকটে পৌঁছুতে চেষ্টা করত অমনি হিন্দী ফৌজ রেড়ীর তৈলসিক্ত জ্বলন্ত মশাল নিক্ষেপ করে তাদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিত। আরব মিনজানীক "উরূস"-এর সাহায্য বড় বড় পাথর বৃষ্টিধারার মত বর্ষানো হয়, কিন্তু অবরুদ্ধ শহরবাসীদের উপর বাহ্যত এর কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ বিন কাসিম গোলন্দাজ ইউনিটের অধ্যক্ষ জওয়াহিবাহ্‌কে মুর্তির মন্দিরের গুম্বজ লক্ষ্য করে গোলা নিক্ষেপ করবার নির্দেশ দেন যাতে মন্দিরের উপর উড্ডীয়মান পতাকা ভূপাতিত করা যায়। নিক্ষেপের সময় যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম দেখলেন যে, গোলা-গুম্বজের উপর দিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি উরূস-এর সম্মুখবর্তী পায়া এমনভাবে কেটে দেওয়ার জন্য জওয়াহিবাহকে নির্দেশ দেন যাতে করে গোলার ট্রিজেক্টরী (Trejectory) কিছু নীচু এবং সোজা হয়ে যায়। এমনটি করায় দ্বিতীয় গোলা ঠিকমত নিশানায় গিয়ে লাগে এবং লাল ঝাণ্ডা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

হিন্দুরা এটাকে তাদের জন্য একটা কুলক্ষণ হিসাবে ধরে নেয় এবং দুর্গের বাইরে বেরিয়ে মরবার এবং মারবার সিদ্ধান্ত নেয়। হিন্দী ফৌজ তলোয়ারের শপথ নিয়ে দুর্গের বাইরে বের হলে মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বীয় অধিনায়কদের দৃঢ়তার সাথে পিছু হটবার নির্দেশ দেন। হিন্দুরা তাদের আকীদামাফিক এটাকেই তাদের জয় মনে করে আবেগ-উৎসাহে আরব ফৌজের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। মুহাম্মদ বিন কাসিম যেই

www.almodina.com

বুঝতে পারলেন যে, এরা তাদের দুর্গ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে এসেছে ঠিক তখনি স্বীয় অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে হিন্দী ফৌজের উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসেন। এতে বহু হিন্দী সৈনিক মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। শেষ পর্যন্ত হিন্দী ফৌজ অস্ত্র সমর্পণ করে এবং সন্ধির আবেদন জানায়। এখানেও মুহাম্মদ বিন কাসিম একজন যোগ্য মুসলিম সেনাধ্যক্ষের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে শত্রুর প্রতি দয়া, মনুষ্যত্ব, সহিষ্ণুতাও ঔদার্যমূলক আচরণ করেন।

দেবল বিজয় ও সন্ধি চুক্তি

হাবীব বিন মাসলামা আরব সিপাহ্ সালারের পক্ষে নিম্নোক্ত চুক্তি-পত্রটি লিখেন ঃ "হাবীব বিন মাসলামা খলীফাতু'ল-মুসলিমীন-এর পক্ষ থেকে দেবল অধিবাসী সর্বসাধারণকে, চাই তারা খ্রীস্টান হোক, অগ্নি উপাসক, কিংবা য়াহূদী, উপস্থিত কিংবা অনুপস্থিত, তাদের জানমাল, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, উপাসনালয় এবং শহরের নিরাপত্তা প্রদান করছেন। তোমরা এই নিরাপত্তার আওতায়ততক্ষণ পর্যন্ত থাকতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকবে। তোমরা জিয্য়া ও খারাজ (রাজস্ব) যত দিন পর্যন্ত দিতে থাকবে, আমাদের উপর ততদিন পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা পালন করাও বাধ্যতামূলক হবে।"

বেলা ছিল একটি ছোট পল্লী। কিন্তু দেবল ছিল রাজা দাহিরের খুবই বিখ্যাত শহর ও বন্দর। বৌদ্ধধর্মের পুরোহিত, আমীর-উমারা, তাদের যুবতী স্ত্রী—সকলেই মুসলিম ফৌজের উন্নত ও পবিত্র চাল-চলন, ভদ্রতা ও সংবেদনশীলতাদৃষ্টে বিস্মিত হয়ে যায়। তাদের কল্পনায়ও আসে নি যে, তারা (বিজয়ী সৈনিকদের) লুট-পাটের হাত থেকে বেঁচে যাবে। কেননা সে-যুগে বিজয়ী ফৌজ পরাজিত শহরগুলোতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালাত এবং ধন-সম্পদ ও সতীত্ব-সম্ভ্রম লুণ্ঠন করত।

শহরটি তলোয়ারের জোরে বিজিত হয়েছিল। তাই শহরবাসী-দের নিকট থেকে রাজস্ব গ্রহণ জরুরী ছিল। শহরের সাধারণ নাগরিকবৃন্দ, যাদের অধিকাংশই ছিল ধনী ব্যবসায়ী, দেখতে না দেখতেই বিরাট অংকের অর্থ নযরানা হিসাবে পেশ করে।

www.almodina.com

এর ভেতর থেকে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মুহাম্মদ বিন কাসিম ঋণ পরিশোধের জন্য প্রথম কিস্তী হিসাবে বায়তুল মালে পাঠিয়ে দেন। অবশিষ্টাংশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণ করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের নামে রাজা দাহিরের পত্র

আরব ফৌজের সদাচরণ এবং বীরত্বের কাহিনী দেখতে না দেখতেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজা দাহির এতদশ্রবণে খুবই ক্রোধান্বিত হন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমকে নিম্নোক্ত পত্র লিখেন ঃ

"এই পত্র দ্বারা আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, দেবল শহর, যা জয় করতে তোমাকে খুবই কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, আসলে একটি মামুলী বাণিজ্য শহর বৈ ছিলনা যার নিরাপত্তা ও হেফাজতের জন্য আমরা সাধারণ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলাম এবং সেখানকার বণিকদের হেফাজতের জন্য আমরা অল্পই রক্ষী-ফৌজ মোতায়েন রেখেছিলাম।

"আমাদের চোখে উক্ত শহরের তেমন কোন গুরুত্ব ছিলনা। তাই তা রক্ষার জন্য কোন দুর্গ যেমন নির্মাণ করিনি, তেমনি সেখানে কোন শক্তিশালী সেনাবাহিনীও আমরা রাখিনি। অতএব বণিক ও কারিগরদের বস্তীসম একটি শহর জয় করার মধ্যে তোমাদের উল্লাসের কোন কারণ নেই। আমরা যদি তার হেফাজতের জন্য রাজার মত কোন বাহাদুর সেনাপতিকে পাঠাতাম তাহলে তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করার মজাটা টের পেতে। সে তোমাদের সব বাহাদুরী ধুলিস্মাৎ করে দিত। এ দুনিয়াতে কেউ বাহাদুর সেনাপতি রাজাকে মুকাবিলা করতে পারে না। বিজয় সব সময়ই তার পদচুম্বন করে। তার তলোয়ার যে কোন বীরপুরুষের পানির পিয়াস মিটিয়ে দিতে পারে। যখন তা খাপ থেকে বের হয় তখন চতুর্দিকে ধ্বংসলীলার তাণ্ডব সৃষ্টি করে এবং শত্রুকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়।

"তা ছাড়াও আমাদের কাছে আরও আত্মোৎসর্গীত বীর রাজা বর্তমান আছেন। তাঁদের ভিতর কাশমূর রাজ্যের রাজা খুবই শক্তিবান--যার অমিততেজা ফৌজ এবং অপরিমেয় শক্তি ও প্রভাবের সামনে ভারতের বড় বড় শাসকরাও মাথা নুইয়ে দিয়েছে। তুরান এবং মাকরানের শাসকদ্বয়ও আনুগত্য স্বীকার করে নিজেদের সৈন্যসামন্ত সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছে।

www.almodina.com

"যখন এই বিজয়ী রাজা লোক-লশকর এবং একশত হাতী-সহ স্বীয় শ্বেত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধে বের হন তখন পদাতিক ও আরোহী সৈনিক পুরুষেরা তাঁর মুকাবিলায় টিকতে পারেনা। আমি কিন্তু তোমার যৌবন ও বোকামির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এমন বাহাদুর সৈনিক পুরুষকে তোমার মুকাবিলায় পাঠায়নি। কেননা তুমি তাঁর সামনে অঘোরে প্রাণ দিতে। দুনিয়ার কোন ফৌজ আমাদের সাম্রাজ্যের কোন একটি কোণেও প্রবেশ করবার স্পর্ধা রাখেনা। অতএব তোমাদের নিরাপত্তা এতেই নিহিত যে, তোমরা নিজেদের দেশে ফিরে যাও এবং আমাদের রোষাগ্নি থেকে নিজেদের রক্ষা কর।"

মুহাম্মদ বিন কাসিমের জওয়াব

মুহাম্মদ বিন কাসিম দাহিরের দীর্ঘ পত্রের জওয়াব মাত্র কয়েক শব্দের মধ্যে দেনঃ "এ ধরনের বাহাদুর পুরুষের সাহস ও শক্তি পরীক্ষার জন্য আমি যথা সত্বর রওয়ানা হচ্ছি।" এই পত্রের সাথেই তিনি তাঁর ফৌজকে নীরূনের দিকে অগ্রসর হবার হুকুম দেন।

নীরূন[১] বিনা প্রতিরোধেই মুহাম্মদ বিন কাসিমের হস্তগত হয়। প্রজাকুলের সন্তুষ্টি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে স্বীয় প্রতিরক্ষা পরি-

১. বর্তমানে এ শহরের সঠিক অবস্থান জানা যায় না। আরব পর্যটকগণ একে মনসূরা (যার বুনিয়াদ রেখেছিলেন কয়েক বছর পর বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিমের পুত্র ওমর) এবং দেবলের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত বলে লিখেছেন। এই শহর সিন্ধু নদের পশ্চিম পাড়ে সহ্ওয়ানের নিকটে ছিল।
মিঃ এম. পি. চাবিলানীর মতে, এটিই বর্তমান হায়দরাবাদ। আমরা এ মতের সঙ্গে একমত নই। বিশেষত এ জন্য যে, তারা এর দূরত্ব দেবল থেকে ২৫ ক্রোশ লিখেছেন। হায়দরাবাদ একদিকে সিন্ধু নদের পূর্ব কিনারে অবস্থিত এবং অন্যদিকে ১৪০ মাইলের মত সমুদ্র থেকে দূরে।
অনুমানে বলা যায় যে, এ শহর বর্তমান জঙ্গশাহী এবং ঝুমপীর-এর দুলদুলের নিকটবর্তী ছিল। দূরত্ব ও দুলদুলে জমি, খারাপ ও তেতো পানি এবং খারাপ আবহাওয়ার দিক চিন্তা করলে এ স্থানটিই নীরূন হবে বলে মনে হয়। এটিই ছিল সেই শহর যেখানে প্রত্যাবর্তনকালে মুহাম্মদ বিন কাসিমের ফৌজ মশার কামড়ে ও বসন্ত রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। এ এলাকায়, আজও বেশ পশু এ কারণে মারা যায়।

www.almodina.com

কল্পনার উপর আমল করার সাহস আরও বাড়িয়ে দেয়। অতএব নীরূন—এ কয়েকদিন অবস্থান করার পর তিনি সহ্ওয়ানের দিকে অগ্রসর হলে লাহরাজ নামক শহরের অধিবাসীবৃন্দ অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে তার আনুগত্য স্বীকার করে।

অতঃপর এখানকার ঠাকুর, জাট ও মায়দ প্রমুখ শ্রেণী ও জাতি-গোষ্ঠী মুহাম্মদ বিন কাসিমের সহযোগী হতে শুরু করে। এদের মধ্যে কতক এমনও ছিল যারা নিজেরাই স্বতস্ফূর্তভাবে ইসলাম কবুল করে। কতক নিজ নিজ ধর্মে—থেকেও এই নওজোয়ান মহান আরব সেনাপতির আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

এসব হিন্দী সহযোগী রাজা দাহিরকে পরাজিত করবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।১

সহ্ওয়ান অভিমুখে অগ্রাভিযান

সহ্ওয়ানের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা বজ্র। সহ্ওয়ান শহরের আজ আর সে খ্যাতি নেই। এর আশেপাশের যমীন আজও অত্যন্ত উর্বর। এখানকার অধিবাসীবৃন্দ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল। রাজাকে তারা পসন্দ করতনা। রাজা বজ্র শহরের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। না জানি শহরের অধিবাসীরাই তাঁকে হত্যা করে বসে--এই আশংকায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে রাজা কাকার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন। রাজার বজ্রের পলায়নে প্রজাবৃন্দ দুর্গের দরজা উন্মুক্ত করে দেয় এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে। এখান থেকে মুহাম্মদ বিন কাসিম চুনা, নায়ারকোট এবং খফদার হয়ে সীসেম অর্থাৎ সিবীর দিকে অগ্রসর হন।

সিবীর রাজা কাকা

রাজা কাকার পূর্বপুরুষ গঙ্গা অববাহিকা থেকে আগমন করে-ছিল। এরা ছিল সেই সব লোক যাদেরকে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী

১. এইসব সহযোগীই সেই সব হিন্দী অশ্বারোহী বাহিনীর পূর্বপুরুষ যাদের অস্তিত্ব বৃটিশ রাজত্বকাল অর্থাৎ ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। পরে এই বাহিনীকে ট্যাংক রেজিমেন্টে রূপান্তরিত করা হয়।

www.almodina.com

হবার কারণে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এই রাজাও রাজা দাহিরের করদ মিত্র ছিলেন।

রাজা কাকার নিকট তাঁর সহধর্মীরা দেবল ও নীরূন প্রভৃতি স্থান থেকে এসেছিল এবং সকলেই তাকে আরবদের সঙ্গে সন্ধি করবার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের পরামর্শে কান দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি। রাজা কাকা সীসেম থেকে বহির্গত হয়ে হিলয়ান-এর দিকে অগ্রসর হন এবং বজ্রকে বলেন যে, তিনি সিবী থেকে দূরে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মুকাবিলা করে তাকে পরাজিত করতে চান। কতক ঐতিহাসিক এখানে হিলয়ান-এর স্থলে বাজান-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

রাজা দাহির এক বিরাট বাহিনী বজ্রের সাহায্যে পাঠিয়ে দেন যেন তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ডান দিক ও পশ্চাদ্দিক থেকে হামলা করে বজ্রকে জয়ী হতে সাহায্য করে। এ বাহিনীর আগমনে বক্কান কিংবা (হিলয়ান) এলাকার লোকেরা রাজা কাকার নিকট আবেদন জানায় যেন তাদেরকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের উপর হামলা করে তার ফৌজকে ধ্বংস ও বরবাদ করবার সুযোগ দেওয়া হয়। রাজা কাকা আনন্দের সংগে তাদের আবেদনে সাড়া দেন। অতএব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, বজ্র শাহী ফৌজ নিয়ে সিবী চলে যাবেন এবং রাজা কাকা সেখানকার ছোট ছোট ঠাকুর ফৌজ একত্র করে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সংগে লড়বেন।

হিল্‌য়ানের ঠাকুরগণ রাজা কাকাকে বলে যে, তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের উপর রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণ করবে এবং ভোরবেলা যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকবেন তখন রাজা কাকা যেন তাঁর উপর স্বীয় ফৌজ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন। রাজা কাকা তাদের এই প্রস্তাব মেনে নেন। রাত্রিবেলা হিলয়ানের ঠাকুর মুহাম্মদ বিন কাসিমের ফৌজের উপর হামলা করবার জন্য বের হয়। কিন্তু ভোর হলে তারা এই দেখে বিস্মিত হয় যে, তারা আরব ফৌজের দিকে অগ্রসর হবার পরিবর্তে ভুল নালা দিয়ে সফর করার কারণে সিবীর নিকটে গিয়ে পৌঁছেছে।

রাজা কাকার গুপ্তচরেরা যখন তাকে এখবর দিল তখন তিনি ধারণা করলেন যে, এসব লোক তাকে ধোকা দিয়ে মুহাম্মদ বিন

www.almodina.com

কাসিমের হাতে তুলে দিতে চায়। তাহলে কি তারা নীরূন, দেবল প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলে গেছে?

কাকার মনে এধরনের নানাবিধ কল্পনার উদয় হওয়া একান্তই স্বাভাবিক ছিল এবং এজন্য তিনি ভীষণ পেরেশানও ছিলেন। কেননা তারা ব্রাহ্মণদের জোর-যবরদস্তী এবং রাজা দাহিরের কর্মপন্থাতে খুশী ছিলনা। রাজা দাহির ছিলেন কঠোর প্রকৃতির শাসক এবং ভীষণ অহংকারীও। তাঁর ধারণা সম্ভবত এই ছিল যে, আরব ফৌজ অন্যান্য বিজয়ী সেনাদলের মত জয়লাভের পর নিজেদের বাড়ী-ঘরে ফিরে যাবে।

রাজা কাকা সিবী থেকে এজন্যই চলে এসেছিলেন যেন বজ্র থেকে আলাদা হয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক অনুমান করে উপযোগী ফয়সালা করতে পারেন। এদিকে ঠাকুর ফৌজ আকস্মিকভাবে রাস্তা ভুলে যাওয়াকে অশুভ চিহ্ন হিসাবে ধরে নেয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সঙ্গে সন্ধি করে তারা তাঁর সাথে মিশে যাবে।

রাজা বজ্র নিজেই নিজেকে সিবীর দুর্গে বন্দী করে ফেলেছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম উক্ত কেল্লা অবরোধ করেন। কয়েক দিন পরেই বজ্রের মনে ভয় দেখা দেয় যে, প্রজাকুল মনের দিক দিয়ে তার সঙ্গে নেই। অতএব তিনি বিশ সহস্র বাছাইকৃত রাজপুত অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে দুর্গ থেকে অত্যন্ত গোপনে বেরিয়ে পড়েন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের উপর অতর্কিতে হামলা করে বসেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের ফৌজ চতুর্দিক দিয়ে দুর্গ অবরোধ করবার জন্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। সেজন্য এই বিরাট হিন্দী ফৌজের জোরদার ও তীব্র আক্রমণ আরব ফৌজের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন নির্ভীক ও দূরদর্শী অধিনায়ক। তিনি তাঁর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা মুতাবিক বিক্ষিপ্ত ফৌজকে একত্রিত হবার নির্দেশ দেন এবং যথাসম্ভব সত্বর সেনানায়কদের এ পরিকল্পনার উপর আমল করবার তাকীদ দেন। বস্তুত তিনি এক্ষেত্রে তাঁর অনুকরণযোগ্য খ্যাতনামা

www.almodina.com

অধিনায়ক খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ-এরই হুবহু নকল করেন অর্থাৎ তিনি তাঁর বাহিনীর মধ্য ভাগকে পেছনে সম্মুখ ভাগের দিকে হটে যাবার এবং ডান ব্যূহ ও বাম ব্যূহকে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়বার হুকুম দেন। অর্থাৎ তাঁর সেনাব্যূহ দ্বিতীয়ার চাঁদের রূপ ধারণ করে।

প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াই চলছিল। হিন্দী ফৌজের সংখ্যাধিক্যের কারণে আরবদের বেশ ক্ষতি হচ্ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম এসব কিছুই লক্ষ্য করছিলেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট বিক্ষিপ্ত অংশ সুশৃংখল হয়ে শত্রুর পশ্চাদ্দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন তিনি গোটা ফৌজকে একযোগে হামলা করবার নির্দেশ দেন।

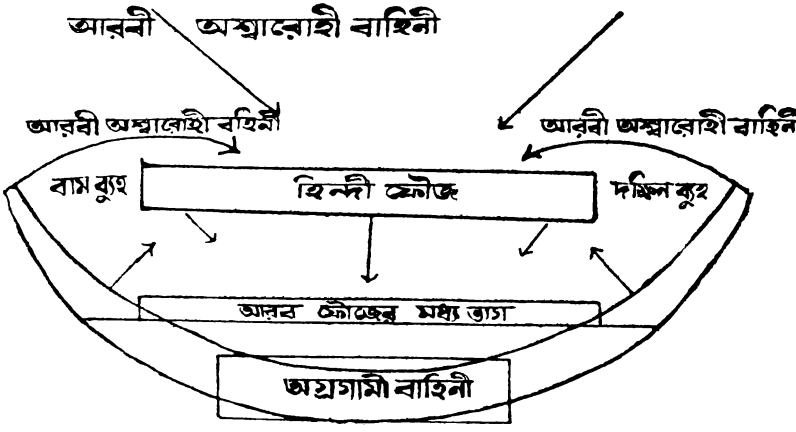

হিন্দী ফৌজ তাদের পশ্চাদ্দেশে হামলা হতে দেখে ঘাবড়ে যায়। বজ্র তার নিজের ফৌজকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হতে দেখে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যান। এতে হিন্দী ফৌজ মনোবল হারিয়ে বসে এবং সকলেই পিছন ফিরে কুম্ভ নদীর দিকে পালাতে শুরু করে। এমতাবস্থায় খুব কম সংখ্যক সৈন্যই আরব ফৌজের হাত থেকে জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হয়। বহু সৈন্য হতাহত এবং যথেষ্ট সংখ্যক বন্দী হয়। বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুহাম্মদ

www.almodina.com

বজ্রের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ বিন কাসিম

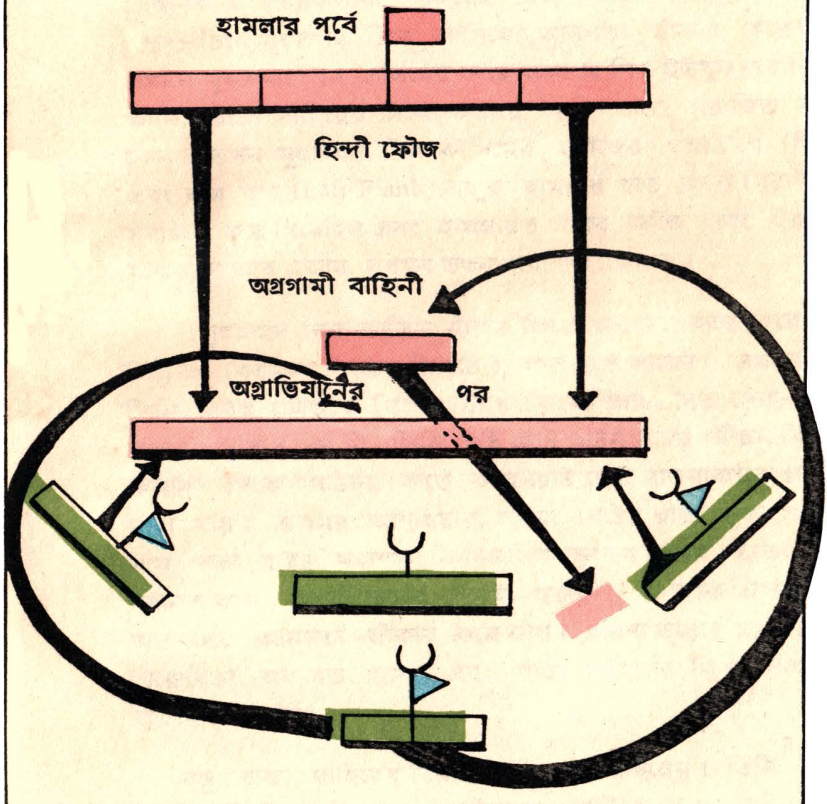

www.almodina.com

বিন কাসিমের হস্তগত হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম যুদ্ধলব্ধ (মালে গণীমত) মালামালের সঙ্গে অনেক গোলামও ইরাকে পাঠান। এসব গোলাম ছিল যুদ্ধবন্দী। এর পর মুহাম্মদ বিন কাসিম সালুজ এবং কান্দাবীল অর্থাৎ কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার অধিবাসীরা সকলেই ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা সন্তুষ্ট চিত্তে মুহাম্মদ বিন কাসিমের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। এখানে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর নির্দেশ আসে, 'রাজা দাহিরের দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে পরাজিত কর।' কেননা তখন মুহাম্মদ বিন কাসিমের ফৌজের পশ্চাদ্দেশ (Rear) এবং বাম ব্যূহ (Left-Flank) শত্রুর হামলার হাত থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল এবং হামলারত আরব ফৌজ এবং ইরাকের মাঝখানে আর কোন দুশমন তখন অবশিষ্ট ছিল না।

মুহাম্মদ বিন কাসিম নীরূন ফিরে আসেন, যাতে করে তিনি সিন্ধুনদ (বর্তমান ঠাঠের নিকটে) পার হতে পারেন। এখানে এসে তিনি দেবল ফৌজকে বিশ্রাম গ্রহণ কিংবা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করারও সুযোগ দেন নি। তিনি ছোট ছোট প্লাটুন নদের পশ্চিম কিনারে কয়েক দিকে পাঠান, যাতে করে ছোট ছোট রাজন্যবর্গকে পদানত করা যায়। এক্ষেত্রে আশহিয়ার, সূরনা বেটের রাজা মূকা প্রমুখের নাম করা যায়। মুহাম্মদ বিন কাসিম অনুভব করেন যে, তাদেরকে পদানত করা অগ্রাভিযানের পূর্বেই জরুরী। যা-হোক ঐসব রাজা আরবদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। অবশ্য ভূট্টোর রাজা রাসেল বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন এবং রাজা দাহিরের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান।

বজ্র রাজা দাহিরের নিকট পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি বিরাট একটি বাহিনীকে তাঁর পুত্র জয়সিংহের অধীনে গোথ নদীর (এটি সিন্ধু নদীর একটি শাখা) তীরে ঘেঁষে বেট দুর্গের দিকে পাঠান এবং নিজে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সিন্ধুনদের কিনার দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। তিনি মুসলিম ফৌজের মুখোমুখি ছাউনী ফেলেন এবং বিভিন্ন স্থানে চৌকী কায়েম করেন যাতে করে আরব ফৌজ সিন্ধু নদের তীরে অবতরণ করতে না পারে।

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিম দূত মারফত একটি চিঠি রাজা দাহিরাকে লিখে পাঠান। তাতে নিম্নরূপ পয়গাম ছিল ঃ

১. সমস্ত আরব কয়েদীকে সম্মানের সাথে মুক্তি দাও।
২. রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায় কর।
৩. তোমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। তা কবুল কর, অন্যথায় জিযয়া এবং রাজস্ব দিতে সম্মত হও।
৪. অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

এ পত্রের উত্তর রাজা দাহির কড়া ভাষায় দেন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমকে দূতের মাধ্যমে কুকুরের ন্যায় মরণ বরণের পয়গাম পাঠান।

রাজা দাহির স্বীয় বাহিনী এবং রাজা জয়সিংহের বাহিনী পাঠিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিরাট বাহিনী সিন্ধুনদের তীরে এ উদ্দেশ্যে পাঠান যেন তারা সুস্তান ও তুরানে ত্রাসের সৃষ্টি করে। সিপাহ্সালার নিযুক্ত করা হয় রাজা গোপীকে। আমরা প্রথমেই লিখেছি যে, এ-দু'জন রাজা দাহিরের পক্ষ থেকে বুদ্ধিয়ার গভর্নর ছিলেন। তারা সিন্ধুনদের তীরবর্তী বাগরূর-এর নিকট অবস্থান নেন। এসব বাহিনীর অগ্রাভিযান নিম্নরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে ঃ

১. বেট-এর রাজা জাহীন এবং রাজা রাসেল-এর সাহায্যের জন্য বহু লোক একত্রিত হয়। অনন্তর রাজা রাসেল রাজা মুকার উপর হামলা করবার জন্য অগ্রাভিযান পরিচালনা করেন।

২. বহুলোক বুদ্ধিয়া এলাকায় রাজা রামচন্দ্রের শুভাকাঙ্খীতে পরিণত হয় এবং বাগরূর নিকট জমা হয়ে তার ফৌজে যোগ-দান করে।

৩. কিন্তু অনেক ঠাকুর এমনও ছিল, যারা অন্তর দিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে চাইত। তাই তারা মুহাম্মদ বিন কাসি-মের সঙ্গে এসে মিলিত হয়।

রাজা দাহিরের এই প্রতিরক্ষা চালের মুকাবিলায় মুহাম্মদ বিন কাসিম খুবই দ্রুতগতিতে পাল্টা চাল দেন। তিনি প্রথমেই জাট, মায়দ এবং ঠাকুর ফৌজকে সুসংগঠিত করে তাদেরকে সত্বর

www.almodina.com

আপন ছাঁচে ঢেলে নেন। তিনি এ বাহিনীর সেনানায়কদের সঙ্গে উপদেষ্টা হিসাবে আরব অধিনায়ক নিয়োগ করেন, যাতে করে তারা সর্বাধিনায়কের মুখপাত্র হিসাবে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

নিজের কিছু ফৌজকে নীরূন-এ ছেড়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম বিদ্যুৎগতিতে রাজা রামচন্দ্রের দিকে অগ্রসর হন। রাজা দাহির যে সব সমরাস্ত্র ও রসদ-সম্ভার রাজা রামচন্দ্রের সাহায্যে পাঠিয়েছিলেন, আকস্মিকভাবে তা মুহাম্মদ বিন কাসিমের হস্তগত হয়, যদিও এটা ছিল একান্তই অপ্রত্যাশিত। মুহাম্মদ বিন কাসিম এর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নীরূন-এ পাঠিয়ে দেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম এভাবে স্বীয় বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। কিছু অশ্বারোহী কোম্পানী এবং কিছু উষ্ট্রারোহী প্লাটুনকে তিনি বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেন, যাতে তারা সেসব লোককে—যারা রাজা রামচন্দ্রের সাহায্যের জন্য একত্রিত হচ্ছে, মেরে তাড়িয়ে দেয়। অবশিষ্ট ফৌজ নিয়ে তিনি নিজে রামচন্দ্রের দিকে অগ্রসর হন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের এই প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা যদিও সঠিক ছিল, কিন্তু একেবারে বিপদমুক্ত ছিল না। তথাপি ফল তা-ই হ'ল, যা মুহাম্মদ বিন কাসিম পূর্বাহ্নেই অনুমান করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ রাজা রামচন্দ্র প্রথমে স্বীয় ফৌজকে গুছিয়ে নিয়ে সিন্ধু নদের তীর বেয়ে অগ্রসর হন, কিন্তু যখন তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের অগ্রসর হবার খবর শুনলেন এবং ছড়িয়ে পড়া গুজবের কারণে আরব ফৌজের সংখ্যা অনেক বেশী বলে জানতে পারলেন—তখন তার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, তার ফৌজ নিশ্চিতভাবেই আরব ফৌজের ঘেরাও-এর মধ্যে পড়ে যাবে। অগত্যা তিনি দ্রুতগতিতে সিন্ধুনদের অপর পারে চলে যান এবং পাড়ে উঠে সমস্ত নৌকা জ্বালিয়ে দেন, যাতে মুহাম্মদ বিন কাসিম তার পশ্চাদ্ধাবন করতো না পারেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম এই সংবাদ জানতে পেরে একটি মামুলী কোম্পানী একজন সেনানায়কের তত্ত্বাবধানে রেখে রাত্রিবেলা অত্যন্ত সঙ্গোপনে বেটের দিকে অগ্রসর হন। সাথে সাথে এই কোম্পানীর অধিনায়ককে নির্দেশ দিয়ে যান, 'যেসব সিন্ধী আনুগত্য কবুল করবে তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবে।'

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা জয়সিংহের মুকাবিলার জন্য এত দ্রুত-তার সঙ্গে অগ্রসর হন যে, তিনি (জয়সিংহ) হতভম্ব হয়ে পড়েন। কেননা জয়সিংহের গুপ্তচরেরা তাকে আগেই এই সংবাদ দিয়েছিল যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা রামচন্দ্রের মুকাবিলায় ব্যস্ত রয়েছেন। সেজন্য তিনি এবং রাজা রাসেল তাদের সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে বেট জয় করার ফন্দি আঁটছিলেন। কিন্তু যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন এবং অপরদিকে রাজা মুকাও অগ্রাভিযান করলেন, তখন রাজা জয়সিংহ ঘাবড়ে গিয়ে পিছু হটে যান এবং রাজা দাহিরের ফৌজের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন। ঐ সময় মুহাম্মদ বিন কাসিমের ফৌজের মধ্যে মহামারী দেখা দেয়। বহু ঘোড়া ও উট এতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সৈন্যরাও জ্বর ও বাতে আক্রান্ত হয়। এই মহামারী মুহাম্মদ বিন কাসিমকে খুবই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে। অগত্যা তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট জরুরী সাহায্য ও ঔষধ চেয়ে পাঠান।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাৎক্ষণিকভাবে দু'হাজার অশ্বারোহী সৈনিক এবং বেশ কিছু উট ও ঘোড়া পাঠিয়ে দেন। তিনি এক প্রকার সিরকা রুটিতে ভিজিয়ে সে রুটি রোদে শুকিয়ে নেন। এই রুটি পুনরায় পানিতে ভিজালে সিরকায় পরিণত হ'ত এবং এই সিরকা জ্বর ও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করত। হাজ্জাজ এই রুটি বহুল পরিমাণে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নিকট পাঠিয়ে দেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজেও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি সেখানকার বাসিন্দাদের বিরাট সংখ্যায় আরব ফৌজে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। এসব লোক ভর্তি হবার মুহূর্তে তাদের ঘোড়া, তলোয়ার, ভালা প্রভৃতি নিজেদের সঙ্গে নিয়ে আসত। তারা যুদ্ধে তাদের অবদানের বিনিময়ে বেতন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে অংশ পেত। অতি অল্প দিনেই এই জাতীয় ফৌজের সংখ্যা বেড়ে কয়েক হাজারে গিয়ে পৌঁছে। মুহাম্মদ বিন কাসিম একদিকে অটুট মনোবল ও দূরদর্শিতার সঙ্গে শত্রুর মুকাবিলায় অগ্রসর হচ্ছিলেন। অন্যদিকে রাজা দাহির মহামারী সম্পর্কে অবগত হয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে বলে পাঠান, "এখনো সময় আছে; ফিরে যাওয়া তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কথা দিচ্ছি, আমি তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করব না।"

www.almodina.com

সিন্ধুনদের ছাউনী এবং ফৌজের মুকাবিলা

মুহাম্মদ বিন কাসিম জবাবে বলেন, "খুব সত্বর আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে আসছি।"

রাজা তারবার্তা পাঠিয়ে স্বয়ং শিকার ও আনন্দভ্রমণে মত্ত হয়ে যান এবং রাজা রাসেল ও জয়সিংহকে একটি বাহিনী দিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। তাদের উপর নির্দেশ ছিল যে, তারা তাদের বাহিনী নিয়ে সিন্ধুনদের তীর ধরে সতর্কতার সঙ্গে টহল দিয়ে বেড়াবে, যেন আরব ফৌজ সিন্ধু পার হতে না পারে।

শত্রু ছাউনীর নিকট দিয়ে সিন্ধুনদ পার হবার জন্য মুহাম্মদ বিন কাসিম কয়েকবার ছোট ছোট প্লাটুন পাঠান। কিন্তু প্রত্যেকবারই হিন্দী ফৌজ আরব ফৌজকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এতদসত্ত্বেও মুহাম্মদ বিন কাসিম উপর্যুপরি প্লাটুনের পর প্লাটুন পাঠাতে থাকেন এবং বারবার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তার মনোবল এতটুকু ভেঙে পড়েনি।

রাজা কাকা এবং রাজা মুকার পরামর্শে এবার তিনি বহু আরব সৈন্য নিঃশব্দ গতিতে সাক্রা (মীরপুর সাক্রা) এবং এর অগ্রবর্তী এলাকাতে স্থানান্তরিত করেন। জয়সিংহের সঙ্গী এ ধারণায় কাল ক্ষেপণ করেন যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম নীরূনেই অবস্থান করছেন। প্রকৃতপক্ষে জাট এবং ঠাকুরদের সংখ্যা প্রতিদিনই এমনভাবে বেড়ে চলছিল যে, রাজা দাহিরের গুপ্তচরেরা মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির সঠিক পরিমাপ করতে পারে নি। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাক্রাগামী ফৌজ কেবলমাত্র রাত্রিকালেই সফর করত, যাতে করে কেউ তাদের চলাচল ও গতিবিধি টের না পায় এবং দিনের উত্তপ্ত রৌদ্রের সফরজনিত ক্লান্তি থেকেও তারা মাহফুজ থাকে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম দু'টি প্রবেশপথ বেছে নেন। তন্মধ্যে একটি সাক্রার নিকট সিন্ধুনদের তীরে। অনুমান করা চলে যে, এ দু'টি প্রবেশপথকে আজকাল 'আল্লাহ রাখ্‌খো' এবং 'মারহূ' প্রবেশপথ বলা হয়। এদু'টি সাক্রার পশ্চিমে এবং শাহবন্দ-এর উত্তরে অবস্থিত।

এখানে মুহাম্মদ বিন কাসিম নতুন একটি ফর্মূলা উদ্ভাবন করেন। তিনি অনেকগুলো নৌকা সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে একত্রিত

www.almodina.com

করে একটির সাথে অন্যটিকে শক্তভাবে বেঁধে দেন। অতঃপর একরাত্রে কয়েকজন সাঁতারুকে নদীর ওপারে পাঠিয়ে অগ্রভাগের নৌকা, যেটির সাথে মযবুত রশি বাঁধা ছিল—পূর্ব কিনারে জুড়ে দেন। আকস্মিকতাই বলুন বা যোগ্যতাই বলুন—সিন্ধুনদের উপর একটি পুল তৈরী হয়ে যায় এবং তার উপর দিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম ফৌজসহ বিদ্যুৎগতিতে নদী পার হয়ে পূর্ব পাড়ে গিয়ে পৌঁছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজা দাহিরের ফৌজ অভিমুখে অগ্রসর হন। রাজা দাহির তখন ফৌজের সাথে ছিলেন না। রাজা রামচন্দ্র যেই শত্রুর পার হবার কথা জানতে পারলেন অমনি রাজা রাসেলকে একটি বাহিনীসহ মুহাম্মদ বিন কাসিমের মুকাবিলায় পাঠিয়ে দেন এবং নিজে ফৌজের অবশিষ্টাংশ নিয়ে বাহমনাবাদের দিকে চলে যান।

রাজা দাহির সেখানে মুসলিম ফৌজের মুকাবিলায় অবতরণ না করে স্বীয় রাজধানীর দক্ষিণ দিকে একটি দুর্গে মুকাবিলা করার সিদ্ধান্তে নেন। কেননা উক্ত দুর্গের নিকটে পৌঁছতে হলে শত্রুকে একটি বিরাট দুলদুলে এলাকা অতিক্রম করতে হবে। এই দুলদুলে এলাকা হচ্ছে শাহদাদপুরের পার্শ্ববর্তী এলাকা, যাকে মুক্ষী ডাণ্ড স্কীমের অধীনে ১৯৪৫ সালে সরকার পরিষ্কার করে চাষ ও কর্ষণযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত করেছেন এবং এখন সেখানে বেশ ভাল রকমের ফসলাদি উৎপন্ন হচ্ছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম মানের কার্পাস তুলা এবং গম উল্লেখযোগ্য।

রাজা রাসেলের মুকাবিলায় মুহাম্মদ বিন কাসিম 'আবদুল্লাহ বিন 'আলী ছাকাফীকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে সমগ্র ফৌজ এবং ভারী সাজ-সরঞ্জাম একত্রিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রাসেল এবং 'আবদুল্লাহ্‌র মধ্যে মাহম নামক স্থানে প্রচণ্ড লড়াই সংঘটিত হয়, এতে রাসেল পরাজিত হন। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নিকট অস্ত্র সমর্পণ করেন এবং ভবিষ্যতে বিশ্বস্ত থাকবেন বলে শপথ করেন। শেষ পর্যন্ত মুকা, রাসেল এবং কাকা এই তিনজন রাজা মুহাম্মদ বিন কাসিমের অধীনে লড়াই করবার জন্য একত্রিত হলেন।

রাজা রাসেলের সাম্প্রতিককালের সকল অবস্থা জানা ছিল। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে যথাসত্বর সম্মুখে অগ্রসর হবার

www.almodina.com

পরামর্শ দেন, যাতে তাঁর ফৌজ দুলদুলে এলাকা অতিক্রম করে নিরাপদে জয়পুর (এটি রাওর-এর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল) পৌঁছতে পারে। রাজা রাসেলের পথ প্রদর্শন এবং সুব্যবস্থাপনায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের ফৌজ বিশেষ কোন বাধা ছাড়াই জয়পুরে গিয়ে পৌঁছে।

রাজা দাহির এ খবর শুনে মুকাবিলার জন্য দুর্গের বাহিরে খোলা ময়দানে বেরিয়ে আসেন। তাঁর ফৌজের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষেরও অধিক এবং তারা উন্নতমানের সমরাস্ত্রে সজ্জিত ছিল। জয়পুরের উত্তরে কুরিওয়াহ নদীর দক্ষিণ প্রান্তরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের আরব ফৌজে প্রায় পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচ হাজার উষ্ট্রারোহী ছিল। সেই সাথে ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত ঠাকুর, মায়দ এবং জাট সৈনিক। এদের কাছে রাজা দাহিরের ফৌজের মত না ছিল উন্নতমানের সমরাস্ত্র—আর না ছিল হাতী। অবশ্য মুহাম্মদ বিন কাসিম হিন্দু আরোহী বাহিনীকে স্বীয় পরিকল্পনা মাফিক ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন। আর তাঁর গোটা ফৌজ ছিল একদেহ, একপ্রাণ, সুশৃঙ্খল এবং সুসংগঠিত। নীচে যুদ্ধক্ষেত্রের একটি চিত্র পেশ করা যাচ্ছে। এর দ্বারা উভয় ফৌজ কিভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল, তা বুঝতে সুবিধা হবে (ছবি পরের পৃষ্ঠায়)।

রাজা দাহিরের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ছিল স্বীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীল। মনে হয় যে জয়সিংহের অশ্বারোহী বাহিনীকেও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং হেফাজতের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। আক্রমণের দায়িত্ব তিনি জাহীনের হাতে সোপর্দ করেছিলেন। জাহীন ছিলেন আত্মোৎসর্গী সাহসী একজন অফিসার। কিন্তু তার ফৌজ বিভিন্ন সর্দারের অধীনে ছিল বলে সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ছিল না।

মুহাম্মদ বিন কাসিম ক্রদিস-এর সামরিক নীতির উপর স্বীয় ফৌজকে বিন্যস্ত করেছিলেন। হিন্দী অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য তিনি স্বীয় ফৌজের সামনে খন্দক (পরিখা) খনন করে নিয়েছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম যেহেতু তাঁর ফৌজের মনোবলের উপর পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন—

www.almodina.com

সেজন্য তিনি নিজে আক্রমণের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবার পরিবর্তে রাজা দাহিরের ফৌজের হামলার অপেক্ষা করতে থাকেন।

সর্দার জাহীন ঠাকুর অশ্বারোহী কোম্পানী দিয়ে হামলা করেন। কিন্তু তার সব হামলাই খন্দকের কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। খন্দকের আড়াল থেকে আরব তীরন্দাযগণ হিন্দী ফৌজের বিরাট ক্ষতিসাধন করে। ফলে হিন্দী ফৌজের মধ্যে কিছুটা হুড়াহুড়ি ও হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হয়। ঠিক তখনি দক্ষিণ ও বাম বাহুর মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করে বসে এবং খন্দকের কারণে তারা যারপরনাই অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে। অবস্থা দৃষ্টে রাজা দাহির তাঁর গোটা বাহিনীকে একযোগে হামলা করবার নির্দেশ দেন, যাতে করে তারা আরবদের হামলা প্রতিরোধ করবার পর বাকী আরব ফৌজকে দলে পিষে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে।

আরব ফৌজের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা মুতাবিক হিন্দী ফৌজের ভেতর যখন গোলমাল ও হৈ চৈ লক্ষ্য করা গেল ঠিক তখনই আবূ সাবির হামদানী এবং রাজা রাসেল লম্বা চক্কর কেটে হিন্দী ফৌজের পেছনে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তাদের কেরোসিন তৈলে পূর্ণ জ্বলন্ত তীর নিক্ষেপকারী তীরন্দায বাহিনী তীর এবং তৈলের পিচকারীর সাহায্যে হস্তিযুথের উপর জ্বলন্ত মশাল নিক্ষেপ করতে থাকেন। আকস্মিকভাবেই একটি জ্বলন্ত তীর রাজা দাহিরের হাতীর শুড়ের রেশমী চাদরে গিয়ে গাঁথে এবং তাতে আগুন ধরে যায়। এই আগুনের কারণে হাতী ঘাবড়ে গিয়ে পালাতে থাকে। সাধারণ সৈনিকেরা মনে করল যে, রাজা দাহির তার নিজের জীবন বাঁচাতে কেটে পড়ছেন।

আবূ সাবিরের হামলার সঙ্গে সঙ্গেই মুহাম্মদ বিন যিয়াদ, রাজা মুকা এবং রাজা কাকার অশ্বারোহীবৃন্দ রাজা দাহিরের ফৌজের দক্ষিণ ও বাম ব্যূহের উপর হামলা করে বসে। এই হামলার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ অগ্রবর্তী বাম বাহুর ফৌজও একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রাজা দাহিরের মৃত্যু

রাজা দাহির মাহুতকে নির্দেশ দেন হাতীকে নদীর দিকে নিয়ে যাবার জন্যে। এখানে এসে হাতী পানির ভেতর শুয়ে পড়ে। রাজা

www.almodina.com

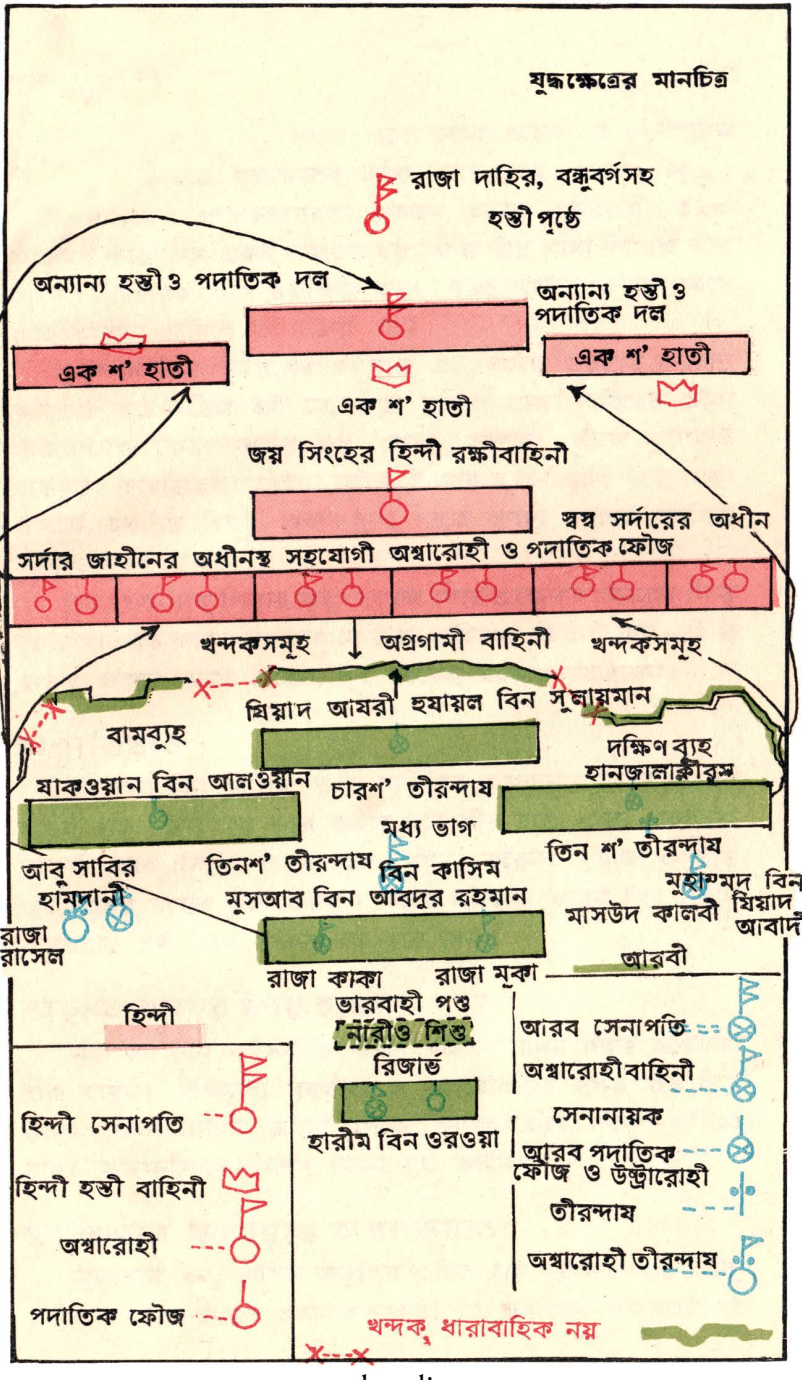

www.almodina.com

দাহির সঙ্গে সঙ্গে হাতীর পিঠে থেকে নেমে পড়েন এবং ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন। এমনি সময়ে রাজা দাহিরের পশ্চাদ্ধাবনরত একজন আরব অশ্বারোহী তাঁকে আক্রমণ করে এবং একই আঘাতে ধড় থেকে তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। দাহিরের ফৌজ পরাজিত হয়। ৭১৩ খৃস্টাব্দের জুন মাসে ১০ই রমযান তারিখে এ ঘটনা ঘটে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের এ যুদ্ধে এত সহজে জয়লাভ করবার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, রাজা রাসেল রাজা দাহিরের সেনা সন্নিবেশ ও বিন্যস্তকরণের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে তাঁকে পূর্বাহ্নেই অবহিত করেছিলেন। আরব ফৌজ তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত ছিল। অবশ্য যুদ্ধে শত্রুর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়াও খুবই জরুরী।

রাজা জয়সিংহ পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ আলোর গিয়ে দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দেন। সেখানে রাজা দাহিরের স্ত্রী রাণী বাঈ,—যিনি রাজার আপন বোনও ছিলেন, পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিলেন।

অগ্রাভিযান

মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হতেই রাজা জয়সিংহ শহর রক্ষার ভার স্বীয় ভ্রাতা রাজা গোপীকে সোপর্দ করে নিজে বাহমনাবাদ গমন করেন। রাজা গোপীও জয়সিংহের যাবার পর বেশীক্ষণ শহরে অবস্থান করেন নি। তিনি দহলীলার দুর্গে গিয়ে দুর্গদ্বার বন্ধ করে দেন।

বাহমনাবাদের উপর হামলা

মুহাম্মদ বিন কাসিম তৎক্ষণাৎ বাহমনাবাদের দিকে অভিযাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে দহলীলা ও বাহরোর-এর দুর্গও জয় করে নেন। রাজা গোপী এখান থেকে কাথিওয়াড়ের দিকে পালিয়ে যান। বাহমনাবাদে বিশেষ কোন যুদ্ধ হয়নি।

স্কালিন্দার অভিমুখে অগ্রাভিযান

মুহাম্মদ বিন কাসিম অতঃপর বাবিয়া জয় করেন। এটি শতদ্রু নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার রাজা কক্ক মুহাম্মদ বিন কাসিমের

www.almodina.com

খুবই বিশ্বস্ত সহযোগী প্রমাণিত হন। বাবিয়া থেকে মুহাম্মদ বিন কাসিম স্কালিন্দার দিকে অগ্রসর হন। এ শহরও তিনি খুব সহজেই জয় করেন।

মুলতানের দিকে অগ্রাভিযান এবং মুলতান বিজয়

স্কালিন্দা থেকে মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতানের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে পড়ে সিক্কা দুর্গ; দুর্গাধিপতি ছিলেন রাজা বজ্রের দৌহিত্র। তিনি প্রথমে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মুকাবিলা করেন। অতঃপর দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ হয়েও বীরত্বের সঙ্গে লড়ে যান। সতের দিনের ভীষণ যুদ্ধের পর শেষাবধি তিনি অস্ত্র সমর্পণ করেন। এই রাজা খুবই সাহসিকতা এবং কার্যকর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে লড়াই চালালেও মুহাম্মদ বিন কাসিমের কয়েক গুণ ফৌজের মুকাবিলা করতে পারেন নি। তিনি পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করেন এবং আশেপাশের এলাকাকে এমনভাবে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেন যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বীয় ফৌজের রসদ-সামগ্রীর জন্য ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হন। হিন্দী ফৌজ বেশীর ভাগ ধন-সম্পদ মুলতান দুর্গে নিয়ে গিয়েছিল।

মুলতানের শাসনকর্তাও নিজেকে দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্গ অবিজিতই থেকে যায়। এদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম রসদ-সম্ভারের ঘাটতির কারণে দারুণ অসুবিধায় পড়েন। দুর্গ-প্রাচীরে মিনজানীক নিক্ষেপ করা হয়। দুবাবা এবং কাবশও ছোড়া হয়, কিন্তু দুর্গ-প্রাচীরের দৃঢ়তার মুখে সবকিছু হার মানে।

শেষাবধি রাজা কক্ক নিরাপত্তা প্রার্থনার জন্য আগত মন্দিরের পূজারীদের নিকট থেকে জেনে নেন—মুলতান শহরের প্রয়োজনীয় পানি কোথা থেকে আসে। যদি পানির সে নহর বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে লোকে পানীয় জলের অভাবে বাধ্য হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আনুগত্য স্বীকার করে নেবে। মুহাম্মদ বিন কাসিম শহরের পানি বন্ধ করে দেন এবং পরিণতিতে শহরের অধিবাসীরা আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

এখানে একটি মজার ঘটনা পাঠক সমীপে পেশ করা যেতে পারে। মুলতানের বিখ্যাত মন্দিরের যেসব পূজারী পানির নহরের

www.almodina.com

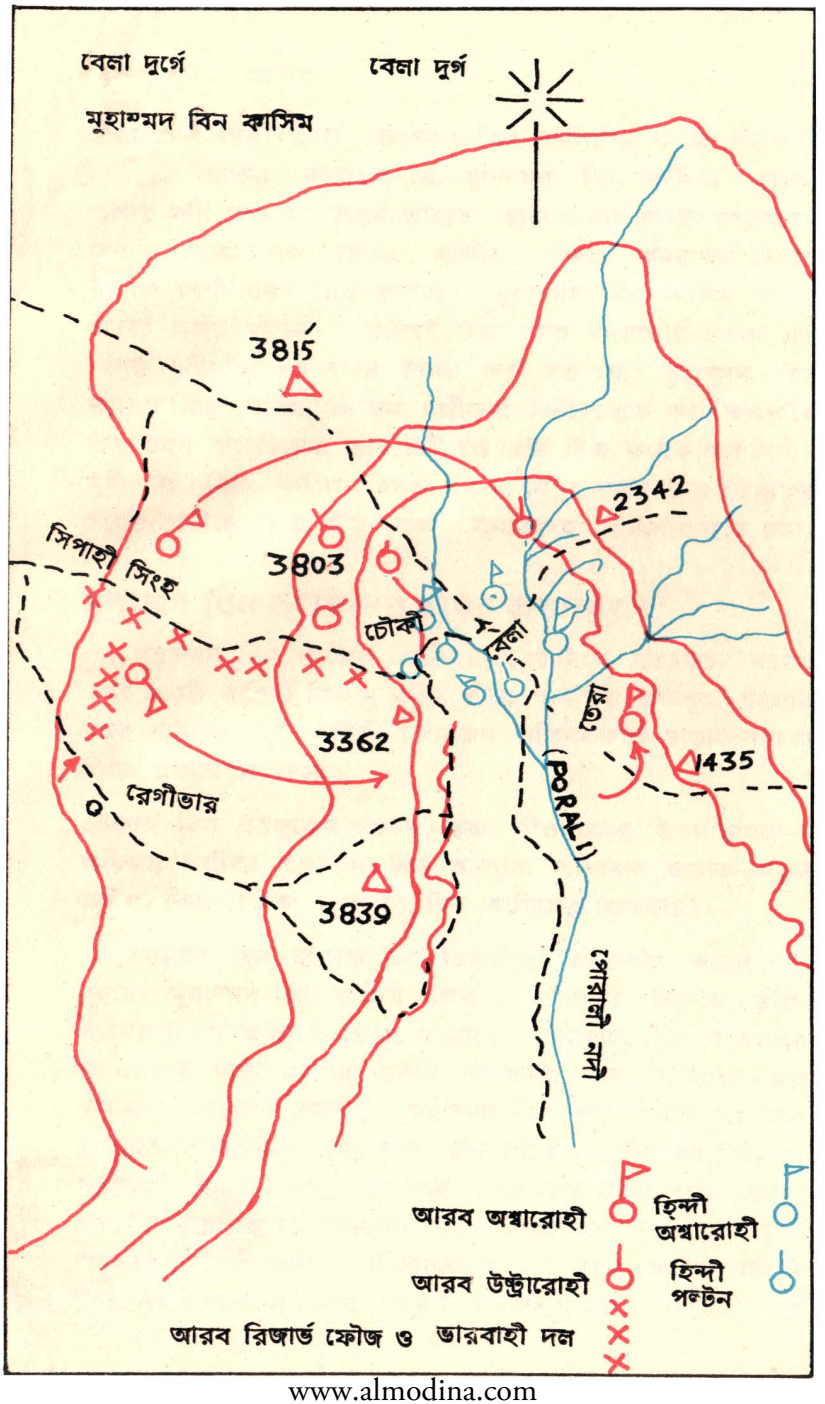

www.almodina.com

সন্ধান দিয়েছিল তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে এই শর্তে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছিল যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম তাদের মন্দির যদি স্পর্শ না করেন তাহলে তারা এমন একটি গুপ্তধনের সন্ধান দেবে, যার ভেতর মন্দিরে সঞ্চিত ধনরত্নের চেয়েও অনেক বেশী ধন-দৌলত রয়েছে। মুহাম্মদ বিন কাসিম তাদের এ শর্ত মঞ্জুর করেন। প্রকৃতই উক্ত গুপ্ত ধনভাণ্ডার থেকে এত বিপুল পরিমাণে ধন-সম্পদ উদ্ধার করা হয় যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু অভিযানের জন্য খলীফার নিকট থেকে কর্জ স্বরূপ যে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন, তার চাইতেও এটা ছিল কয়েক গুণ বেশী। মুহাম্মদ বিন কাসিম এসব ধন-সম্পদ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে স্বীয় কর্জ মুনাফাসহ পরিশোধ করে দেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের রাওর প্রত্যাবর্তন

মুহাম্মদ বিন কাসিম এবার রাওরের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং একটি বাহিনী ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত ব্রহ্মপুর শহরের দিকে পাঠান। এই বাহিনী কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সাফল্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ওফাত এবং ভীলম্যানের উপর হামলা—অধিকন্তু খলীফা ওয়ালীদ বিন 'আবদুল মালিকের ওফাত—নতুন খলীফা নির্বাচন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের গ্রেফতারী।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৯৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ঐ বছরেই মুহাম্মদ বিন কাসিম গুজর ও ভীলদের বিরুদ্ধে ভীল-ম্যানের দিকে অভিযান প্রেরণ করেন। ভীলম্যান সিন্ধু সীমান্তের কাথিওয়াড় রাজ্য সংলগ্ন একটি রাজধানী, যার সিংহাসন ছিল কুষাজ-এ (বর্তমান জয়পুর)। মুহাম্মদ বিন কাসিম এটা জয় করে প্রত্যাবর্তন করছিলেন—এমন সময় তিনি খলীফা ওয়ালীদ বিন 'আবদুল মালিকের ইনতিকালের খবর পান। খলীফার ইনতিকাল হয়েছিল ৯৬ হিজরীর জুমাদিউছ-ছানী মাসে। তদস্থলে সুলায়মান বিন 'আবদুল মালিক খলীফা নির্বাচিত হন। নতুন খলীফা য়াযীদ বিন মুহাল্লাবকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং সেই সঙ্গে

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিমকে গ্রেফতার করবার নির্দেশ দেন। সুলায়মান কুতায়বা বিন মুসলিমকেও হত্যা করেন।

মূসা বিন নুসায়র

সুলায়মানের ক্রোধ-বহ্নির হাত থেকে স্পেন বিজয়ী মূসা বিন নুসায়রও শেষরক্ষা পান নি। মূসার পুত্র 'আবদুল 'আযীযকেও সুলায়মানের নির্দেশে হত্যা করা হয়। এভাবে অল্প দিনের মধ্যেই ইসলামী দুনিয়া কয়েকজন বিখ্যাত বীর ও বিজয়ী সেনানায়ক এবং যোগ্যতম প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ সেনাপতির খিদমত থেকে বঞ্চিত হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের গ্রেফতারী

মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর গ্রেফতারীর নির্দেশনামা অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে শোনেন এবং নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেনঃ

"লোকেরা আমাকে বিনষ্ট করে দিল। কোন্ যুবককে তারা বিনষ্ট করল? তাকেই, যে তাদের সংকট মুহূর্তে ও বিপদকালে কাজে এসেছিল এবং সীমান্তকে সুদৃঢ় ও অক্ষুণ্ণ রাখতে যে ছিল খুবই উপযোগী।"

www.almodina.com

সংক্ষিপ্তসার

প্রতিরক্ষামূলক শিক্ষা, উত্থাপিত অভিযোগসমূহ এবং এর জওয়াব

এখানে সর্বাগ্রে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এটি কি চাচা (হাজ্জাজ) এবং ভাতিজা (মুহাম্মদ বিন কাসিমের) একক সিদ্ধান্ত (فجور) ছিল না যে, এত বড় মহারাজার বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন? যার ফৌজ সর্বতোভাবে অস্ত্রসজ্জিত ছিল, যার রাজ্য ছিল খুবই সম্পদশালী, আর তাঁর রাজধানীর মুহাফিজ ও তত্ত্বাবধায়ক ছিল মযবুত দুর্গ; আর মুসলিম বাহিনী এসেছিল তাদের স্বদেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে যেখানে সাহায্য ও রসদ-সম্ভার পৌঁছানো ছিল এক দুরূহ ব্যাপার।

এ প্রশ্নের জওয়াবে আমরা মশহূর প্রতিরক্ষা পর্যালোচক লীড্‌ল হার্ট-এর গ্রন্থ থেকে তাঁর মতামত উদ্ধৃত করছি।

"এসব সত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে একটি তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে যে, ফৌজের বিরাটত্ব কিংবা দামী ও মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র প্রকৃত-পক্ষে ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতখানি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে থাকেন এগুলোকে হুকুমতের আমীর উমারা ও জেনারেলগণ। অর্থাৎ এসব লোক তাদের প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের শক্তির পরিমাপ ফৌজের সংখ্যা দিয়ে নির্ধারণ করে থাকেন। তথাপি এটাও স্বাভাবিক ব্যাপার যে, জন-সাধারণ ঐ সব নেতারই মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একই সুরে কথা বলে থাকে। কারণ সংখ্যা শক্তির ভিত্তিতে শক্তির পরিমাপ করা খুবই সহজ, কিন্তু সেনাবাহিনীর যোগ্যতার পরিমাপ করা তত সহজ নয়। এ সংখ্যার ভিত্তিতেই সরকার জনসাধারণকে প্রভাবিত করে ফৌজের সংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্য রাযী করিয়ে নেয় এবং এভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে সর্বপ্রকার ট্যাক্সের বর্ধিত হার নির্বিবাদে আদায় করে থাকে।

www.almodina.com

"বস্তুতপক্ষে কোন দেশের প্রতিরক্ষাগত সঠিক ভারসাম্য নির্ভর করে তার ফৌজের যোগ্যতার উপর এবং এই যোগ্যতা ফৌজের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, তার চলাচল ও গতিবিধি, সহ্য ক্ষমতা, একাগ্রতা, শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের মত কয়েকটি জটিল বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। ফৌজের অধিনায়ক যদি উপযুক্ত যোগ্যতার অধিকারী না হন তাহলে ফৌজ হবে সেই রেলগাড়ীর মত, যার ইঞ্জিন বেকার ও অথর্ব।"

আমরা যখন উপরিউক্ত বর্ণনার সঙ্গে মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্পর্কিত ঘটনাবলীর তুলনা করি তখন মূল বিষয়টি বুঝে নিতে আর কোন অসুবিধা হয় না।

আমরা যদি রসূল করীম (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশলের দিকে মনোনিবেশ করি তাহলে আমাদের এ সিদ্ধান্ত আরও নির্ভুল বলে মনে হয়। আর রসূল (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশলের ঘটনাবলী লীডল হার্ট-এর গ্রন্থ রচনার আগেই সংঘটিত হয়েছিল।

সমরনীতিতে মুহাম্মদ বিন কাসিম আঁ-হযরত (সা)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন। তিনি মুজাহিদবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মনোবল-সম্পন্ন, নির্ভীক এবং একদেহ একপ্রাণে পরিণত করেন। তিনি তাদের মধ্যে খুদী তথা ব্যক্তিত্বের অনুভূতি জাগ্রত করেন। জিহাদী প্রেরণা সৃষ্টি করে তাদেরকে ঐকান্তিক কুরবানীর জন্য তৈরী করেন। আঁ-হযরত (সা) বদরে যুদ্ধের পূর্বে স্বীয় ফৌজকে এমনিভাবেই সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল করে তুলেছিলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ জেনারেল ও উন্নতমানের রাজনীতিবিদের মত ভাবী ঘটনাবলী, তার ফলাফল ও পরিণতি সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি তাড়াহুড়ার আশ্রয় যেমন গ্রহণ করেন নি, তেমনি অহ্‌মিকাবোধ কিংবা গর্বের শিকারও হননি। এটাই একমাত্র কারণ যে, আবেগের বশবর্তী হয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম তাৎক্ষণিকভাবে আক্রমণ ও পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে সিন্ধুর রাজধানীর দিকে অগ্রসর হননি; বরং তিনি ছয় মাস শীরায-এ অবস্থান করে প্রথমে নিজের ফৌজকে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত করে গড়ে তুলেন। তিনি প্রতিটি বিজয়ের পর প্রতিটি বিষয়ের পরিমাপ এবং তুলনামূলক বিচার-বিবেচনা করে তবে সম্মুখে অগ্রসর হন।

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিমের হামলার ব্যাপারে দ্বিতীয় আপত্তি

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম মাকরানের কুযপুর অর্থাৎ পাঞ্জগোর শহর জয় করলেন তখন কেন বুদ্ধিয়া, তুরান এবং সুস্তান জয় করবার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হলেন না। অধিকন্তু এটা কি তাঁর নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল না যে, কয়েদী-দের যথাসত্বর মুক্তি দিতেন এবং রাজা দাহিরকে তার কৃতকার্যের শাস্তি প্রদান করতেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর গৃহীত কর্মপন্থা সঠিক ছিল

যদিও এসব প্রশ্ন বিবেচনাযোগ্য, তবে এগুলোর জওয়াব দেবার পূর্বে মূল ঘটনাবলীকে প্রতিরক্ষা, রাষ্ট্রনীতি এবং সমরশাস্ত্রের মূলনীতির উপর পরখ করে দেখাই সমীচীন হবে। সিন্ধু অভিযানে রওয়ানা হবার পূর্বে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ঐ সব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, যা হযরত ওমর এবং হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফত আমলে উক্ত দেশে জিহাদ পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। অতএব প্রাথমিক যুগে যে সমস্ত কারণে মুসলমানদের পরাজয় ঘটেছিল—মুহাম্মদ বিন কাসিম সে সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। আর এ কারণেই তিনি পাঞ্জগোর অবস্থান করে গুপ্তচরের মাধ্যমে বেলা ও দেবল পর্যন্ত মধ্যবর্তী এলাকার রাস্তা, পাহাড় পর্বত ইত্যাদির অবস্থা যথাযথভাবে এবং পরিপূর্ণরূপে জেনে নিয়েছিলেন। পাঞ্জগোর থেকে বেলা প্রায় দু'শ মাইল দূরত্বে অবস্থিত, যদিও এ দূরত্ব সোজাসুজিভাবে ১৫০ মাইলের বেশী হবে না। কিন্তু পানীয় জলের অভাব ছিল সর্বত্র এবং জঙ্গলের কারণে রাস্তা ছিল দুরতিক্রম্য। অতএব প্রতিরক্ষা নীতির দৃষ্টিতে অপরিহার্য ছিল যুদ্ধের পূর্বে সে দেশের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হওয়া। আঁ-হযরত (সা) বদর যুদ্ধের পূর্বে কয়েকবারই বদরের রণক্ষেত্র খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেছিলেন।

আজকালকার প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক কিংবা জেনারেল হয় নিজে স্বয়ং বিমানে আরোহণ করে যুদ্ধ এলাকা পর্যবেক্ষণ করেন অথবা তাঁর জন্য বিমান থেকে সমস্ত এলাকার ছবি তুলে একটি বিরাট মানচিত্র

www.almodina.com

তৈরী করা হয় এবং চিত্রপটে অভিজ্ঞ ব্যক্তি জেনারেলের জন্য খুবই বিস্তৃত রিপোর্ট তৈরী করেন, যাতে করে তিনি পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, নদী-নালা, রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, মাঠ-ময়দান প্রভৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য লাভ করতে পারেন। এই রিপোর্ট পাঠ করেই মান-চিত্রের সাহায্যে জেনারেল তার প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর এবং নির্ভীক অশ্বারোহী ছিল, যাদের মাধ্যমে তিনি ঐসব এলাকার চড়াই-উৎরাই এবং অন্যান্য বাধা-বিপত্তি সব জেনে নেন। এক্ষেত্রে তিনি স্থানীয় পথ-প্রদর্শকদেরও কাজে লাগান। নেপোলিয়নের উক্তি ঃ "যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের জন্য সময়-জ্ঞান একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। আমার সাফল্যের অন্যতম বিরাট রহস্য এই যে, আমি সব সময় ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষা করেছি। আর এমনটি করা খুব সহজ কাজ নয়। কেননা এর জন্য চাই ইস্পাত-কঠিন হৃদয়।"

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সামনে ছিল দু'শ মাইলেরও অধিক অত্যন্ত বিপজ্জনক জঙ্গল। এসব জঙ্গলের বাসিন্দারা ছিল মুসলিম ফৌজের জানের দুশমন। তাদের কাছে বিরাট এবং উন্নত মানের অস্ত্রধারী ফৌজ ছিল। এমতাবস্থায় তাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে নিক্ষেপ করাটাই ছিল যুক্তিযুক্ত, যাতে করে মুসলিম ফৌজ বেলা পর্যন্ত আকস্মিকভাবে পৌঁছে যেতে পারে। ঘটনা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, শত্রু সে সময় কিছুই করেনি। এমতাবস্থায় মুসলিম ফৌজ বেলার আশেপাশে পৌঁছে যায়। আরমান ও বেলা বিজিত হয় এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম ২৫ হাজারের মত শত্রু সৈন্যকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেন। এর পর তিনি আহত শত্রুর দেখাশোনা ও সেবাযত্ন করেন। কেবল সাধারণ সৈনিকদেরই নয়—বরং তাদের সেনাপতিকেও তিনি সসম্মানে মুক্তি দেন; শত্রু ফৌজের সমরাস্ত্র ও রসদ-সম্ভার হস্তগত করাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, মুহাম্মদ বিন কাসিম সে যুগের স্থানীয় প্রচলিত যুদ্ধনীতি কেন অনুসরণ করেন নি, অর্থাৎ আহত ও অন্যান্য যুদ্ধবন্দীকে কেন হত্যা কিংবা গোলামে পরিণত করেন নি ? তাঁর এই কোমল আচরণ কি তাঁর দুর্বলতার পরিচায়ক নয় ?

www.almodina.com

একথা নিশ্চিত সত্য যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের এই সহানুভূতিপূর্ণ ও উদার ব্যবহার তাঁর শত্রুকেও বিস্ময়ের মাঝে নিক্ষেপ করেছিল। ব্রাহ্মণদের কাছে যারা ছিল অস্পৃশ্য ও নিচু জাতির লোক বলে পরিচিত, তারা মুসলমানদের নিকট মানবেতর এবং নিকৃষ্টতম ব্যবহার পাবারই ধারণা করেছিল। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, সব কিছুই তাদের প্রত্যাশার বিপরীতে সংঘটিত হচ্ছে। ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত তাদের চেয়ে হেয়তর জাতির লোকদের খেদমত করাটাকে তাদের মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করত। কিন্তু মুসলিম মুজাহিদবৃন্দ আহত যুদ্ধবন্দীদের নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র দেহমন দিয়ে খেদমত করে। সিন্ধুর অধিবাসীবৃন্দ ঐদিন ইসলামী সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নমুনা প্রথম বারের মত দেখতে পায়। তারা মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুর প্রতি নিঃশংক চিত্ত ও ভয়-ভীতিহীন দেখতে পায়, আর যুদ্ধের পর দেখতে পায় একে অন্যের সর্বোত্তম সহমর্মী ও বন্ধু হিসাবে। তাদের (মুসলমানদের) মধ্যে না জাতিগত ভেদাভেদ ছিল, না ছিল জাঁক-জমক ও অহংকারের সামান্যতম চিহ্ন। এটি ছিল প্রথম কার্যকর আঘাত, যা মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরের হুকুমতের উপর হেনেছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম যদি যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলামে পরিণত করতেন এবং তাদেরকে ইরাকে পাঠিয়ে দিতেন তাহলে তাদের দেখা-শোনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য ফৌজের কিছু অংশকে ব্যস্ত রাখতে হ'ত। ফলে তাঁর ছোট ফৌজ স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ত। আর যুদ্ধবন্দীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইরাক যেতে হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। বন্দীরা মুসলিম ফৌজের দ্রুত চলাচলে সেই ভারী লৌহ জিঞ্জীরের ভূমিকা পালন করত, যা পা জড়িয়ে থাকে। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ বিন কাসিম অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও কৌশলের সাথে কর্ম সম্পাদন করে একদিকে নিজের ফৌজের শক্তি বহাল রাখেন এবং অন্যদিকে শত্রুর অন্তরও জয় করেন।

বেলা যুদ্ধক্ষেত্রে মুহাম্মদ বিন কাসিম আঁ-হযরত (সা)-এর ন্যায় স্বীয় দুশমনকে ভীত-চকিত করে এতটা সন্ত্রস্ত ও হত-বিহ্বল করে দেন যে, তারা তাঁরই (মুহাম্মদ বিন কাসিমের) প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা মুতাবিক চলতে থাকে। এখানে বদর, উহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া প্রভৃতি যুদ্ধের কথা ধরা যেতে পারে। আঁ-হযরত (সা) প্রত্যেক বারই এমন

www.almodina.com

প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করেন যে, তাতে শত্রুর প্রতিরক্ষা বেকার হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বদর যুদ্ধে কুরায়শ আঁ-হযরত (সা)-এরই নির্বাচিত যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করায় তাদের অশ্বারোহী কোম্পানী —যার অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ, একেবারে অথর্ব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। খন্দক যুদ্ধেও খালিদ বাজিতে হেরে যান এবং হুদায়বিয়া প্রান্তরেও পরাজয় যখন অবধারিত তখন তিনি আঁ-হযরত (সা)-এর পদ চুম্বন করেন এবং মুসলমান হয়ে যান। সেই হযরত খালিদ (রা) মুসলমান হবার পর কোন যুদ্ধেই আর কখনও পরাজিত হননি এবং দুনিয়ার প্রবল পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য তাঁর হাতেই বিধ্বস্ত হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিম হিন্দী সেনাপতিকে তাঁরই নির্মিত ফাঁদে ফেলে বাঁদর নাচ নাচান। অতঃপর তাকে স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা মাফিক একটি জায়গায় টেনে এনে তার উপর এমনই কার্যকর আঘাত হানেন যে, গোটা হিন্দী বাহিনী বিধ্বস্ত ও বরবাদ হয়ে যায়।

কিন্তু এই ধ্বংসের পর তিনি ইসলামের সহিষ্ণুতা, উদারতা, সমবেদনা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি গুণের মলম লাগিয়ে সিন্ধুবাসীদেরকে তার প্রেমানুরাগীতে পরিণত করেন। তিনি সামরিক ও রাজনৈতিক দু'টো বিজয় একই সঙ্গে লাভ করেন। রাজার বড় বড় জেনারেল মুকা, রাসেল প্রমুখ মুহাম্মদ বিন কাসিমের অনুগত ভৃত্যে পরিণত হন।

এ ধরনের যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক লীড্‌ল হার্ট লিখেছেন ঃ

"অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, কেবলমাত্র আক্রমণের দ্বারা শত্রুর উপর জয় ও সাফল্য লাভ সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা নীতি নয়; বরং শত্রুর উপর সাফল্য লাভ করবার জন্য কয়েকটি পন্থাই ব্যবহার করা যায়। অবশ্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সে সব পন্থার ভেতর থেকে উপযোগী পন্থা ইখতিয়ার করাই সিপাহ্‌সালারের কর্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, শত্রুকে ধোঁকা দিয়ে তার পৌঁছুবার পূর্বেই নির্দিষ্ট মোর্চা কবজা করে নিতে হবে [এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, বদর যুদ্ধের মোর্চা— যা আঁ-হযরত (সা) কবজা করেছিলেন—গ্রন্থকার]। আর শত্রু যদি মযবুত ও সুদৃঢ় মোর্চার অধিকারী হয় তাহলে কোন-না-কোন চালে

www.almodina.com

ও কৌশলে তাকে উক্ত মোর্চা পরিত্যাগে বাধ্য করতে হবে [উদাহরণত, মুহাম্মদ বিন কাসিম উপকূলের দিকে অগ্রসর হবার ভান করে হিন্দী সেনাপতিকে স্বীয় প্রতিরক্ষা চালে বন্দী করেন এবং তাকে কেল্লা পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেন—গ্রন্থকার]। অথবা শত্রু ফৌজের উপর এমন অবস্থায় হামলা করতে হবে যখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে—হয় নিজেদের ফৌজকে মার্চ করাতে অথবা নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে ব্যস্ত [এর উদাহরণ, হিন্দী সেনাপতির দুর্গ থেকে বহির্গত হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া এবং পুনরায় নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফৌজকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করে লড়াই করা। এই সুযোগেই মুহাম্মদ বিন কাসিম হিন্দী ফৌজের উপর হামলা করে তাকে ধ্বংস করে দেন।—গ্রন্থকার]। এমত অবস্থায় শত্রু ফৌজকে সক্রিয় হবার মুহূর্তেই পাকড়াও করা হয় অথবা তার এতটা সময় মেলে না যে, সে নতুন কোন মোর্চা পরিপূর্ণভাবে সুদৃঢ় করতে পারে। তাই তার উপর জয়লাভ করতে বেগ পেতে হয় না।"

যদি হিন্দী সেনাপতি স্বীয় প্রতিরক্ষা নীতির উপর স্থির মস্তিষ্কে সক্রিয় থাকতেন তাহলে খুব সম্ভব মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বীয় অভিষ্ট লক্ষ্য হাসিলে কামিয়াব হতে পারতেন না। এ ধরনের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার অত্যন্ত বিখ্যাত উদাহরণ য়ুরোপের বিখ্যাত সমর-বিশেষজ্ঞ হ্যানিবল এবং ফীব্‌স-এর মধ্যকার যুদ্ধগুলো। হ্যানিবল উপর্যুপরি জয়লাভের মাধ্যমে রোমান রাষ্ট্র এবং ইটালীয় ফৌজকে ভীষণ রকমে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন। কিন্তু ফীব্‌স উক্ত পদ্ধতিতেই লড়াই করতে থাকেন। তিনি হ্যানিবলকে এমন সুযোগ দেন নি যে, তিনি তার ফৌজের সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে লড়াই করে যাবেন। তিনি (ফীব্‌স) সাফল্যের সঙ্গে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং যখনই সুযোগ মিলত হ্যানিবলের সাহায্যকারী বাহিনী, রসদ-সম্ভার এবং রসদবাহী বাহিনীর উপর বিদ্যুত গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং সেগুলো ধ্বংস করে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। শেষাবধি ফীব্‌স যেখানে রোমক ফৌজের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে হ্যানিবলও কার্থেজীয় ফৌজকে অক্ষম ও নিষ্ক্রিয় করে ছেড়েছিলেন।

কুলবার হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে যে পর্যালোচনা করেছেন তা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

www.almodina.com

"প্রকৃত সত্য এই যে, হিটলার ভেবে দেখনে নি—এই বিশ্বযুদ্ধের হৃদপিণ্ড কোথায়, যেখানে কার্যকর ও মারাত্মক আঘাত হেনে শত্রুকে খতম করে দেওয়া যায়। হিটলার এটা মনে করেন নি যে, তাঁকে বার্লিন থেকে লণ্ডন পানে গতি ফেরাতে হবে এবং জার্মানীর জন্য মস্কোকে খতম করা লণ্ডনকে খতম করার পূর্বে অপরিহার্য নয়। ১৯৪০ ঈসায়ীতে এ যুদ্ধের সূচনা তো তিনি সঠিকভাবেই করেছিলেন। কিন্তু এরপর তিনি নেপোলিয়ানকে অনুকরণ করেন, অর্থাৎ এক্ষেত্রে দু'জন একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেন।"

লড়াই-এর সঠিক গতিমুখ দ্বারা কি বোঝায়, তা আমরা এখানে পরিষ্কার করে দিতে চাই। এ গতিমুখ প্রকৃতপক্ষে সেই গতিমুখ নয়, যেখান থেকে হামলাকারী স্বীয় ফৌজকে অগ্রসর করেছে। কেননা প্রতিরক্ষা ও সামরিক অবস্থাদির কারণে এ গতিমুখের সংজ্ঞা বারবার বদলে থাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এ গতিমুখ দ্বারা সেই দিক বোঝায় না যে দিক দিয়ে হামলাকারী ফৌজ তার রসদবাহী পশু, সমরাস্ত্র এবং বিবিধ সাহায্য-সামগ্রী নিয়ে আসে, বরং এই গতিমুখ দ্বারা সেই দিককে বোঝানো হয়, যেদিক হামলাকারীর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার দৃষ্টিতে যুদ্ধের প্রাণস্বরূপ। বর্তমান বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর অবশ্য কর্তব্য ছিল, সর্বাগ্রে ইংল্যাণ্ডকে খতম করা। এতে বৃটিশ নৌ-শক্তিও ধ্বংস হয়ে যেত। কেননা যতদিন পর্যন্ত বৃটিশ নৌবহর নিরাপদ থাকত, ইংলণ্ড তার নিজের এবং সহযোগী মিত্রশক্তির ফৌজকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে গিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে নতুন ফ্রন্ট খুলে দিতে পারত। অবস্থা ছিল হিটলারের অনুকূলে এবং তিনি ছিলেন একটি বন্য ষাড়ের মত গোলাকার আখড়ার ভেতর—যেখানে এবং যে দিকেই তিনি চাইতেন হামলা করতে পারতেন। যুদ্ধের গতিমুখ পরিবর্তন করা সম্পর্কে নেপোলিয়ান লিখেছেন ঃ

"যুদ্ধের গতিমুখ (যদি এটা জানা যায় যে, এ দিকটি ভুল) বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। এটা শুধুমাত্র একজন অত্যন্ত যোগ্য ও উপযুক্ত জেনারেলই সাফল্যের সঙ্গে করতে পারেন। আর যে জেনারেল ইচ্ছাকৃতভাবে (বাধ্য না হয়ে) গতিমুখ পরিবর্তন করেন তিনি এমন একটি বিরাট ভুল করেন যা আর শোধরানো যায় না। এমনতরো জেনারেলকে জেনারেল বলা যায় না।

www.almodina.com

"হিটলার এই গতিমুখকে বাধ্য হয়ে পরিবর্তন করেন নি, বরং তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধেও হেরে গিয়েছিলেন।"

বেলা যুদ্ধেও হিন্দী সেনাপতি বুঝেন নি তার যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি এবং তার দুশমন কি চাচ্ছে? অতএব তিনিও নিজের ফৌজকে আরব ফৌজের বিরুদ্ধে এমন অবস্থায় লড়িয়েছেন যখন তারা অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি খণ্ড আবার এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত ছিল।

দেবল বিজয়ের শিক্ষা

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য বসরা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন, অথচ দেবল ও নীরূন জয় করবার পর তিনি সুস্তান, তুরান এবং বুদ্ধিয়াতে অহেতুক সময় নষ্ট করতে থাকলেন এবং নিজ মিশনকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হলেন না। এর কারণ কি এবং তাঁর এ লড়াইয়ের প্রতিরক্ষামূলক শিক্ষাটাই বা কি?

সর্বপ্রথম যে শিক্ষাটা আমরা পাই—তা হ'ল রাজা দাহিরের সেই চিঠি যা তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে লিখেছিলেন। এর থেকে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, "শত্রুকে কখনোই খাটো করে দেখতে নেই।" এই সর্বজনজ্ঞাত উক্তির উপর রাজা দাহির আমল করেন নি। রাজা দাহির ২৫ হাযার ফৌজ বেলায় পাঠান। এ ফৌজ পরাজিত হয়। তথাপি তাঁর মস্তিষ্ক থেকে গর্ব ও ঔদ্ধত্যের ভূত নামেনি। দেবল যখন তাঁর হস্তচ্যুত হয় তখনও তিনি অবস্থা সম্পর্কে সঠিক পরিমাপ করতে ব্যর্থ হন।

দ্বিতীয় যে শিক্ষা আমরা পাই তাহ'ল এই যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম উক্ত দুর্গ জয় করবার সঠিক পরিমাপ করেই উপযোগী সমরাস্ত্র যেমন, মিনজানীক, আরূস ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তৃতীয় শিক্ষা এই যে, শত্রুর সঙ্গে কঠোর ব্যবহারের পরিবর্তে কোমল ও সদয় আচরণ এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণু ও উদার ব্যবহার এমন একটি কর্মপদ্ধতি, যা ছিল হাদীছ পাক-এর সঙ্গে

www.almodina.com

সঙ্গতিপূর্ণ। এই কর্মপদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মুহাম্মদ বিন কাসিম বৌদ্ধ ধর্মের সমস্ত অনুসারী, জাট ও মায়দদেরকে স্বীয় সমর্থক ও সহযোগীতে পরিণত করেন। এটি ছিল রাজা দাহিরের জন্য একটি বিরাট নৈতিক পরাজয়, যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সময়ের ব্যবধান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

মুহাম্মদ বিন কাসিম শুরু থেকেই রাজা দাহিরের ফৌজ, অর্থ, বিত্ত, সমরোপকরণের আধিক্য ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক পরিমাপ করে নিয়েছিলেন। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি প্রতিটি পদক্ষেপ গুণে গুণে হিসেব করে ফেলেছিলেন এবং প্রতিটি পদক্ষেপের পূর্বে পথের চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে পরিমাপ করে নিয়েছিলেন।

রাজা দাহিরের রাজধানীকে সিন্ধুনদ দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখে-ছিল। অথচ তা নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য রাজা দাহির সিন্ধুনদের কোথাও পুল ইত্যাদি নির্মাণ করেন নি।

সিন্ধুনদের পূর্ব এলাকা ছিল উর্বর এবং এ এলাকায় বড় বড় শহর আবাদ ছিল। যেহেতু এখানে হিন্দু ধর্মের অনুসারীদেরই ছিল সংখ্যাধিক্য, তাই এদের প্রতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মনের দিক দিয়ে প্রসন্ন ছিল না। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল জাট ও মায়দ প্রভৃতি, যাদেরকে রাজপুত, বিশেষ করে বর্ণ হিন্দুরা—(ব্রাহ্মণ) খুবই অবজ্ঞার চোখে দেখত।

পশ্চিম কিনারে ছিল বুদ্ধিয়ার রাজধানী, যা ছিল রাজা দাহিরের একটি করদ রাজ্য। এ এলাকার বাসিন্দারাও হয় বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, নয়ত অগ্নিপূজক ছিল। এখানে রাজপুত সৈনিক ছিল খুবই কম। আর যারা ছিল তারা রাজার আত্মীয়-স্বজনের নিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত ছিল। শাসক গোষ্ঠির লোকদেরকে রাজা দাহির গভর্নর (শাসনকর্তা) হিসাবে সুস্তান, বুদ্ধিয়া, তুরান প্রভৃতি রাজ্যে মোতায়েন করে রেখেছিলেন। যেহেতু এসব শাসক খুবই অহংকারী এবং উদ্ধত ছিলেন, সেজন্য জনসাধারণ তাদের প্রতি বেজায় অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু রাজা দাহিরের শক্তি ও প্রতিপত্তির সামনে তারা ছিল অসহায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতা ঐ সব লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল গভীরভাবে।

www.almodina.com

যদি মুহাম্মদ বিন কাসিম নীরূন থেকে সিন্ধুনদ পার হয়ে চলে যেতেন তাহলে ঃ

ক. রাজা দাহিরের সাম্রাজের পশ্চিমাংশের সহযোগী ও মিত্র রাজা এবং ঠাকুর মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর পশ্চাদ্দেশে হামলা করে বসরা ও দেবলের মধ্যবর্তী যাতায়াতের রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দিতেন।

খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সম্মুখ দিকে রাজা দাহিরের বেশুমার ফৌজের মুকাবিলা করতে হ'ত এবং পশ্চাদ্ভাগে আরব ফৌজের উপর মিত্র করদ রাজন্যবর্গের ফৌজের চাপ গিয়ে পড়ত। ফলে আরব ফৌজ দু'টি ভারী শক্তিশালী ফৌজের মাঝে দারুণ বেকায়দায় পড়ত, বিশেষ করে পরাজয়ের ক্ষেত্রে, যখন তাঁর পশ্চাদ্ভাগে সিন্ধুনদের রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত।

উপরে যে সব দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করা হ'ল---তার বিরুদ্ধে যে কেউ সেনাপতি তারিক-এর স্পেন আক্রমণের কথা বলতে পারেন। এক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, সেখানে প্রতিরক্ষার রূপ ছিল ভিন্ন। উপযোগী কোন স্থানে তারিক-এর জীবনী লিখতে গিয়ে ইনশা-আল্লাহ আমরা এতদ্সম্পর্কে আলোচনা করব।

মুহাম্মদ বিন কাসিম পশ্চিম এলাকা দখল করার পর রাজা দাহিরের ফৌজ অর্ধেকেরও কম হয়ে যায়। উপরন্তু তিনি স্বীয় ফৌজে জাট, ঠাকুর, মায়দ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক ভর্তি করা শুরু করেন। অর্থাৎ যেখানে রাজা দাহিরের ফৌজ সংখ্যার দিক দিয়ে হ্রাস পেল, সেখানে মুহাম্মদ বিন কাসিমের ফৌজ সংখ্যার দিক দিয়ে বেড়ে গেল। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ বিন কাসিম লোভী হয়ে উঠেন নি, বরং শাসন-শৃঙখলা, প্রশিক্ষণ ও বিন্যাসের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সিন্ধী লোকদের ভেতর থেকেই তিনি সর্বোত্তম লিপিকার গোয়েন্দা, গুপ্তচর, দুঃসাহসী সিপাহী, পথ-প্রদর্শক প্রভৃতি পসন্দমত বাছাই করে নেন।

এ বিষয়টি মুহাম্মদ বিন কাসিমের হৃদয়-মনে খুব ভাল করেই গাঁথা ছিল যে, আরব থেকে উট এবং উৎকৃষ্ট ঘোড়া বারবার নিয়ে আসা অসম্ভব। সিন্ধুনদের পশ্চিম এলাকায় সওয়ারীর জানোয়ার খুব বেশী সংখ্যায় পাওয়া যেত। অতএব তিনি এ এলাকা থেকে জানোয়ার সংগ্রহ করে শুধু নিজস্ব ঘাটতিই পূরণ করেন নি, দুশমনকেও এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে দেন।

www.almodina.com

এতদ্ভিন্ন এ এলাকায় আরব সৈনিকদের জন্য প্রয়োজনীয় শুষ্ক ফলমূল, বার্লি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এতে আরব সৈনিকদের বোঝা অনেকটা হ্রাস পেল এবং তারা নিজেদের দ্রুতগতি ও ক্ষিপ্রতা বজায় রাখতে সক্ষম হ'ল। নিজস্ব স্বাদ ও রুচি মাফিক যুদ্ধক্ষেত্রে আহার্য-দ্রব্য পাওয়া একটি বিরাট নেয়ামত।

রাজা দাহিরের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অদূরদর্শিতার কারণে মুহাম্মদ বিন কাসিম নির্বিঘ্নে এ এলাকা পদানত করতে অগ্রসর হন। সিন্ধু নদের উপর এমন কোন পুল ছিল না, যার সাহায্যে রাজা দাহির নিজের ফৌজ পূর্ব কিনার থেকে পশ্চিম কিনারে সত্বর স্থানান্তর করতে পারতেন। ফলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের দক্ষিণ ও পশ্চাদ্ভাগ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ছিল। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা—যা মুহাম্মদ বিন কাসিম পশ্চিম কিনার জয়ের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন, তা হ'ল রাজা দাহিরকে আলস্যের মাঝে নিক্ষেপ। রাজা দাহিরের ধারণা ছিল যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম এই এলাকায় লুটপাট করে ইরাকে ফিরে যাবেন। রাজা দাহির হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাঁর পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা ছিল ব্রাহ্মণ ও রাজপুত। তারা মনে করেছিল যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয়ের কারণে বৌদ্ধ জনগণ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিংবা এতটা কমযোর হয়ে যাবে যে, তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উপর হিন্দুরা খুব সহজেই দখল জমাতে পারবে। সম্ভবত এ জাতীয় কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার মাঝেই রাজা দাহির ডুবে গিয়েছিলেন। তাই মুহাম্মদ বিন কাসিমের মুকাবিলায় পশ্চিম কিনারে তেমন কোন ব্যবস্থাই তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নেন নি যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মদ বিন কাসিম উক্ত এলাকা পদানত করেছিলেন।

উক্ত এলাকা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ বিন কাসিম ভাবী বংশধরদের জন্য একটি নতুন ধরনের ফৌজ সৃষ্টি করেন। এটি ছিল আর্মার্ড কোর। রাজা এবং ঠাকুর মুহাম্মদ বিন কাসিমের ফৌজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন তারা আর আগের মত আলাদা আলাদা স্বায়ত্ত-শাসিত ছিল না, বরং মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রথমে তাদেরকে আঁ-হযরত (সা) বর্ণিত শাসন-শৃঙ্খলার ছাঁচে ঢেলে সাজান। অতঃপর তাদেরকে বিন্যস্ত করে স্বীয় ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, সংবেদনশীলতা, প্রেম-ভালবাসা এবং ত্যাগের মলম তিনি ছ্যাৎ-

www.almodina.com

অচ্ছুৎ এবং জাতপাতের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত লোকদের দিলের উপর লাগিয়ে দেন। এখানে সেবার অর্থ প্রতিশ্রুতির গালভরা বুলি ছিল না। মুহাম্মদ বিন কাসিম হযরত ওমর (রা)-এর প্রতিষ্ঠিত নীতির ভিত্তিতেই সৈনিক এবং তাদের পরিবার-পরিজনের মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে দেন। এই নীতির উপর পরবর্তীকালেও কম-বেশি আমল করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রচলিত রীতি-নীতি যখন মোগল শাসনামলে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়, তখন তার আঙ্গিক কাঠামোও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

অবশ্য ফ্রান্স এবং পরে বৃটিশ সরকার মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে জীবিত করেন। বৃটেন হিন্দী আর্মার্ড অশ্বারোহী বাহিনী এবং পল্টন বানিয়ে ভারতবর্ষকে মোগল এবং মারাঠাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।

লর্ড ক্লাইভ ইণ্ডিয়ান আর্মীর সংস্কার সাধন করেন। তবে অধিক-কাল ভারতবর্ষে অবস্থানের কারণে তিনি রাষ্ট্রীয় জাতপাতের রঙে রঞ্জিত হয়ে যান এবং এমন একটি ভুলের শিকার হন, যা তার সৃষ্ট ইণ্ডিয়ান আর্মীর ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। এই ধ্বংসাত্মক কাজে লর্ড কিচেনার তাকে সাহায্য করেছিলেন।

একথার দ্বারা আমরা এই বোঝাতে চাচ্ছি যে, তারা আর্মার্ড কোরের অধিনায়কত্ব হিন্দী অফিসারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বৃটিশ অফিসারদের হাতে তুলে দেন। ফলে হিন্দী অফিসার এবং বৃটিশ অফিসারদের মধ্যে অনাস্থা ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। আমি যেহেতু ফৌজে আর্মার্ড হিসাবে ভর্তি হয়েছিলাম, সেহেতু আমি ভেতর থেকে এই বিপ্লব সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাই। পেটের জন্যই হোক কিংবা পরাধীনতার কারণেই হোক—অসহায় ছিলাম আমরা। প্রকৃত সত্য এই যে, হীনমন্যতাবোধ ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে সে সময় আরও বেশী বৃদ্ধি পায়, যখন বৃটিশ অফিসাররা বলতে শুরু করেন যে, "ভারতীয়রা উন্নতমানের সৈনিক হতে পারে, কিন্তু ভাল অধিনায়ক হতে পারে না। এজন্য হিন্দুস্তানী অফিসারদেরকে ফৌজে উচ্চপদে দেওয়া যেতে পারে না।"[১] এ ধরনের কর্মপদ্ধতির যে পরিণতি ঘটেছিল,

১. বাঙালী মুসলমানদের ক্ষেত্রেও ঐ একই ভুল পাকিস্তানের সমরনায়কেরা করেছিলেন। এর পরিণতি কি হয়েছিল তাও সবারই জানা। ---অনুবাদক।

www.almodina.com

এখানে তা বলার প্রয়োজন নেই। রাজা দাহিরের ফৌজে গভর্নরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা বৌদ্ধ রাজা ও ঠাকুরদের পসন্দনীয় ছিল না। ধর্মপালনের ক্ষেত্রেও তারা পুরোপুরি স্বাধীন ছিল না। ফৌজের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিমূলকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল।

এ শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেও মুসলমানদেরকে কয়েকটি দেশের শাসন ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে এবং তা তাদের ব্যক্তিত্বে, অহংবোধে এবং জিহাদী আবেগ-স্পৃহায় কঠিন আঘাত হেনেছে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর প্রতিরক্ষা নীতি অর্থাৎ স্বীয় দক্ষিণ, বাম ও পশ্চাদ্ভাগকে শত্রুর হামলা থেকে নিরাপদ করার নীতি অনুকরণ করেন নেপোলিয়ন-যখন তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনা করেন।

জেনারেল মাড ১৯১৭ ঈসায়ীতে তুরস্কের বিরুদ্ধে উক্ত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা অনুসরণ করেন, অর্থাৎ তিনি টাইগ্রীস (দজলা) ও ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীকে স্বীয় অগ্রাভিযানরত ফৌজের মুহাফিজে পরিণত করেন। তুর্কীরা রাজা দাহিরের মতই ঐ দু'টো নদীর না পুল বানিয়েছিল, না জাহাজ চলাচলের জন্য উন্নত কোন ব্যবস্থাই উদ্ভাবন করেছিল। এর পরিণতি তাদের এভাবে ভোগ করতে হয়েছিল যে, ইরাক-ই-আরব তাদের থেকে চিরদিনের মত হাত ছাড়া হয়ে যায়। তুর্কীরাও প্রতিরক্ষা কৌশলের নীতি ভুলে গিয়ে আরবদেরকে তাদের তুলনায় হেয়তর ভেবেছিল। মজার ব্যাপার এই যে, তারপরও তারা এই আশা নিয়ে বসে ছিল যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরবরা তুর্কীদের সঙ্গী হবে, তাদের সমর্থন দেবে। কিন্তু ইংরেজরা উল্লিখিত কার্যকর কৌশলের সঙ্গে কাজ করে এবং অর্থ-বিত্ত ও প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা আরবদেরকে নিজেদের পক্ষে টেনে নেয়।

সিবী যুদ্ধের শিক্ষা

ক. সিবীর যুদ্ধে যখন সিন্ধী ফৌজের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, জনসাধারণ তাদের পেছনে নেই, তখন ব্যক্তিগত বীরত্বের ভিত্তিতে এবং আত্মোৎসর্গের প্রকাশ ঘটাবার লক্ষ্যে তারা শেষাবধি লড়ে গেলেও তাদের মনোবল কিন্তু ভেঙে যায়। এ লড়াই থেকে এটা পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাজা বজ্র তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন,

www.almodina.com

ততক্ষণ পর্যন্ত এসব লোক জোশে উদ্দীপ্ত হয়ে এবং সাহসিকতার সঙ্গে লড়েছে। কিন্তু যেই রাজা বজ্র দুর্বলতা প্রদর্শন করেছেন অমনি সিন্ধী ফৌজও উৎসাহ ও মনোবল হারিয়ে ফেলেছে।

খ. একটি সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত ফৌজ যত অল্প-সংখ্যকই হোক না কেন, সাধারণত একটি বিরাট সংখ্যক বিশৃঙ্খল ফৌজের উপর জয়লাভ করে থাকে। এ ধরনের বিশাল সেনাবাহিনী বস্তুতপক্ষে ভেড়ার পালের মত যা বিনা কারণে ভয় পেয়ে পালাতে উদ্যত হয় এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

গ. যে ফৌজ প্রতিরক্ষা নীতির আওতাধীন লড়াই করে তারা অটুট ইচ্ছাশক্তির সঙ্গেই লড়াই করে এবং তাদের অধিনায়ক শত্রুর সামনে তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এমন এক স্থানে লড়বার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন যেখানে সে দুশমনের উপর মারাত্মক ও কার্যকর আঘাত হেনে তাকে পরাজিত করতে পারে।

সিবীর যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের আল-আলামীন ফ্রন্টের যুদ্ধের সঙ্গে বেশ খানিকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। ঐ যুদ্ধে মিত্রশক্তি জেনারেল রোমেলের বিজয়ী বাহিনীকে তাদের মোর্চা পর্যন্ত অগ্রসর হবার সুযোগ দেয়। অতঃ-পর তাদের উপর এমনই পাল্টা আঘাত হানে যে, তারা হতভম্ব হয়ে যায়।

নীরুন ছাউনী

রাজা দাহির দ্বিতীয়বারের মত তাঁর দিবা নিদ্রা থেকে জেগে ওঠেন এবং কিছু ফৌজ রাজা রামচন্দ্র প্রমুখের নেতৃত্বাধীন এই উদ্দেশ্যে পাঠান যে, তারা বুদ্ধিয়া, সুস্তান এবং তুরান-এর জনসাধারণকে উস্কে দিয়ে তাদের পতাকাতলে এনে দাঁড় করাবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও তারা কয়েকটি ভুল করে বসেন। যেমন, তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাফল্যের গোপন রহস্য অনুসন্ধান করেনি কিংবা তা উপলব্ধি করবারও চেষ্টা করেনি। তাছাড়া প্রতিরক্ষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত ফৌজের অধি-নায়ক নির্বাচনও সঠিক হয়নি। কেননা এ দু'জন অধিনায়ক দুর্বলচেতা হবার কারণে—জনসাধারণের মাঝে নিজেদের মর্যাদা খুইয়ে বসেছিলেন। এছাড়া রাজা দাহিরের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাও ছিল ভুল। তাঁর

www.almodina.com

সেই পন্থাই অবলম্বন করা দরকার ছিল, যে পন্থা রাশিয়াতে স্টালিন ১৯৪০—৪৪ সালে জার্মান ফৌজের বিরুদ্ধে অবলম্বন করেছিলেন। অর্থাৎ একটি বিশাল জানবায ফৌজ গোটা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে বিজয়ী সেনাবাহিনীকে গেরিলা ধরনের যুদ্ধের মাধ্যমে এতটা পেরেশান ও বিব্রত করে তোলা উচিত ছিল, যাতে করে আরব ফৌজ সে এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এই সাফল্যের গোপন রহস্য সাধারণ গণ-মানুষের অন্তর-মানস জয় করে তাদেরকে একটি অটুট মনোবল-সম্পন্ন সশস্ত্র ফৌজে পরিণত করার মধ্যে নিহিত ছিল। রাজা দাহির এই প্রতিরক্ষা নীতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি।

যাই হোক, যে বিপদ রাজা গোপী মুহাম্মদ বিন কাসিমের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন, মুহাম্মদ বিন কাসিম অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তার মুকাবিলা করেন অর্থাৎ তিনি বিদ্যুৎ গতিতে হামলা করে সিন্ধী ফৌজকে মেরে তাড়িয়ে দেন।

নদী পার

সিন্ধু নদ পার হতে মুহাম্মদ বিন কাসিম অত্যন্ত কৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি দাহিরের ফৌজের অধিনায়কদেরকে জানতে দেন নি, শেষাবধি তিনি কোথা দিয়ে, কিভাবে এবং কখন সিন্ধুনদ পার হচ্ছেন। বারবার সে জায়গায়—যেখানে তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, শত্রু মনে করছে যে এখান দিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসি-মের ফৌজ সিন্ধুনদ পার হবে—সেখানে তিনি ছোট ছোট আরবীয় প্লাটুন দ্বারা হামলা করান, যাতে করে রাজা দাহিরের তামামতর মনোযোগ সে অংশেই কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি নিজের জন্য সেই স্থানই বাছাই করে নেন যেখান দিয়ে তিনি সাফল্যের সঙ্গে সিন্ধুনদ পার হতে সক্ষম হন।

এই প্রতিরক্ষা নীতি মিত্রবাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেন হাওয়ার অনুসরণ করেছিলেন; অর্থাৎ তিনি হিটলারকে আগাগোড়া এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দেন যে, মিত্রবাহিনী ইংলিশ চ্যানেলের (English Channel)-এর উপকূল ভাগে আক্রমণ করবে এবং উক্ত উপকূল ভাগে উপর্যুপরি তিনি কয়েকবার প্রচণ্ড আক্রমণ করেন, যাতে জার্মানদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, পাল্টা আঘাত উক্ত জায়গায়ই হবে।

www.almodina.com

কিন্তু মিত্রবাহিনী উল্লিখিত স্থানের পরিবর্তে ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে সফল হামলা পরিচালনা করে দ্বিতীয়বার য়ূরোপে প্রবেশ করে। যদি মিত্র বাহিনী এ ধরনের প্রতিরক্ষা চাল না চালত তাহলে তাদেরকে বিরাট মূল্যের কুরবানী দিতে হ'ত। অতএব প্রতিটি সিপাহসালারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে এমনভাবে অসতর্ক ও বেখবর রাখবেন, যেন সে প্রতিরোধের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম না হয়। মিত্রবাহিনী ফ্রান্সে অবতরণ করার পর হিটলার ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। জার্মান ফৌজ যদিও মিত্র বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়, কিন্তু তখন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। শেষাবধি হিটলার পরাজিত হন। এভাবেই রাজা দাহির সেনাপতি রাজা রাসেল মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু পার হওয়া সম্পর্কে যখন জানতে পারলেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। রাসেল বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেন, কিন্তু শেষাবধি পরাজয়বরণ করেন।

জয়পুর যুদ্ধের শিক্ষা

এ যুদ্ধ থেকে যে শিক্ষা পাই তা হ'ল এই যে, ছোট্ট সুশৃঙ্খল একটি দল---যার চলাচল ও গতিবিধির যোগ্যতা রয়েছে, সে যখন এই চলাচল ও গতিবিধিকে একটি উত্তম প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা মুতাবিক কার্যকর করে তখন এই ছোট্ট দলটি বড় বড় দলকেও অসহায় বানিয়ে দেয়।

এ যুদ্ধে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সামনে কোন্ লক্ষ্য কাজ করেছিল ?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম এমন পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন যেন এর সাহায্যে রাজা দাহিরকে খতম করবার সঙ্গেই তিনি তার ফৌজের উপর কার্যকর আঘাতও হানতে পারেন। অতএব সর্বপ্রথম তিনি হিন্দী রাজার প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা উপলব্ধি করবার পর তার ফৌজের বিন্যাস সম্পর্কে অবহিত হন। এর থেকে তিনি তার ফৌজী বিন্যাসের দুর্বলতা কোথায় তাও জানতে পারেন। অর্থাৎ রাজা দাহির তাঁর হাতীগুলোকে শত্রুর উপর হামলা করবার পরিবর্তে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য কিংবা সে সবকে নিজের

www.almodina.com

ব্যক্তিগত হেফাজতের জন্য মোতায়েন করেছিলেন। এসব হাতী রাজা দাহিরের ট্যাংক ফৌজের স্থলে ছিল। ফলে তিনি এর ভুল ব্যবহার করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকেও নিজের হাতী-গুলোর সামনে এনে খাড়া করেন। অথচ অশ্বারোহী বাহিনী, যার স্থান দখল করেছে বর্তমানে বিমান ও ট্যাংক বাহিনী, সে যুগেও ফৌজের মুখ্য ভূমিকা পালন করত। এ বাহিনী সিপাহসালারকে শত্রুর চলাচল ও গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করত, তার ফৌজের বিভিন্ন ব্যূহের দেখাশোনা করত এবং সুযোগ মিলতেই বিদ্যুৎ গতিতে শত্রু ফৌজের উপর আক্রমণোদ্যত হ'ত। মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বীয় অশ্বারোহী বাহিনীকে এ ধরনের দায়িত্ব সোপর্দ করেছিলেন।

জয়পুরের যুদ্ধের সঙ্গে খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ-এর ইয়ারমূক যুদ্ধ এবং আলেকজাণ্ডারের ইযবেলা যুদ্ধের সাদৃশ্য ছিল। আলেক-জাণ্ডারের ইযবেলা যুদ্ধের বিন্যাস নিম্নে প্রদর্শিত চিত্রে দেখান হ'ল ঃ

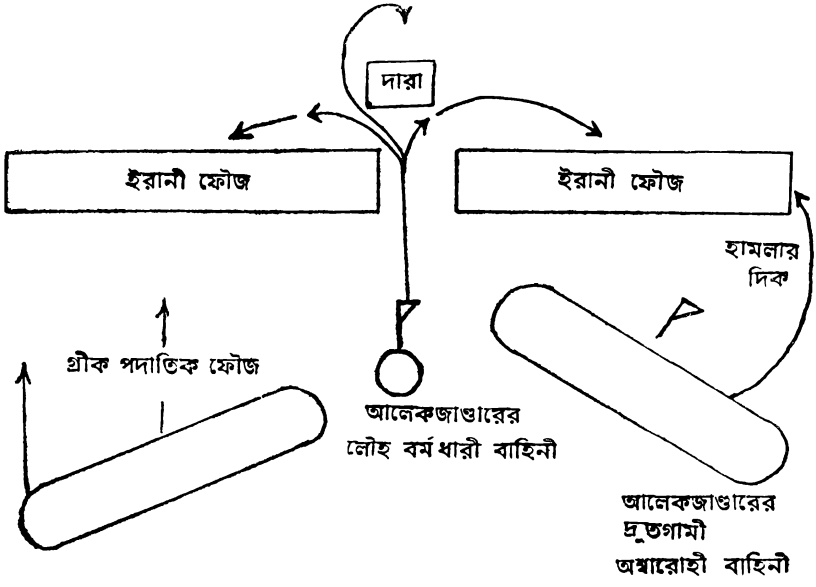

আলেকজাণ্ডার এটা জেনে নিয়েছিলেন যে, দারার সম্ভাব্য সাফল্যের রহস্য কোথায়। অতএব তিনি তাঁর সর্বোত্তম অশ্বারোহী কোম্পানী-

www.almodina.com

সহ ইরানী ফৌজের মধ্যবর্তী ফাকা স্থান থেকে দারার উপর এমন সময় অতর্কিতে হামলা করেন যখন তাঁর দ্রুতগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক ফৌজ ইরানীদের উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে তাদের সার্বিক মনোযোগ নিজেদের দিকে টেনে রেখেছিল। দারার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইরানী ফৌজ মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই গ্রীক সৈন্যের তলোয়ারের মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে চিরদিনের তরে গা এলিয়ে দেয়।

যে ভাবে দারার মৃত্যুর পর ইরানী হুকুমতের পক্ষ থেকে আলেকজাণ্ডারকে প্রতিরোধ করবার মত আর কেউ ছিল না, তেমনি জয়পুর সমরক্ষেত্রে রাজা দাহিরের মৃত্যুর পর আরব বাহিনীর সাথে সিন্ধী বাহিনীর যে সব লড়াই অথবা মুকাবিলা হয়েছে সে সবের তেমন কোন গুরুত্বই আর রইল না। মুহাম্মদ বিন কাসিম একটি কার্যকর আঘাতেই রাজা দাহিরের হুকুমত খতম করে দেন।

এতদসত্ত্বেও মুহাম্মদ বিন কাসিম একটি বিষয়ে লক্ষ্য রেখেছিলেন, যদিও রাজা দাহির মারা গেছেন, কিন্তু তার সাম্রাজ্যের রাজধানী আরোর এখনও তাঁর নিয়ন্ত্রণে আসেনি। অতএব তিনি জয়চান্দ এবং রাজা গোপীর পশ্চাদ্ধাবনের পরিবর্তে আরোর জয়ের স্থির সিদ্ধান্ত নেন। অনন্তর তিনি বিদ্যুৎ গতিতে তার দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং সত্বরই তা জয় করে সিন্ধু সাম্রাজ্যের বিজয়ী অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত হন। বাহমনাবাদ, স্কালিন্দা, সিককা, মুলতান নিজের থেকেই পাকা ফলটির মত তাঁর বিজয়ী আঁচলে পতিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাংশ সম্পর্কে জেনারেল ফুলার নামক বৃটিশ প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক এবং ইঙ্গারসোল (Ingersole) নামক আমেরিকান বিশেষজ্ঞ জেনারেল আইজেন হাওয়ারের নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর বিরোধিতা করেন অর্থাৎ আইজেন হাওয়ার তাঁর এক সরকারী রিপোর্টে লিখেছিলেন ঃ

'বার্লিন সম্পর্কে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, এখন এটা আর খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা শহর নয়। আমার দৃষ্টিতে প্রতিরক্ষাগত প্রয়োজনগুলোর রাজনৈতিক চাহিদার উপরই অধিক গুরুত্ব

www.almodina.com

ছিল। যেখানে আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি জার্মান রাজধানীর উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে চাচ্ছিল—সেখানে আমার প্রতিরক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে, শত্রু শক্তি যখন মরণ-দশায় ধুকছে তখন তাকে আগে-ভাগে খতম করে দেওয়াই ভাল। কেননা আমি আমার সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত ও বিরান বার্লিনের উপর ব্যয় করার পরিবর্তে তা শত্রু-শক্তির উপর ব্যয় করবার পক্ষপাতী ছিলাম।"

জেনারেল ফুলার (Fuller) এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন ঃ

"যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিরক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর শত্রুর সেই অবস্থার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার না থাকে যাকে মরণ দশায় আখ্যায়িত করা যায় তাহলে তা আর কখন হবে? আর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিরক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গি এই পরিস্থিতিতেও যদি গুরুত্ব না দেয় তাহলে যুদ্ধ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মানিয়ে নেবার কি একটি মেশিন মাত্র নয়?"

জেনারেল আইজেন হাওয়ার-এর ভুলের মাশুল দিচ্ছে আজ গোটা দুনিয়া। এক্ষেত্রে জেনারেল ফুলারের অভিমতের যথার্থতার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

যদি মুহাম্মদ বিন কাসিমও শত্রুর শক্তি ধ্বংস করবার জন্য বাহমনাবাদের দিকে ধাওয়া করতেন তাহলে খুবই আশংকা ছিল যে, হিন্দু রাজন্যবর্গ সাহায্যকারী সেনা পাঠিয়ে এবং আরোরকে নিজেদের আশ্রয়কেন্দ্র বানিয়ে কঠোর প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন। আরোর ছিল একটি উপদ্বীপে অবস্থিত। এটি জয় করবার জন্য খুবই জটিল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হ'ত। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন ক্ষিপ্রতা হিন্দুদেরকে সুযোগ দেয়নি যে, তারা মায়দ-এর পুল ধ্বংস করে দেবে। এই পুলের মাধ্যমেই মুহাম্মদ বিন কাসিম আরোরের উপর চড়াও হতে পেরেছিলেন।

যদি জেনারেল আইজেন হাওয়ার বার্লিন দখল করতেন তাহলে আজ বার্লিন দু'অংশে বিভক্ত হ'ত না এবং বার্লিন নিয়ে আজকের এই জটিল ও সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিরও উদ্ভব ঘটত না।

শক্তি ও বিজ্ঞান

মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রতিটি ক্ষেত্রেই উপযুক্ত পন্থার মাধ্যমে শক্তির পরিবর্তে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার (অর্থাৎ বিজ্ঞানের) ব্যবহার

www.almodina.com

করতেন। যেখানে রাজা দাহির স্বীয় হস্তীযুথ নিয়ে গর্বিত ছিলেন সেখানে হস্তীযুথের ধ্বংস সাধনের জন্য মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সওয়ারদের ক্ষিপ্রগতি এবং উন্নত ধরনের তীরন্দাযীর সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি রাজা দাহিরের হস্তীযুথের উপর কেরোসিন তৈলে সিক্ত তুলার জ্বলন্ত পিণ্ড তীরের সাহায্যে নিক্ষেপ করেন। হাতী কেবল আগুনকেই ভয় পায়, আর মুহাম্মদ বিন কাসিম হাতীর এই দুর্বলতাকে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেন।

আমরা তৈলসিক্ত জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ব্যবহারের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করছি। তৈলসিক্ত অগ্নিপিণ্ডের গোপন রহস্য যতদিন পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের নিকট সুরক্ষিত ছিল ততদিন দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদের মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারে নি। জয়পুর যুদ্ধের অবস্থা আমরা লিখেছি। এখন আমরা ফরাসী ঐতিহাসিক ও প্রখ্যাত লেখক ডি. জায়েন ওয়েল-এর পর্যবেক্ষণ পেশ করছি। তিনি ১২২৪ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্রাট সেন্ট লুই-এর সঙ্গী ছিলেন। লুই ছিলেন য়ুরোপীয় ক্রুসেড নাইট বাহিনীর অধিনায়ক যিনি সপ্তম কুসেড যুদ্ধে গোটা মুসলিম বিশ্বের উপর ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। এই ক্রুসেড বাহিনী ১২৪৮ খৃস্টাব্দে ফ্রান্স ভূখণ্ড থেকে রওয়ানা হয় এবং ১২৪৯ খৃস্টাব্দের জুন মাসে মিসরে গিয়ে পৌঁছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মিসরকে (যা ইসলামী হুকুমতের মধ্যে বিশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিল) খতম করে বায়তুল-মুকাদ্দাসকে পুনরায় অধিকার করা। এ যুদ্ধ মনসূরা নামক স্থানে সংঘটিত হয়।

ফ্রান্স সম্রাজ্ঞীর অনুরোধে ডি. জয়েন ওয়েল উক্ত ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি খুব সহজ সরল ভাষায়, উপদেশপূর্ণ ভঙ্গীতে এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গেই উক্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। আমরা তা থেকে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু ঘটনা আমাদের মতের সমর্থনে উদ্ধৃত করছি। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য তৈলসিক্ত জ্বলন্ত তীর ব্যবহারের প্রকৃতি ও বাস্তবতা তুলে ধরা, যাকে উক্ত লেখক 'গ্রীক-অগ্নি' নামে অভিহিত করেছেন। এর আবিষ্কারক যে মুসলমান তা তিনি স্বীকার করেন নি। আরবরা যখন তাদের মিনজানীকের সাহায্যে উক্ত

www.almodina.com

আগুনকে ক্রুসেডার বাহিনীর কাষ্ঠ নির্মিত মিনারের উপর, যাকে দুবাবা কিংবা কাবৃশ বলাই সঙ্গত—প্রথমবার আকস্মিকভাবে নিক্ষেপ করল এবং সেটিকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিল—তখন উক্ত লেখক সে সম্পর্কে এভাবে লিখেছেন (এটি ছিল সেই যুগ যখন বিরাট সংখ্যক ক্রুসেডার বাহিনী মিসরীয় ফৌজকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল) ঃ

"এক রাত্রে আমরা আমাদের মিনারায় (Tower) বসে শত্রুর আনাগোনা ও যাতায়াত পথের প্রতি নজর রাখছিলাম। এমন সময় আরবদেরকে একটি ইঞ্জিন (মিনজানীক) চালু করতে দেখলাম, যার সাহায্যে তারা চক্রাকারে গ্রীক অগ্নি-গোলক আমাদের উপর নিক্ষেপ করতে থাকল। সেই অগ্নি-বৃষ্টির অব্যাহত ধারাদৃষ্টে আমার মনিব বিখ্যাত বীর ও খ্যাতনামা নাইট ওয়াল্টার অব একবূরী চীৎকার করে বললেন ঃ

'হায় খোদা! আমরা আজ এমন এক ভয়াবহ বিপদের মাঝে নিক্ষিপ্ত যা আমরা অদ্যাবধি দেখিনি। যদি আমরা আমাদের জীবন বাঁচাবার খাতিরে ঐসব দুবাবাকে ছেড়ে দিই তাহলে আমাদেরকে ভীরু আখ্যা দেওয়া হবে। কেননা আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য (অর্থাৎ রাস্তা পাহারা দেওয়া) পরিত্যাগ করছি।

'হে প্রভো! তুমিই বল, তুমি ভিন্ন এই বিপদ ও বেইয্যতির হাত থেকে কে আমাদের বাঁচাতে পারে? আমরা করজোড়ে তোমার নিকট মিনতি জানাচ্ছি, তুমিই আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন কর, তুমিই আমাদের সাহায্যকারী ও রক্ষক হও।'

"এর পর যে-ই না আমাদের উপর ঐসব অগ্নি-গোলা পড়তে লাগল অমনি আমরা মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম, যাতে নিক্ষিপ্ত গোলা আমাদের গায়ে না লাগে। প্রথম অগ্নি-গোলা আরবদের গোপন পথে টহল দানকারী দু'টি দুবাবার মধ্যে এসে পড়ে। আমাদের বাহিনীর অগ্নিনির্বাপক প্লাটুন তাৎক্ষণিকভাবে তা নেভাতে শুরু করল। আরব সৈন্যরা ঐসব ক্রুসেডারদের উপর তীর বর্ষণ করে। কিন্তু তারা ঐসব নিক্ষিপ্ত তীরের হাত থেকে নিরাপদ থাকে। কেননা বাহিনীর হেফাজতের জন্য আমরা সম্রাটের নির্দেশে এসব দুবাবার সামনে দু'টি রক্ষী-ব্যূহ (wing) বানিয়েছিলাম।

www.almodina.com

"ঐ সব গ্রীক অগ্নি-গোলক মদের পিপার মত মোটা ছিল। নিক্ষিপ্ত গোলার মাঝ থেকে আগুন বিরাট এক শিখার আকারে বেরিয়ে আসত এবং এর ভেতর থেকে এমনই এক ভীতিকর ও ভয়াবহ আওয়াজ বের হ'ত যে, মনে হ'ত---বিদ্যুৎ চমকের পর মেঘের প্রচণ্ড বজ্রনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। উড্ডয়ন মুহূর্তে গোলার আকৃতি একটি ভীতিপ্রদ সর্পাকৃতির রূপ ধারণ করত। এই গোলার আলো এত তীব্র ছিল যে, রাত্রিবেলা সমস্ত সেনাছাউনী দিবালোকের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আরবরা মিনজানীককে আমাদের খুবই কাছাকাছি দুবাবার আড়ালে নিয়ে এসেছিল। এর পর তারা দিনের বেলায়ও আমাদের উপর অগ্নি বর্ষণ করছিল। তারা আমাদের সে দু'টি দুবাবা, সিসিলীর সম্রাট ছিলেন যেগুলোর রক্ষক, জ্বালিয়ে দেয়। এতে সম্রাট সেন্ট লুই তাঁর সমস্ত সহ-যোগী ব্যারন এবং নাইটদের কাছে আবেদন জানান, যেন তারা নিজেদের জাহাজ থেকে যে যতটা পারেন কাঠ দেন যাতে করে নতুন দুবাবা বানানো যেতে পারে।..... .....এরপর আরব বাহিনী তাদের সমস্ত মিনজানীক, যার সংখ্যা ছিল ষোলটির মত—সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে অবশিষ্ট দুবাবাগুলোও পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।..."

ডি. জয়েন ওয়েলের পুস্তক পাঠে জানা যায়, কী ভাবে তৈলসিক্ত জ্বলন্ত তীরের সঠিক ও অব্যর্থ ব্যবহার দ্বারা মিসরীয়রা ক্রুসেডের সপ্তম আক্রমণ অভিযানকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। তারা কেবল তাদের দুবাবাই জ্বালায় নি বরং তাদের নৌ-বহরও জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছিল; সম্রাট লুইকে বন্দী করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী-কালে মুক্তিপণের বদলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় ও বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল এই যে, এই মিসরীয় ফৌজের অধিনায়ক ছিলেন একজন মিসরীয় রমণী। ইনি ছিলেন মরহুম বাদশাহ আল-মালিকু'স-সালিহ্‌র সহধর্মিণী। মনসূরা যুদ্ধে সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী ১ম যুবরাজ শাহাদাত লাভ করেন। বাদশাহ্ কিছুটা পুত্র শোকে আর কিছুটা অসুখে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু নির্ভীক এবং দূরদর্শী মুসলিম শাহযাদী শুজা'উদ্দুর বাদশাহ্‌র মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখেন যতক্ষণ না তিনি ক্রুসেডার বাহিনীকে পরিপূর্ণরূপে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হন।

www.almodina.com

এ ইতিহাস পাঠ করলে আমরা মুসলিম জাতির অটুট ইচ্ছা-শক্তি ও অদম্য মনোবল সম্পর্কে জানতে পারি। বাদশাহ কিংবা সিপাহসালার যদি শাহাদত বরণও করতেন তবু তারা শত্রুকে পরাভূত না করে ক্ষান্ত হ'ত না। উল্লিখিত মুসলিম মহিয়সী নারীর গৌরবময় কর্মকাণ্ড মুসলিম ইতিহাসের একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। আমি ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গিয়ে উক্ত শাহযাদীর বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছি।

তৈলসিক্ত জ্বলন্ত তীরের গোপন রহস্য জনৈক সিরীয় শত্রু-পক্ষের নিকট ফাঁস করে দেয়। কিন্তু এর ব্যবহার পরের লড়াই-গুলোতে কম হয়েছে। অবশ্য ১৯৩৯--৪৫ ঈসায়ীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই অস্ত্রটিই অগ্নিশিখা নিক্ষেপক (Flame Thrower) রূপে আবির্ভূত হয়। সৈনিকরা এগুলোকে হাতে টেনে অথবা ট্যাংকের সাহায্যে চালায়। বিমানের সাহায্যে আগুন বোমারূপেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

মিনজানীক কালক্রমে তোপখানার তোপ এবং মর্টারের রূপ নেয়। মোটকথা, জাগ্রত জাতি-গোষ্ঠী আগুনের একটি পোশাকে আবৃত করে একে দুশমনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। মিনজানীকের উপর পর্যা-লোচনা করতে গেলে অবরোধ এবং দুর্গজয়ের কথা এসে যায়। বৃটিশ প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক জেনারেল টুকার বলেন ঃ

"আদি কাল থেকে দুর্গ জয়ের জন্য একটি মূলনীতিই প্রয়োগ করা হচ্ছে, যদিও এ মূলনীতিকে কার্যকর করতে গিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক পন্থা অনুসরণ করা হয়েছে, আর সে মূলনীতিটি হ'ল, দুর্গ-বিধ্বংসী সমরাস্ত্রের ব্যবহার।

"যে সিপাহসালার শত্রু দুর্গের উপর হামলা করার পূর্বে নিজের ফৌজকে দুর্গ-বিধ্বংসী সমরাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করে নি, তার আক্রমণ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।"

অপর প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক লীড্‌ল হার্ট এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"যদি আক্রমণরত বাহিনীর অধিনায়ক অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীর উপর হামলা করে তাদের আত্মরক্ষা মোর্চা ভেঙে ফেলার যোগ্যতা না রাখেন তাহলে দুশমনকে অবরোধ করে বসে থাকা তার জন্য অর্থহীন।"

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ঐসব মূলনীতিকে যে অতি সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত করেছিল—ইতিহাস তার সাক্ষী।

কেবল আত্মরক্ষার তাগিদ

মোটকথা, যে জাতি-গোষ্ঠী সিমেন্ট, লোহা কিংবা প্রস্তর নির্মিত প্রাচীরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বাঁচতে চায় তাদেরকে সব সময়ই ব্যর্থতা বরণ করতে হয়। রাজা দাহির স্বীয় ফৌজের কোম্পানীগুলোকে—যা সব সময় তাঁর প্রতিপক্ষ ফৌজের তুলনায় সংখ্যা ও সমরাস্ত্রের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী ছিল, দুর্গবন্দী হয়ে লড়বার নির্দেশ দেন। রাজা দাহির তাঁর দুর্গের দৃঢ়তা, রসদ-সম্ভার ও সমরাস্ত্রের প্রাচুর্য এবং স্বীয় ফৌজের ত্যাগের ব্যাপারে গর্বিত ছিলেন। এ কারণে বারবার পরাজিত হবার পরও তিনি একজন জুয়াড়ীর মতই আচরণ করতে থাকেন, কিন্তু নিজের অজ্ঞতা ও বোকামীর জন্য প্রতিবারই পরাস্ত হন। রাজা দাহির এবং তাঁর উপদেষ্টাগণ বারবার ধারণা করতে থাকেন যে, আরব ফৌজ ক্ষুধা ও অনাহারের কারণে অবরোধ ছেড়ে দিয়ে নিজে-দের দেশে পাড়ি জমাবে। কিন্তু প্রত্যেকবারই হিন্দী ফৌজ আরব ফৌজের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে। প্রশ্ন জাগে, এমনটি কেন হ'ল?

এর কারণ এই যে, রাজা দাহির শুরু থেকেই তাঁর ফৌজের ভেতর হীনমন্যতাবোধের সৃষ্টি করেন। অন্য কথায়, রাজা নিজেই তাঁর সৈনিকদের খুদী তথা অহংবোধকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি হিন্দী সিপাহীদেরকে কেবল আত্মরক্ষার তা'লীমই দিয়েছিলেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, শত্রুকে সর্বাগ্রে আঘাত হানা আত্মরক্ষার সর্বোত্তম নীতি। প্রকৃতি কেবল রাজা দাহিরের সঙ্গেই এমন আচরণ করেনি, বরং আমরা যখনই ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে দেখি, দেখতে পাই—প্রকৃতি তাঁর মত সবার সাথেই ঐ একই আচরণ করেছে। দূরে যাবার দরকার নেই, ১৯১৪-১৮ ঈসায়ীর বিশ্বযুদ্ধে বেলজিয়াম এবং ডেনমার্ক খুবই শানদার ও সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছিল। কিন্তু তারা মাত্র কয়েক ঘন্টার ভেতরেই জার্মানীর তোপের মুখে মস্তক নুইয়ে দেয়। ১৯৩৯—৪৫ ঈসায়ীর বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্স মেজিনু লাইনের উপর কোটি কোটি পাউণ্ড ব্যয় করে এবং এতে কয়েক

www.almodina.com

বছর লেগে যায়। ঐ মোর্চাকে তারা দুর্ভেদ্য করে তৈরী করেছিল। আমাকেও (গ্রন্থকারকে) সেই সিমেন্ট এবং লৌহ নির্মিত শহরের নিরাপত্তা বিধানে মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু যখন জার্মান ট্যাংকের প্লাবন সম্মুখে অগ্রসর হ'ল তখন এসব মোর্চা ঠিক তেমনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল যেমনভাবে বিরাট ঝড়-তুফানে বড় বড় বৃক্ষ জড়ে-মূলে উৎপাটিত হয়।

জার্মানী এ শিক্ষা কেবল ফ্রান্সকেই নয় বরং গোটা মিত্রশক্তি-কেই পুনরায় শিখিয়ে দেয় যে, যে জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নিজের আত্মরক্ষার জন্য ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেবার অদম্য ইচ্ছা থাকে না---তারা কেবল আত্মরক্ষামূলক লড়াই লড়ে বেঁচে থাকতে পারে না।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যেই জার্মানী দুনিয়াকে শেখাল "সর্বাগ্র আক্রমণ পরিচালনাই আত্মরক্ষার সর্বোত্তম নীতি"---য়ুরোপ জয় করবার পর সেই জার্মানী নিজেই আটলান্টিক প্রাচীর (Altantic Wall) নির্মাণ করে আলস্যের মাঝে গা এলিয়ে দিল। হিটলার বার বার য়ুরোপকে ধমক দিতেন, 'যে কেউই য়ুরোপ সীমান্তের নিকট-বর্তী কদম রাখবে, আমরা তাকেই ধ্বংস করে দেব।' কিন্তু এবারও প্রকৃতি সেই ফয়সালাই শোনাল যা ইতিপূর্বেও সে শুনিয়েছিল। তবে হাঁ, এতটুকু পার্থক্য ছিল যে, প্রথমবার হিটলার আক্রমণকারী হবার কারণে বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু এবার নিজকে অবরুদ্ধ করে ফেলবার কারণে তিনি কেবল পরাজিতই হলেন না, ইহ জগত থেকেও চির জনমের মত বিদায় নিলেন।

এক্ষেত্রে একটি কথা আমাদের স্মৃতিতে গেঁথে নেওয়া দরকার যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন দেখলেন, শত্রু ফৌজের সংখ্যাধিক্য তাঁর জন্য সিন্ধুনদ অতিক্রমের ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রতিবন্ধক, তখন তিনি উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে নৌকা দ্বারা একটি পুল সিন্ধুনদের অনুকূল কিনারে তৈরী করলেন। অতঃপর রাতারাতি একে স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়ে দিয়ে তার শেষ প্রান্ত অপর পাড়ে বেঁধে দিলেন। এ ধরনের পুল তৈরীর দৃষ্টান্ত প্রতিরক্ষার ইতিহাসে খুব কমই মেলে। জেনারেল উইংগেট বার্মায় এ ধরনের পুল তৈরী করলে দুনিয়ার সব পত্র-পত্রিকা তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতে উঠেছিল।

www.almodina.com

আফসোস হয় যে, মুসলিম বিশ্ব মুহাম্মদ বিন কাসিমের মত খ্যাতনামা একজন জেনারেলের জীবনেতিহাস এখন পর্যন্ত সঠিক-ভাবে সাধারণ্যে তুলে ধরতে পারেনি।

সিপাহসালার এবং তাঁর দায়িত্ব

হিন্দী রাজা যখন থাকবেন না তখন হিন্দী ফৌজও লড়াই পরিত্যাগ করবে—মুহাম্মদ বিন কাসিম এই রাজনৈতিক রহস্যের কথাও বিস্মৃত হন নি। আরব ফৌজ-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আঁ-হযরত (সা) মূতার যুদ্ধে প্রথমে যায়দ (রা) বিন হারিছাকে সিপাহসালার মনোনীত করেন এবং বলেন : তিনি শহীদ হলে হযরত জা'ফর বিন আবূ তালিব এবং জা'ফর শহীদ হলে 'আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা) সিপাহ্সালার হবেন, আর 'আবদুল্লাহ্ও যদি শহীদ হয়ে যান, তাহলে মুসলমানরা নিজেদের মধ্য থেকে যে কাউকে সিপাহসালার নির্বাচিত করে নেবে। 'আবদুল্লাহ্র শাহাদাতে সেনানায়কগণ খালিদ বিন ওয়ালীদকে তাদের সিপাহসালার মনোনীত করেন এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। শেষাবধি রোমক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চলে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রথমবারের মত আঁ-হযরত (সা) প্রতিরক্ষা নীতিতে ঢুকিয়ে দেন। আজকের পাশ্চাত্য বিশ্ব অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এ নীতি অনুসরণ করছে।

এ দু'টি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বুঝিয়ে বলার অবকাশ রাখে না। মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর মুকাবিলা করতে গিয়ে হিন্দী সিপাহ্সালার যখন মারা যান তখন হিন্দী ফৌজ যুদ্ধের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমকে যখন খলীফার নির্দেশে কয়েদ করা হ'ল তখনও আরব ফৌজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অটুট মনোবলের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি।

সেনাপতিকে কোথায় অবস্থান করা উচিত

সেনাপতিকে লড়াইয়ের মুহূর্তে কোথায় অবস্থান করা উচিত ? মুহাম্মদ বিন কাসিমের অধিনায়কত্ব থেকে জানা যায়, তিনি প্রত্যেকবার সেখানেই অবস্থান করতেন, যেখান থেকে শত্রুর চলাচল ও গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। হতে পারে যে, এই অবহিতি তাঁর নিজের

www.almodina.com

ব্যক্তিগত দেখাশোনার কিংবা তাঁর সেনানায়কদের প্রেরিত লিপি অথবা গুপ্তচরদের প্রেরিত তথ্যাদির উপর নির্ভর করত।

তিনি ভয় কাকে বলে জানতেন না। নির্ভীকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দূরদর্শী এবং সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করতেন। খুন-যখম তাঁর আবেগকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উস্কে দিতে পারত না। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা একবার স্থিরীকৃত হয়ে গেলে অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তা বাস্তবায়িত করতেন।

অপরদিকে তাঁর প্রতিপক্ষ রাজা দাহির প্রকৃতপক্ষে কখনো যুদ্ধক্ষেত্রেই আসেন নি। বিপদ-আপদ থেকে দূরে থাকাটাই তিনি পসন্দ করতেন। তাঁর সরকার সে সব খবরের উপরই নির্ভর করত, যা বিভিন্ন সূত্র থেকে কখনো-সখনো সংগৃহীত হ'ত। এমত দৃষ্টি-ভঙ্গির উপর মতামত দিতে গিয়ে জেনারেল ফুলার বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি নাটকে মঞ্চস্থিত পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন অভি-নেতাকে নির্দেশ দেন, ঠিক তারই মত নির্দেশ প্রদানকারী কাউকে আমরা সত্যিকার অর্থে জেনারেল বলতে পারি না ; বরং প্রকৃত জেনারেল তিনিই যিনি স্বয়ং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে অন্যান্য অভিনেতাকেও যুদ্ধের দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। অতএব একজন জেনারেল (সিপাহসালার)-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেই মুতাবিক নির্দেশ জারী করাতেই শেষ হয়ে যায় না, বরং তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল, তিনি জানতে চেষ্টা করবেন, তাঁর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ও নির্দেশাদি যথাযথ অনুসরণ ও পালন করা হচ্ছে কিনা ; যদি পালন করা না হয় তাহলে তার কারণ কি এবং কতদূর পর্যন্ত উক্ত নির্দেশের ভেতর রদ-বদল করা সম্ভব।

"নেপোলিয়ন এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে লোকে কেবলমাত্র নিজেদের কষ্ট-ক্লেশই দেখতে পায়, শত্রুর কষ্ট-ক্লেশের দিকে দৃকপাতও করে না। এটি করা অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া এটাও জরুরী যে, সিপাহসালার তার নিজের যোগ্যতার উপর আস্থা রাখবেন।

"উদাহরণত, উত্তর আফ্রিকার লড়াইয়ে জার্মান জেনারেল রোমেল লড়াইয়ের উভয় দিক নিয়েই গভীর চিন্তা-ভাবনা করেন। তাঁর নিজের

www.almodina.com

কষ্ট-ক্লেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ বৃটিশ অধিনায়কের বিপদগুলোরও সঠিক পরিমাপ করেন। কিন্তু বৃটিশ অধিনায়ক জেনারেল ক্যানিংহাম কেবল নিজের কষ্ট-ক্লেশই অনুভব করেন। কেননা যখন জেনারেল রোমেল তার পশ্চাদ্দেশে এসে বীর শীফারজান-এর নিকটবর্তী রসদ-বাহী ও অন্যান্য ব্যবস্থা-সামগ্রীর উপর হামলা চালিয়ে তা তছনছ করে দেন তখন তিনি (ক্যানিংহাম) এতখানি দিকভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি এও ভুলে গিয়েছিলেন—তাঁর ফৌজও জেনারেল রোমেলের ফৌজের পশ্চাদ্দেশে রয়েছে এবং তার জন্যও তো অনুরূপ কষ্ট-ক্লেশ অপেক্ষা করছে যে ধরনের কষ্ট-ক্লেশের মুখোমুখি হতে হচ্ছে স্বয়ং জেনারেল ক্যানিং-হামকে। অবস্থা যদি সত্যি তাই হয়—তাহলে বলতেই হয় যে, জেনারেল ক্যানিংহামের রীতি ও আচরণ একজন যোগ্য অধিনায়কসুলভ ছিল না।

"জেনারেল অকিনলেক কিন্তু এ ধরনের অবস্থার কারণে বিভ্রান্ত হন নি। তিনি জেনারেল ক্যানিংহামের অসুবিধাগুলোর সাথে শত্রুর বিপদ-মুসিবত সম্পর্কেও সঠিক পরিমাপ করতে সক্ষম হন। সাহসিকতা, বীরত্ব ও মনোবলের সঙ্গে তিনি এমন রীতি অবলম্বন করেন যার জন্য তিনি ফৌজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন।"

সামনে গিয়ে জেনারেল ফুলার উল্লিখিত বর্ণনার সমর্থনে মার্কিন প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক আলেকজাণ্ডার ক্লিফোর্ড-এর যে পর্যালোচনা উদ্ধৃত করেছেন, নিম্নে তা দেওয়া গেল ঃ

"জেনারেল রোমেল তার ফৌজকে চোখের পলকে যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবার যোগ্যতার অধিকারী হন—এজন্য যে, তিনি নিজেই সরাসরি তাদের অধিনায়কত্ব করছিলেন। তিনি সঠিকভাবে পরিমাপ করে নিয়েছিলেন যে, যে-ভাবে নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক (এডমিরাল) স্বয়ং জাহাজে আরোহণ করে স্বীয় নৌ-বহরের যথাযোগ্য গতিবিধি ও চলাচলকে সক্রিয় করে শত্রুর নৌ-বহরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন ঠিক তেমনি প্রান্তর-সমুদ্রে স্থলবাহিনী প্রধানের জন্যও নিজের ফৌজকে নিজেই নেতৃত্ব দান করা কর্তব্য। এমতাবস্থায় তিনি নিজেই স্বয়ং সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হবার কারণে স্বীয় ট্যাংক কোম্পানীকে (সেকালের অশ্বারোহী বাহিনী—গ্রন্থকার) শত্রু কোম্পানীর সঙ্গে সরাসরি কিংবা আহরিত তথ্যানুযায়ী উপযোগী পন্থায় লড়িয়ে

www.almodina.com

থাকেন। এ সব অবস্থায় তিনি স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁর নির্দেশাদি অধিনায়কদের নিকট খুব সংক্ষিপ্ত সময়েও স্বল্প বিরতির মাঝেই পৌঁছে যায়। আর তাঁর অধীনস্থ সেনানায়কবৃন্দ সে সব নির্দেশকে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করতে পারেন। এতদ্ভিন্ন যদি শত্রুর কোন সামরিক চালের কারণে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তাহলে তিনি তাঁর প্রথম নির্দেশের মাঝে উপযোগী পরিবর্তন সাধনও করতে পারেন। অর্থাৎ জার্মান সেনানায়কদের নিকট যখন তাদের সেনাপতি জেনারেল রোমেল-এর নির্দেশ পৌঁছে যেত, তখন বৃটিশ সেনাপতির কাছেও যুদ্ধক্ষেত্রের খবর পৌঁছুত না। কেননা বৃটিশ অধিনায়ক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে পশ্চাদ্দেশে অবস্থান করতেন। এ পরাজয়ের কারণ এটা ছিল না যে, জার্মান জেনারেল বৃটিশ জেনারেলের চেয়ে বেশী যোগ্য ছিলেন; বরং এর কারণ ছিল এই যে, তাদের (বৃটিশ জেনারেলদের) প্রশিক্ষণ ছিল অতি প্রাচীনকালের। বৃটিশ জেনারেলদের পরিকল্পনা এবং কর্মপন্থা ১৯১৪-১৮ ঈসায়ীর মোর্চার লড়াইয়ের অনুরূপ ছিল। তাঁরা বিস্তৃত ও প্রশস্ত রণক্ষেত্রে ট্যাংকের সঠিক চলাচল ও গতিবিধির পন্থা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত ছিলেন।"

এখন যদি আমরা সিন্ধুর লড়াই-এর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং রাজা দাহিরের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে।

জেনারেল রোমেল এই আরব বংশোদ্ভূত জেনারেল মুহাম্মদ বিন কাসিমের ন্যায় স্বীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নির্দেশ জারী করতেন। তাঁর দূরদর্শী চক্ষু যুদ্ধের অবস্থাসমূহ নিজের থেকেই দেখতে পেত। ডাক-হরকরা তাঁর নিকট প্রতি মুহূর্তের সংবাদ নিয়ে আসত। ফলে তিনি তাঁর শত্রুর প্রতিরক্ষা চাল এবং সামরিক কূটকৌশলকে মাত করে দিতে সক্ষম হন।

যেখানে মুহাম্মদ বিন কাসিম বিপদ-আপদকে আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সকল অবস্থা নিজের চোখেই দেখতেন, সেখানে (যদি আমরা ঐতিহাসিকদের সে সব বর্ণনা বিশ্বাস নাও করি যে, রাজা দাহির হাতীর হাওদায় বাঁদী, নর্তকী ও পানপাত্র নিয়ে উপস্থিত ছিলেন) রাজা দাহির অবস্থান করতেন তাঁর ফৌজ থেকে অনেক দূরে---অনেক পেছনে।

www.almodina.com

যদি বেলা রণক্ষেত্রে তিনি তাঁর সেনাপতির নিকট নাও পেঁৗছে থাকেন, তাহলে তাঁকে আমরা এভাবে ক্ষমা করতে পারি যে, তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের শক্তি ও যোগ্যতার সঠিক পরিমাপ করতে পারেন নি। মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন তখন ১৯ বছরের এক তরুণ, যাঁর নিকট মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য ছিল। আর সে সব সৈন্যের হাতিয়ার হিন্দু সৈনিকদের তুলনায় অতি সাধারণ মানের ছিল। কিন্তু যখন বেলার পরে দেবল এবং পরে নীরূন, সহওয়ান ও সিব্বী পর্যন্ত বিজিত হয়ে গেল তখনও আরাম-আয়েশে তাঁর ব্যস্ত থাকাটা মোটেই ক্ষমার যোগ্য নয়. বিশেষ করে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুনদ পার হবার স্বপ্নে বিভোর।

এ ব্যাপারে আত্মপ্রশংসার জন্য নয় বরং শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমি আমার স্মৃতিকথা এখানে পেশ করছি।

ঈসায়ী ১৯৪৯ সাল। ভারতীয় ফৌজ কাশ্মীরে প্রবেশ করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। আমার উপর উক্ত ফ্রন্টের বিরাট একটি অংশের যিম্মাদারী সোপর্দ করা হয়। আমি রাওয়ালপিণ্ডি পেঁৗছে দেখতে পেলাম ঃ

১. আমাদের বৃটিশ সেনাপতি—যিনি বিগত দু'বছরের মধ্যে একবারের জন্যও ঝিলাম নদীর অপর পাড়ে পা রাখেন নি, সে সময় যুদ্ধরত ফৌজ থেকে কমপক্ষে চারশ' মাইল দূরে নিজ বাংলোয় অবস্থান করছেন।

২. অবশিষ্ট জেনারেলগণও রাওয়ালপিণ্ডি কিংবা মারীর হোটেল-গুলোতে অবস্থান করছেন।

৩. জেনারেলগণ ছাড়াও নিম্ন র‍্যাংকের বিরাট সংখ্যক অফিসার উল্লিখিত জায়গাগুলিতে আরামের সঙ্গে বসে ম্যাপ দেখে দেখে সৈনিকদের দিয়ে যুদ্ধ করাচ্ছেন।

কাশ্মীর উপত্যকার জঙ্গলগুলোতে না ছিল রাস্তা, না ছিল তার কিংবা টেলিফোন। নদীনালা ও পর্বতশ্রেণী যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে খুবই দুরূহ ও কষ্টসাধ্য করে রেখেছিল। সংবাদ যদিও পেঁৗছত তবে তা এত দেরীতে যে, তখন আর তার কোন গুরুত্বই থাকত না। বলা যেতে পারে যে, আজকালের ওয়ারলেসের

www.almodina.com

যুগে এসব বাধা কোন বাধাই নয়। এর উত্তর এই যে, আমাদের বাহিনীর কাছে যে ওয়ারলেস সেট ছিল, তা ছিল একদম মান্ধাতার আমলের, যার উপর উচ্চতা, তুষারপাত এবং বাতাসের তীব্রতা গভীর প্রভাব ফেলত এবং দীর্ঘ দূরত্ব বা ত্রুটির জন্য কিংবা কমজোরীর কারণে কোন বার্তা পরিপূর্ণ ও সঠিকভাবে পৌঁছুত না; এমন কি সংবাদ আদান-প্রদানের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটাও বিস্ময়কর কিছু ছিল না। কিন্তু এ দুর্বলতা যদি নাও থাকত তবু একটি বড় অসুবিধা এই ছিল যে, তখন যে গুপ্ত-সংকেত (Code) কিংবা পন্থা আমরা ব্যবহার করতাম তার মৌলিক নীতি পাক-ভারতে একই ছিল। কেননা উভয় প্রতিপক্ষের (হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান) সৈনিকেরা একই স্কুল এবং একই মূলনীতির অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ফলে কোড (Code) তখন বস্তুতপক্ষে আর কোড অর্থাৎ গোপন-রহস্য ছিল না।

কম্যাণ্ড হাতে নিতেই যখন আমি আমার হেড কোয়ার্টারকে সম্মুখে অগ্রসর হবার জন্য বললাম, তখনই আমাকে অনেকগুলো বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হল। যাই-হোক, এটা নিশ্চিত যে, পাকিস্তানী ফৌজকে পুন্ছ ও শ্রীনগর থেকে এজন্য হটে আসতে হয় যে, ফৌজের অধিনায়ক তখন কয়েকশ' মাইল পেছনে বিলাস-ব্যসনে মত্ত ছিলেন। এ ছাড়া ফৌজ যেমন তখন সময়মত প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পায়নি, তেমনি পায়নি নেতৃত্ব। তাদের কাছে না ছিল রসদ-সম্ভার, আর না ছিল সমরাস্ত্র। বিশেষত তাদের নিকট কার্তুজেরও পরিমাণ ছিল খুবই কম।

আমি প্রথমবার পুন্ছ নদীর ধারে অবস্থিত ৯০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর গেলাম এবং আমার অধীনস্থ অফিসারবৃন্দকে সেখানে একত্র করলাম। পুন্ছ নদীর উপত্যকা উক্ত পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের পদতলে অবস্থিত। আমি চাইলাম যে, সেখান থেকে সবাইকে পরিষ্কারভাবে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিই।

আমি তিরাখীল থেকে উক্ত পাহাড় পর্যন্ত রত্রিবেলা পায়ে হেঁটে সফর করেছিলাম। উভয়ের মাঝে দূরত্ব ছিল প্রায় ১২ মাইল। আমাকে পথিমধ্যে ৫ হাজার ফুট উঁচু দু'টি পাহাড়ে আরোহণ করে এবং নদী-নালা অতিক্রম করেই সেখানে পৌঁছুতে হয়েছিল। এ সফর আমি মাগরিব থেকে শুরু করে অর্ধেক রাত্রির কিছু পর

www.almodina.com

পর্যন্ত সময়ের মাঝে সম্পন্ন করেছিলাম এবং নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে ক্লান্তি ও অবসন্নতার কারণে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে উপজাতীয় বাহিনীগুলোর সর্দারবৃন্দ, যারা নিজেদেরকে 'জেনারেল' বলে অভিহিত করতেন---উল্লিখিত স্থানে পৌঁছে যান এবং অভ্যাস মাফিক সজোরে কথা-বার্তা বলতে শুরু করেন। এতে সেখানকার ব্রিগেডিয়ার সাহেব তাদেরকে পশতু ভাষায় আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আস্তে এবং নিম্ন স্বরে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেন। কেননা তাদের জেনারেল সাহেব কেবলই এসে পৌঁছেছেন এবং এখন তিনি শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। একথা শুনেই ঐসব উপজাতীয় সর্দার বলেন, "আপনি আমাদেরকে ধোঁকা দেবেন না। আপনি আমাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছেন আর আমরাও এসে গেছি। দু'বছরের বেশী হয়ে গেল, এর ভেতর কি কোন জেনারেল এ এলাকায় এসেছেন? কয়েকজন ব্রিগেডিয়ার ছাড়া অন্যরা কি তাদের নিজ নিজ ক্যাম্পে আরামের ঘুম ঘুমুচ্ছেন না?...আজকের যুগের কোন জেনারেল রাতভর পায়ে হেঁটে এতদূর এসেছেন---এমন কথাও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?" এরপর ভোরবেলা তারা আমাকে সশরীরে তাদের মাঝে উপস্থিত দেখে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমার নিকট ক্ষমা চান এবং তাদের স্বতস্ফূর্ত উল্লাস প্রকাশ করেন। এর বিপরীতে ভারতীয় ফৌজের জেনারেল এবং তাদের অধিনায়কবৃন্দ ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন। আমরা যদি আলোচ্য পর্যালোচনাসহ সমগ্র বিষয়টি নিয়েই পর্যালোচনা করে দেখি তাহলে একথা আমাদেরকে মেনে নিতেই হবে যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ভিত্তিতে কাশ্মীরে যা কিছুই হয়েছে তা আমাদের আশার বাইরে ছিল না এবং এর ফলাফল ও পরিণতি তাই হয়েছে যা হওয়া উচিত ছিল। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ ফৌজের সঙ্গে না থেকে কয়েকজন অধিনায়ক তাদের থেকে দূরে বহু পেছনে অবস্থান করছিলেন।

আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব—কেবল এজন্যই আমি এসব লিখলাম যাতে করে আমার জাতির অধিনায়কবৃন্দ ভবিষ্যতে এ জাতীয় ভুলের পুনরাবৃত্তি করে আমার দেশের সার্বিক স্বার্থ বিনষ্ট না করেন।

আঁ-হযরত (সা) সব সময় স্বীয় ফৌজের নেতৃত্ব যুদ্ধক্ষেত্রেই করেছেন। হযরত আবু বকর (রা)-ও সেই কর্মপন্থাই অনুসরণ

www.almodina.com

করেছেন। যখনই তিনি সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন তখনই তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করে তাদেরকে সে ধরনের দিক-নির্দেশনাই দিয়েছেন। তেমনি মার্কিন জেনারেল পেটি য়ুরোপে, বৃটিশ জেনারেল মন্টোগোমারী আফ্রিকায় এবং য়ুরোপে নিজ নিজ বাহিনীর সঙ্গেই ছিলেন। খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, মূসা বিন নুসায়র, তারিক বিন যিয়াদ প্রমুখ বিখ্যাত জেনারেলও প্রতিরক্ষাশাস্ত্রের এই মূলনীতির উপর আমল করেছেন। তৈমুর লং, সুলতান সলীম-এর মত বিজয়ীরা একেবারে যুদ্ধের ময়দানে গিয়েই সৈন্য পরিচালনা করেছেন।

আজকালকার যুদ্ধ চলাচল ও গতিবিধির যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ট্যাংক ও উড়োজাহাজ আজ অশ্ব ও উষ্ট্রারোহীর স্থান দখল করেছে। আঁ-হযরত (সা)-এর যুগেই খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর দূরদর্শী চক্ষু চলাচল ও গতিবিধির গুরুত্বকে ফৌজের জন্য খুবই অপরিহার্য ভেবেছেন এবং আরববাসীকে অশ্বারোহণ, তীরন্দাযী, দূর-দূরান্তের সফর, ঘোড়দৌড়, কষ্ট সহিষ্ণুতা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হবার জন্য সব সময়ই উপদেশ দিয়েছেন। প্রতিরক্ষা শাস্ত্রের এই মূলনীতি সেযুগের তুলনায় আজকের যুগে একান্তই অপরিহার্য। কেননা এ যুগের জনসাধারণ আরামপ্রিয়তার দিকেই বেশী ঝুঁকে রয়েছে। কষ্ট-সহিষ্ণুতা, কঠোর পরিশ্রম ও সহনশীলতার মত গুণাবলী ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে।

অটুট সংকল্প ও ধৈর্য

সিপাহ্সালারের মধ্যে সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও অসাধারণ ধৈর্য শক্তি থাকা যারপরনাই জরুরী। সিপাহ্সালারের মধ্যে যদি অটুট সংকল্প কিংবা আত্মবিশ্বাস না থাকে তাহলে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি তাঁর সৈনিকদেরকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াতে পারবেন না এবং তাঁর ফৌজকে এমন কোন কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক গতিবিধির ব্যাপারেও অণুপ্রাণিত করতে ভরসা পাবেন না যার ভেতর বিপদ-আপদ কিংবা ধৈর্যের পরীক্ষা রয়েছে। উদাহরণত, মুহাম্মদ বিন কাসিমের যদি স্বীয় ফৌজের উপর এবং বিশেষ করে নিজের উপর বিশ্বাস না থাকত তাহলে তিনি সিবীর যুদ্ধক্ষেত্রে চন্দ্রাকৃতির প্রতিরক্ষা চাল, যা দুর্বলের জন্য একান্তই বিপজ্জনক, রাজা বজ্রের মত ধীর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে

www.almodina.com

কখনো প্রয়োগ করতে পারতেন না। তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারাই রাজার তিনশত হাতীর উপর হামলা করে বসেছিলেন এবং প্রত্যেকবারই নির্ভীকভাবে লড়াই করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ কৌশলও ঠিক করে নিয়েছিলেন। তাঁর ভেতর যদি অটুট সংকল্প ও ধৈর্য না থাকত তাহলে তিনি কখনো এতখানি সাহসিকতা-পূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারতেন না।

যুদ্ধে সংবাদ আদান-প্রদানের গুরুত্ব

সিপাহ্‌সালারেরই কেবল নয়-বরং প্রত্যেক অধিনায়কেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল,--কেবল শত্রুরই নয়, বরং নিজ ফৌজের প্রতিটি প্লাটুনের চলাচল ও গতিবিধি সম্পর্কেও অবহিত থাকা। রাজা দাহির প্রত্যেক বারই এ ভুল করেছেন যে, তিনি তাঁর বাহিনীকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে অলস ও গাফিল হয়ে বসে রয়েছেন। অপরদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমই শুধু নয়, হাজ্জাজ বিন ইউসুফও সিন্ধু বিজয়ের প্রতিদিনের কার্য-বিবরণী বরাবর চেয়ে পাঠা-তেন। এটা ছিল তাঁর উন্নত ও প্রশংসনীয় ব্যবস্থাপনা যে, প্রত্যেক আরব সিপাহ্‌সালারের প্রেরিত চিঠি-পত্রাদি হাজ্জাজ এক সপ্তাহ থেকে দশ দিনের ভেতরেই বসরায় পেয়ে যেতেন।

গেরিলা যুদ্ধের গুরুত্ব

ফিনল্যাণ্ডের মত ছোট্ট একটি রাষ্ট্রের গেরিলারা রাশিয়ার মত একটি বিশাল সাম্রাজ্যের সরকারকে পেরেশান ও বিব্রত করে তুলেছিল এবং রাশিয়ার গেরিলারা জার্মানীর বিজয়ী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে ছেড়েছিল। চীনা গেরিলা বাহিনী সরকারের সাহায্য নিয়ে মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক-কে চীন থেকে বহিষ্কার করে দিল। এর পর থেকেই গেরিলা বাহিনীকে লোকে অপরাজেয় ভাবতে শুরু করে। প্রশ্ন জাগে, হিন্দী গেরিলারা কেন বাজিতে হেরে গেল? এর জওয়াব খুবই পরিষ্কার। এটা ছিল হিন্দী অধিনায়কেরই ভুল, যিনি গেরিলাদেরকে এক স্থানে একত্র করে লড়িয়েছেন। বস্তুতপক্ষে এক স্থানে সমবেত হয়েও তারা লড়তে পারেনি। কেননা মুহাম্মদ বিন

www.almodina.com

কাসিমের অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী বাহিনী তাদের খণ্ডগুলোকে এক এক করে পাকড়াও করেছিলেন।

ম্যাসিনা এবং স্পেনিশ গেরিলা

গেরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতি কেবল সাম্প্রতিককালেই সম্মান, শ্রদ্ধা ও খ্যাতি লাভ করেনি বরং আমরা যখন নেপোলিয়নের লড়াই-গুলোর কথা অধ্যয়ন করি তখনও জানতে পারি যে, ফ্যারাডিয়া ভোলো (Faradia Volo)—যিনি স্পেনিশ গেরিলাদের সর্দার ছিলেন, নেপোলিয়নের বিখ্যাত জেনারেল ম্যাসিনা (Massina)-কে ক্যালব্রিয়ার এলাকায় কতই না বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছিলেন।

নেপোলিয়ন এবং রাশিয়ান গেরিলা

রাশিয়ান গেরিলারা নেপোলিয়নকে—যখন তিনি মস্কো থেকে বিজয়ী বেশে দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন, ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে। মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ফরাসী সেনাবাহিনীর উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের জান-মালের ভীষণ ক্ষতি সাধন করে। আমরা বরং বলতে পারি যে, ঐসব গেরিলাই নেপোলিয়নের মর্যাদায় এবং তাঁর ফৌজের উপর এমন কার্যকর আঘাত হানে যে, নেপো-লিয়নের বাহিনী—যারা প্রথমে ছিল য়ুরোপ বিজয়ী, একটি পরাজিত শক্তিতে পরিণত হয়।

গেরিলাদের বিরুদ্ধে তুর্কী ফৌজ

১৯১২ ঈসায়ীতে বলকান যুদ্ধে মান্টেঙ্গরোর ছোট পার্বত্য রাজ্যের গেরিলারা তুর্কীদেরকে বারবার যন্ত্রণা দেয়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, তুর্কী সেনাবাহিনী খুবই দুর্বল ছিল। কেননা বিশাল সাবিয়া রাজ্যের বিরাট শক্তিশালী সেনাবাহিনীকেও তুর্কীদের হাতে শেষাবধি নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছিল।

স্পেন এবং গেরিলা

১৭৫৯ ঈসায়ীতে ফ্রান্সে মূরগণ স্পেনীয়দেরকে খুবই বিব্রতকর অবস্থার মাঝে নিক্ষেপ করেছিল। স্প্যানিশ বাহিনী মূরদের পশ্চাদ্ধাবন্

www.almodina.com

করতে মাইলের পর মাইল ছুটে যেত এবং ধারণা করত যে, সামনের খেজুর বনেই আমরা তাদেরকে ধরে ফেলব। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা ফাঁকা ও শূন্য ছাউনী ছাড়া আর কিছুই পেত না।

রাশিয়া ও গেরিলা

১৮৭৬-৭৭ ঈসায়ীতে রাশিয়া মুসলিম রাষ্ট্র তুর্কমানের উপর হামলা করে। রাশিয়ানরা খুব ধুমধাম ও বিরাট শান-শওকতের সাথে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং কেন্দ্রীয় শহর হাশিম দখল করে নেয়। কিন্তু শহর ছিল ফাঁকা। তুর্কমানেরা আশেপাশের পাহাড়গুলিতে আত্মগোপন করেছিল। তারা হঠাৎ হাশিমে অবস্থানরত রাশিয়ান ফৌজকে এমনভাবে বিব্রত করে তোলে যে, শেষ পর্যন্ত তারা শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। তুর্কমান গেরিলারা সুযোগ পেলেই রাশিয়ার রসদ-সম্ভারবাহী কাফেলা লুট করে নিত। ফলে রাশিয়ান ফৌজকে রসদের ঘাটতির কারণে বাধ্য হয়ে সেখান থেকে ফিরে যেতে হয়।

ওয়াযিরীস্তানের গেরিলা এবং ইণ্ডিয়ান আর্মী

১৯৩৬--৩৯ ঈসায়ীতে ওয়াযিরীস্তানের উপজাতীয় এলাকায় বৃটিশ ভারতীয় সরকার এবং উপজাতীয়দের মধ্যে যে লড়াই সংঘটিত হয়—আমি (গ্রন্থকার) তাতে শরীক ছিলাম। ফকীর ইপি ছিলেন উপজাতীয় গেরিলা বাহিনীর অধিনায়ক। তার অধীনে কোন সময়ই চারিশতের অধিক উপজাতি একত্রিত হয়নি। এর বিপরীতে ইণ্ডিয়ান আর্মীর সদস্যসংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারের মত এবং এই ফৌজ ছিল গোরা, গুর্খা, সীমান্তের বিখ্যাত (পাঠান) পল্টন এবং আর্মার্ড কোর-এর সমষ্টি। কামান এবং বিমানও এতে শামিল ছিল। ঐসব উপজাতীয়দের আচরণ ছিল এমনি যে, আজ তারা বান্নুর নিকটবর্তী অঞ্চলে অতর্কিত আক্রমণ চালাল, কিছুদিন পর আবার মীর আলীতে গিয়ে হামির হ'ল; তারপর রিযমূক প্রভৃতি স্থানে আবার তাদের আবির্ভাব ঘটল। ইণ্ডিয়ান আর্মী কয়েক শ' মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে যখন হামলাকারীদের কাছে গিয়ে পৌঁছুত তখন দেখা যেত, তারা সেই পাহাড়ী এলাকা থেকে ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও আবার ভেসে

www.almodina.com

উঠেছে। এভাবে উক্ত উপজাতীয়রা কয়েক বছর ধরে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীকে বিব্রত করে রেখেছিল।

কিভাবে গেরিলা বাহিনীর মুকাবিলা করা যায়

জেনারেল ব্যালফ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের জনৈক প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক লিখেছেন যে, তিনি নেপোলিয়নের প্রায় সম-মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ

"এশিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনার সময় সেখানকার গেরিলাদের বিরুদ্ধে অটুট সংকল্প ও নির্মম হৃদয়ের পরিচয় দিতে হবে, যাতে করে ভয়, সন্ত্রাস এবং সিপাহ্‌সালারের অটুট সংকল্প তাদের সকল আশা-ভরসাকে হতাশা ও নিরাশায় পরিণত করে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকাণ্ড শুরু করতে হবে খুবই ত্বরিত গতিতে এবং অত্যন্ত আচম্বিতে। এতে করে গেরিলারা কোন পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগই পাবে না। আর একবার যদি তারা পরাজিত হয় তাহলে তাদের মনোবল ভেঙে পড়বে।

"ভয়, ত্রাস এবং কঠিনতম শাস্তিই এসব উপজাতীয়দের সঠিক প্রতিষেধক—যারা কখন বিজয়ী দলের সাথে গিয়ে মিশবে সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এসব লোক ভয় পেলে গেরিলাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়।"

জেনারেল টুকার এবং গেরিলা

ওয়াযিরীস্তান এলাকার যুদ্ধে আমি (গ্রন্থকার) নিজে আরও একটি পন্থা কার্যকর হতে দেখেছি। ১৯৩৭ ঈসায়ীতে উপজাতীয়রা বান্নু থেকে রিযমুকগামী সড়কে কয়েকবার সফল হামলা চালিয়ে ইণ্ডিয়ান আর্মীকে (অর্থাৎ আমাদেরকে) খুবই বিব্রত করে তুলেছিল। সড়কের সর্বাধিক বিপদজনক অংশের হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হয় টুকার নামক একজন ইংরেজ কর্নেলকে। ইনিই পরবর্তীকালে জেনারেল টুকার নামে পরিচিত হন। তাঁর লিখিত গ্রন্থাদির উল্লেখ আমরা কয়েকবারই করেছি।

টুকার কয়েকদিন তাঁর ফৌজ নিয়ে রাত-দিন টহল দিতে থাকেন। সে সময় রসদবাহী লরী বহরের উপর উপজাতীয়রা সাফল্যের সঙ্গে

www.almodina.com

হামলা চালিয়ে কয়েকবারই তা লুট করে নেয়। এ সম্পর্কে কর্নেল টুকারকে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষত এজন্য যে, কর্নেল টুকার সাধারণ প্রচলিত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার বদলে কিছু নতুন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

কিছুদিন পর খবর পাওয়া গেল যে, কর্নেল টুকার উপজাতীয়-দেরকে তাদেরই ছড়ানো-বিছানো জালে আটকে এমন শিক্ষা দিয়ে-ছেন যা তারা কোনদিনই ভুলতে পারবে না অর্থাৎ উপজাতীয়দের এত বেশী জীবন হানি ও আর্থিক ক্ষতি হয়েছে যার উদাহরণ সীমান্ত যুদ্ধগুলোতে সাধারণত পাওয়া যায় না। অথচ কর্নেল টুকারের ফৌজের একজন সদস্যও এতে আহত হয়নি। লোকদের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, এটা কি করে সম্ভব হ'ল।

কর্নেল টুকার প্রচলিত নির্ধারিত নিরাপত্তামূলক টহলদানের পন্থা ছেড়ে দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে রাতে ও দিনে স্বীয় ফৌজকে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে দেন। এসব গ্রুপের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা দিনের বেলা দূরবীন লাগিয়ে উপজাতীয়দের চলাচল ও গতিবিধি খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। এসময় আকস্মিকভাবে উপজাতীয়দের কোন দল তাদের হাতের মুঠোয় এসে গেলেও তাদের উপর হামলা করবে না।

রাতে টুকারের বাহিনী উপজাতীয় বাহিনীর পেছনে পেছনে ছায়ার মত ফিরত এবং তাদের গতিবিধির উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করত এবং ক্যাম্পে ফিরে এসে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করত। কিন্তু তাদের উপর নির্দেশ ছিল যে, তারা সাধারণ রাস্তা দিয়ে কিংবা এমন কোনভাবে যাবে না, যাতে শত্রুরা তাদের উদ্দেশ্য ধরে ফেলতে পারে। এভাবে কর্নেল টুকার কেবল উক্ত এলাকা সম্পর্কেই একটা স্বচ্ছ ধারণা স্বীয় মস্তিষ্কে গেঁথে নেন নি, বরং উপজাতীয়দের কর্মপন্থা সম্পর্কেও বেশ ভালভাবে ওয়াকিফহাল হন।

টুকার তাঁর বিভিন্ন প্লাটুন প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে জেনে নিয়ে-ছিলেন যে, উপজাতীয়রা সড়কের একটি পুল বারুদের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে রসদবাহী লরী থামাতে চায়। যেই লরী থামবে অমনি তারা ইণ্ডিয়ান আর্মীর জরুরী ও মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম লুটে নেবে এবং বাকি মাল-সামানে আগুন লাগিয়ে পাহাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাবে।

www.almodina.com

উপজাতীয়রা খুব সতর্কতার সাথে কয়েকদিন যাবত পুল ধ্বংসের ব্যাপারে কাজ করে। এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন পুল ছিল না। সেজন্য উপজাতীয়দের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, টহলদানকারী বাহিনী স্বাভাবিকভাবে সড়কের উপর দিয়ে চলে যাবে এবং তারা তাদের পরিকল্পনায় সফল হবে। অনন্তর হ'লও তাই অর্থাৎ সড়কের উপর দিয়ে সশস্ত্র গাড়ী অতিক্রম করে গেল। কেউ এতটুকু সন্দেহও করল না। অবশ্য টুকারের বাহিনী অনুমান করে নিয়েছিল যে, চূড়ান্ত হামলা হবে আগামীকাল রাত্রে অর্থাৎ মটর কনভয় আসবার আগের রাতে।

নির্ধারিত রাতে ঐসব লোক ঘাসের তৈরী বেণী নিয়ে আসে যাতে করে বারূদে অগ্নি সংযোগের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। যদি কোন কারণে বারূদের ফিতা বেকারও হয়ে যায়, তাহলেও যেন কোন অসুবিধা না হয়।

এ কাজ কিভাবে সম্ভব হ'ল

পুলের আশেপাশে তারা পাথর এবং শিলাখণ্ড কয়েক দিন থেকেই জড়ো করতে শুরু করে দেয়। এর দ্বারা তারা বুঝাতে চাচ্ছিল যে, তারা সড়ক এবং পুলের মেরামতের জন্য এসব জড়ো করছে। কয়েক জায়গায় তারা ভূমিও খনন করেছিল। তারা সেই সঙ্গে সঙ্গোপনে পুলের তলায়ও গর্ত খনন করে এবং তার ভেতর মাটি ভরে দেয়, যাতে করে শেষ রাতে সহজেই মাটি সরিয়ে তার ভেতর বারূদ ভর্তি করে বিনা বাধায় পুলটি উড়িয়ে দিতে পারে। তারা পুল থেকে বেশ দূরে দূরে ঘাস জ্বালাতে থাকে, যাতে বোঝা যায় যে, সর্দির হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যেই সড়ক নির্মাণরত শ্রমিকেরা আগুন জ্বালাচ্ছে।

একদিকে উপজাতীয়রা এই ব্যবস্থা নিল, অন্যদিকে টুকার স্বীয় প্লাটুনগুলোর জন্য অন্য ব্যবস্থা নিলেন। তিনি তাঁর ফৌজকে বন্টিত করলেন এভাবে যে, যখন উপজাতীয়রা পুল থেকে সরবে অমনি একটা না একটা প্লাটুনের জালে পড়বে। বিশেষ প্লাটুন ছাড়া অন্য কারো গুলী চালাবার হুকুম ছিল না; বরং শত্রুর উপর খোখরী (গুর্খা খঞ্জর), সঙ্গীন এবং অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিলে বোমা ব্যবহারের অনুমতি ছিল। সবচেয়ে দূরে গোলন্দাজ ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছিল, যারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সব জায়গার দূরত্ব মেপে রেখেছিল

www.almodina.com

এবং এক একটি জায়গার এক একটি বিশেষ নাম দিয়েছিল যাতে করে কামানের গোলা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওয়ারলেসের সাহায্যে শত্রুর উপর নিক্ষেপ করা যায়। যে-ই না উপজাতীয়রা ঘাস জ্বালাবার সময় দিয়াশলাই জ্বালিয়েছে অমনি টুকারের লুকায়িত প্লাটুন তাদের উপর সার্চ লাইট গোলা নিক্ষেপ করে এবং সেই সাথে মেশিনগনের গুলীও বর্ষণ করে। কয়েকজন উপজাতি সেখানেই মারা যায়। যারা বেঁচে ছিল তারা পিছু হটতেই অপর প্লাটুনের সঙ্গীনের শিকারে পরিণত হয়। যে সব লোক কেবল লুটতরাজ করবার জন্য গ্রাম থেকে বেরিয়ে এই আশায় আত্মগোপন করেছিল যে, রসদবাহী লরী আসা মাত্রই হামলা করবে—তারা ভীত-বিহবল হয়ে গ্রামের দিকে পালাতে থাকে। কিন্তু কামানের সার্চলাইট গোলার আলোতে তারা পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয় এবং গ্রাম অবরোধকারী ফৌজের হাতে ধরা পড়ে।

কর্নেল টুকারের এই প্রতিরক্ষা কার্যক্রম ঐ এলাকার উপজাতীয়দের অনেকদিন পর্যন্ত নিশ্চুপ করে রাখে। বিশেষত এজন্য যে, উপজাতীয়দের যে সব লোক আহত হয়েছিল কিংবা মারা গিয়েছিল উপজাতীয়দের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা তাদের উঠিয়ে নিয়ে যেতে দেইনি। উপরন্তু আমরা ঐ সব আহত ও নিহতদের মাধ্যমে জানতে পারি, গেরিলা অভিযানকারী এসব লোক কোন্ উপজাতির এবং কোন্ গ্রামের অধিবাসী ছিল।

মেহমন্দ এবং ১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট

এই প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যেখানে মেহমন্দ উপজাতি এবং ইণ্ডিয়ান আর্মীর মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল।

১৯৩৫ ঈসায়ীতে মেহমন্দ উপজাতি বৃটিশ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং যুদ্ধ শুরুও হয়ে যায়। এই বিশৃঙ্খলার কয়েক মাস আগেই কেবল আমার (গ্রন্থকারের) কোম্পানী বার্ষিক প্রশিক্ষণ মহড়ার উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় চার সপ্তাহ কাটিয়ে এসেছিল। তখন উপজাতীয় মালিক (সর্দার) আমাদের দাওয়াত করতে ক্যাম্পে এসেছিল এবং আমরা তার মেহমানদারীর স্বাদও উপভোগ করেছিলাম। সে সময় আমাদের কল্পনায় কিংবা চিন্তা-চেতনায়ও আসেনি যে, অল্প দিন পরেই আমরা পুনরায় এই এলাকায় যুদ্ধ

www.almodina.com

করতে আসব। কোথায় এ অবস্থা যে, পল্টনের এক কোম্পানী শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে উক্ত এলাকায় ভয়-ভাবনাহীনভাবে ঘুরল-ফিরল আর কোথায় এ অবস্থা যে, একটি পরিপূর্ণ বিগ্রেড, যার সাহায্যে কামানবাহী গোলন্দাজ ইউনিট এবং উড়োজাহাজ প্রভৃতিও প্রস্তুত ছিল, গীলানাঈ গিরিপথের পারে কয়েকটি সংঘর্ষের পর তবে যেতে পেরেছিল।

গীলানাঈ পার হবার পরও আমাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকে। একদা রাত্রি অতিক্রান্ত হবার পর ভোরবেলা দেখতে পেলাম, আমাদের ক্যাম্পের চারিদিককার টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হয়েছে এবং স্থানে স্থানে ইশতিহার লটকে দেওয়া হয়েছে। এসব ইশতিহার আমাদের টহলদানকারী প্লাটুন ভোরবেলা গুছিয়ে নিয়ে আসল। এসব ইশতিহার ছিল আমার নামে এবং এতে আমাকে বলা হয়েছিল উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই না করতে। অন্যথায় তারা আমাকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে দেবে। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঐসব লোকের জানা ছিল যে, কোন্ কোন্ ফৌজ এই ব্রিগেডে শামিল আছে এবং তারা কোথায় কোথায় অবস্থান করছে।

কতকগুলো কারণে ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার সাহেব কয়েকদিনের জন্য অগ্রাভিযান মুলতবী রাখেন। প্রতি রাত্রেই বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে উপজাতীয় বাহিনী আমাদের ক্যাম্পের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত নির্ভীকভাবে হামলা করত এবং এটা প্রকাশ করতে চাইত যে, রাত্রের রাজত্ব উপজাতীয়দের হাতে। উল্লিখিত মেহমন্দ উপজাতির সুবেদার হিকমত খান আমার সিনিয়র সুবেদার ছিলেন। তিনি এসব হামলা প্রতিরোধের জন্য আমাকে যে পরামর্শ দেন তা ছিল খুবই সাদাসিধে, কিন্তু খুবই নির্ভীক এবং সাহসিকতাপূর্ণ। তাকে আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে পেশ করি। তার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আমার চাকুরী হুমকির সম্মুখীন হবে এবং দুর্নাম হবে আমার অতিরিক্ত পাওনা। কিন্তু যেহেতু হিকমত খানের উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং তার যোগ্যতার ব্যাপারেও আমার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল সেজন্য আমি যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে রাযী হই।

সুবেদার হিকমত খানের পরিকল্পনা ছিল সাদাসিধে। তিনি তিন রাত্রি তার নির্বাচিত জওয়ানদের নিয়ে টহল দিয়ে উপজাতীয়

www.almodina.com

লোকেরা যে যে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে এসেছে, সেগুলো দিনের বেলা সনাক্ত করে নেন এবং তার প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা স্থির করে আমার পরামর্শ চান। আমি তার পরিকল্পনায় খুব কমই সংশোধন করি এবং অনুমোদনের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সামনে পেশ করি।

সন্ধ্যা হতেই এই ক্ষুদ্র প্লাটুন বেরিয়ে পড়ে। অর্ধেক রাত্রির পর উপজাতীয়রা শিবিরের উপর গুলী চালাতে আসে। ভোর চারটা পর্যন্ত কয়েক জায়গায় তারা গুলী চালায়। অতঃপর তারা ফিরে যায়। তাদের নিয়ম ছিল যে, তারা সবাই রাত্রিকালে হামলা চালিয়ে অবশেষে এক জায়গায় একত্র হ'ত এবং পরের দিনের কর্মসূচী স্থির করত। তারা প্রথমে নিশ্চিত হয়ে যেত যে, তাদের কোন সাথী আহত হয়নি কিংবা পথ হারিয়ে ফেলেনি। এর পর তারা দু'টি ভিন্ন পথে ফিরে যেত। পূর্ব রাত্রে চাঁদ উঠেছিল। উপজাতীয়রা যখন ঐসব আত্মগোপনরত বাহিনীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা তাদের উপর হালকা মেশিনগানের সাহায্যে হামলা চালায়। এতে তারা পিছু হটে যায় যাতে করে অন্য পথ ধরে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা পিছু হটতেই লুকায়িত অপর প্লাটুন তাদের উপর বোমা ও সঙ্গীনের সাহায্যে হামলা করে। কিছু হাতাহাতি লড়াইও হয়। উপজাতীয়দের অনেকেই মারা যায়। আহত ও নিহতদের থেকে জানা যায় যে, এসব লোকের অধিকাংশই ছিল আফগানিস্তান এলাকার, যারা আমাদের ফেতনাবাজ লোকদেরকে তাদের সঙ্গে টেনে নিয়েছিল। বাকী লোকেরা জীবনের মায়ায় বিপদের ভয়ে তাদের সহযোগী সেজেছিল। উপজাতীয়দের উপর এই শাস্তির গভীর প্রভাব পড়ে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত থেকে এটা পরিষ্কার যে, গেরিলাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ভীষণ জরুরী ঃ

১. অধিনায়কের ভেতর অটুট সংকল্প থাকতে হবে এবং তিনি শাস্তি কিংবা পুরুস্কারের জন্য তৈরী থাকবেন।

২. প্রতিটি জওয়ানের মধ্যে ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই সাহসিকতাও থাকতে হবে।

৩. গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত বাহিনীকে সাধারণত হাতাহাতি যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

www.almodina.com

৪. গেরিলারা শত্রুর বিরুদ্ধে উন্নতমানের গোয়েন্দাগিরি করে। অতএব তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত যে-কোন কার্যক্রম গোপন রাখতে হবে এবং কার্যক্রম গ্রহণকারী বাহিনীর জন্য স্বল্প থেকে স্বল্পতর সময়ের পূর্বে নির্দেশ জারী করতে হবে। তারপরও দেখতে হবে যে, গেরিলারা কোনভাবে তা জানতে পেরেছে কি না।

৫. ত্বরিত গতি ও কঠোরপ্রাণা হওয়া যে সব সিপাহী ও অফিসারের জন্য অপরিহার্য তাদেরকেই গেরিলাদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠাতে হবে।

৬, উল্লিখিত বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের কেবল নিজের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকলেই চলবে না, স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের উপরও তার পূরো আস্থা থাকতে হবে।

সামরিক গতিবিধির যোগ্যতা

শত্রুর বিরুদ্ধে যখন ফৌজ পাঠানো হয় তখন সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায় যে, ফৌজকে যে কাজের জন্য পাঠানো হচ্ছে সে কাজের যোগ্যতা তাদের আছে কিনা।

এই যোগ্যতার পরিমাপ ফৌজের পরিমাণ, সমরাস্ত্র, পরিবহন, রসদ-সম্ভার, ফৌজের প্রতিটি অংশের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহায়তা এবং সমরাস্ত্র ও রসদের দৈনন্দিন ঘাটতি পূরণ ব্যবস্থা থেকে করা হয়। উদাহরণত, যদি ফৌজের কোন একটি অংশও কমযোর হয় তাহলে গোটা ব্যবস্থাই ভেস্তে যাবে। যে অধিনায়ক এ প্রয়োজনগুলোকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন না---তার ব্যর্থতা অনিবার্য।

১৯৩৯--৪৫ ঈসায়ী সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার যখন রাশিয়ার উপর হামলা করেন তখন তিনি রাশিয়ার আবহাওয়া ও মৌসুম এবং তার রাস্তাঘাট সম্পর্কে সঠিক পরিমাপ করেন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সেখানে ভীষণ ঠাণ্ডা ও তুষারপাতের কারণে ট্যাংক ও বিমান যে ব্যবহার করা যায় না এবং সড়কগুলো বৃষ্টি কিংবা বরফ গলবার পর যে অত্যন্ত খারাপ এবং পিচ্ছিল হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত হন নি। তাঁর অদূরদর্শিতার কারণে জার্মানীর বিজয়ী ফৌজকে ভীষণ প্রাণহানি ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

www.almodina.com

রাশিয়ান ফৌজও ফিনল্যাণ্ডে ঐ একই ভুলের কারণে চরমভাবে নাকানী-চুবানী খায়। কিন্তু আমরা যখন মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযান সম্পর্কে চিন্তা করি তখন দেখতে পাই যে, তিনি পূর্বাহ্নেই তাঁর অভিযানের প্রতিটি দিক সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করেছেন। উদাহরণত, লম্বা দূরত্ব, দূরতিক্রম্য রাস্তা, বিভিন্ন ধরনের এলাকা, কোথাও খাদ্যের প্রাচুর্য, কোথাও আহার্য ও পানীয় দ্রব্যের অপ্রতুলতা, কোথাও সুপেয় পানির প্রাচুর্য ইত্যাদি দিক সম্পর্কে তিনি পূর্বাহ্নেই ভেবে নিয়ে কর্মসূচী নির্ধারণ করেছেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযানের সাফল্য তাঁর অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী বাহিনীর উপর ছিল নির্ভরশীল অর্থাৎ এ জন্য দরকার ছিল তাঁর ভাল জাতের ঘোড়া ও উটের। তিনি যথাসময়ে তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। তাঁর ফৌজের সংখ্যা ছিল কম। তিনি এই ঘাটতি পূরণের জন্য তাঁর বাহিনীতে সিন্ধী যুবকদের ভর্তি করেন। তিনি তাঁর ফৌজের ভারসাম্য বজায় রেখে তাদের চলাচল ও গতিবিধির যোগ্যতা বহাল রাখেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম স্থল ও নৌ—উভয় ধরনের পরিবহনই যথা-যথভাবে ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে রাজা দাহির-এর ফৌজের পশ্চাদ্দেশে অথবা দেশের যেখানেই ইচ্ছা সেখানেই সাফল্যের সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

অতএব যিনিই সিপাহসালার হোন—তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হ'ল, যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পূর্বে স্বীয় ফৌজের প্রতিটি দিক সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

মুহাম্মদ বিন কাসিম কেবলমাত্র অশ্বারোহী বাহিনী কেন সঙ্গে নিলেন

এখানে প্রশ্ন জাগে, মুহাম্মদ বিন কাসিম কেবল অশ্বারোহী ফৌজকে কেন সঙ্গে নিলেন? এর কারণ হ'ল এই যে, তাঁকে কয়েক হাযার মাইল পথ সফর করতে হবে বিধায় তাঁর ফৌজের অশ্বারোহী বাহিনী-কেই কেবল তিনি সঙ্গে নেন—যে বাহিনী আধুনিক কালের ট্যাংক বাহিনীর মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল, আর উষ্ট্রারোহী বাহিনী ছিল মোটর আরোহী বাহিনীর মর্যাদায়।

www.almodina.com

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মুকাবিলা ছিল রাজা দাহিরের হস্তী বাহিনী, হিন্দী ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে। কিন্তু হিন্দী ফৌজ সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত ছিল না। কেননা তাদের প্রশিক্ষণ বিশেষ কোন মূলনীতির আওতায় হ'ত না। এ যেন ছিল এক বিশাল জনসমাবেশ, যারা রাজার প্রতি তাদের স্বাভাবিক আনুগত্যের কারণে জীবন নিয়ে খেলতে তথা যুদ্ধ করতে এসেছিল। নিজের বীরত্বে তারা খুব আস্থাবান ছিল। এটা ছিল সে ধরনেরই গ্রুপ, যাদের সম্পর্কে নেপোলিয়ন বলেছেন ঃ

"দু'জন মামলূক তিনজন ফরাসী অশ্বারোহী সৈনিককে অনায়াসে পরাস্ত করতে পারে। এই হিসাবে ১০০ জন মামলূক (অর্থাৎ আল-জিরীয় অশ্বারোহী সৈনিক)-এর সাথে যদি ১০০ জন ফরাসী অশ্বারোহী সৈনিকের মুকাবিলা হয় তাহলে আমার মতে তারা সমকক্ষ হবে। কিন্তু মামলূকদের সংখ্যা যদি তিনশত করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে তিনশত ফরাসী অশ্বারোহী সৈনিকের মুকাবিলায় এনে দাঁড় করানো হয়, তাহলে ফরাসী অশ্বারোহী কোম্পানী নিশ্চিতরূপেই জয়ী হবে। এ সংখ্যা যদি আরো বাড়িয়ে দেওয়া যায় এবং একদিকে এক হাযার ফরাসী অশ্বারোহী সৈনিক এবং অন্যদিকে পনের'শ মুসলিম অশ্বারোহী সৈনিক হয় তাহলে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, প্রত্যেকবারই মামলূক-মুসলমানদের পরাজয় হবে।

"আমার এরূপ ভাষ্যের কারণ হ'ল, মামলূকরা বীর-বাহাদুর এবং সর্বোত্তম লড়াকু সৈনিক বটে। ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্যের দিক দিয়েও তারা একজন ফরাসী সৈনিকের তুলনায় আমার মতে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই, বিন্যাস নেই, তাই তারা একত্রে সংবদ্ধ-ভাবে লড়াই করতে জানে না। এ জন্যই তাদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে—তাদের লড়াই করবার দক্ষতাও সামগ্রিকভাবে ততই হ্রাস পেতে থাকে।

"তবে হ্যাঁ, যদি মামলূকদেরকে সুশৃঙ্খল ও সুসংহত করা যায় তাহলে তারা—যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে অশ্বারোহণে পটু, কঠোরপ্রাণা এবং সৈনিক বৃত্তিতে আগ্রহী—বিশেষ করে যখন তাদের ঘোড়াগুলোও সর্বোত্তম মানের হয়ে থাকে—খুবই বিপজ্জনক ও শক্তিশালী ফৌজে পরিণত হতে পারে।"

www.almodina.com

আমাদের ধারণায় আরব ও হিন্দী উভয় জাতিরই অশ্বারোহী সৈনিক ব্যক্তিগতভাবে শৌর্য-বীর্যে সমমানের ছিল। কিন্তু আরব সৈনিকরা ছিল সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও সুবিন্যস্ত। অপরপক্ষে হিন্দী সৈনিকরা ছিল এসব গুণাবলী থেকে বঞ্চিত।

এই ঠাকুর এবং জাটরাই যখন মুহাম্মদ বিন কাসিমের পতাকা-তলে সুসংবদ্ধ হয়ে লড়াই করে তখন তারাও একটি বিজয়ী দলে পরিণত হয়। বৃটিশ অফিসারগণ ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটান। মোগল ও মারাঠা ফৌজ নির্ভীক ও সাহসী বীরযোদ্ধা ছিল বটে, কিন্তু সুসংহত ও সুসংবদ্ধ ছিল না এবং তাদের সামরিক যোগ্যতাকে যথাযথভাবে কাজেও লাগানো হয়নি। অপরদিকে ইংরেজ অফিসারগণ ভারতীয় যুবকদের ছোট ছোট প্লাটুনে সুসংহত ও সুসংগঠিত করে সেই প্লাটুনগুলোকে বড় কোম্পানীর সাথে জুড়ে দেন। এভাবে তারা ভারতীয় যুবকদের দিয়ে একটি উন্নত ধরনের সেনাবাহিনী গঠন করেন। এই ভারতীয় সেনাবাহিনী দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম লড়াকু ফৌজ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভাল অধি-নায়ক পেলে ভারতীয় সৈনিক বিশ্বের যে কোন সৈনিকের চেয়ে যে কম যায় না—তা তারা হাতে কলমে প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

সামরিক বাহিনীতে অহংবোধ এবং জাতীয় প্রেরণা থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে 'লীড্‌ল হার্ট' বর্ণিত একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য।

"১৯১৫ ঈসায়ীতে জার্মানীর ক্রমবর্ধমান শক্তিদৃষ্টে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড, জার্মান কর্তৃক আক্রান্ত হলে, একে অপরকে পারস্পরিক সামরিক সাহায্য প্রদানের প্রশ্নে চিন্তা-ভাবনা করছিল। এক আলোচনা বৈঠকে বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার হেনরী উইলসন ফরাসী প্রতিনিধি জেনারেল ফো (Foch)-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাদের সরকার জানতে চান, যুদ্ধ দেখা দিলে ফ্রান্স আমাদের কাছে কি পরিমাণ সাহায্যকারী ফৌজ চাইতে পারে? আমাদের সরকার এটা জানতে চান এইজন্য যে, বৃটিশ সরকারের কাঁধে আরও বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা রয়ে গেছে।' এর জওয়াবে জেনারেল ফো বলেন, 'সাহায্য হিসেবে আমরা তখন কেবলমাত্র একজন বৃটিশ সৈনিকই চাইব।' জেনারেল ফো-র জবাব বিদ্রূপাত্মক ছিল না, বরং তিনি বেশ ভালভাবেই জানতেন

www.almodina.com

যে, ঐ একটি বৃটিশ নাগরিকের জীবন রক্ষার্থে ইংলণ্ড তার সমস্ত শক্তি ফ্রান্সের সাহায্যার্থে নিয়োজিত করবে।"

এ বর্ণনার সপক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করবার দরকার নেই। কেননা আমরা সবাই জানি যে, ১৯১৪-১৮ ঈসায়ীর বিশ্বযুদ্ধ একটি মাত্র লোকের হত্যার রক্তপণ আদায়ের দাবীকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল।

আমাদের উপলব্ধিতে একথা আসে না যে, কোন কোন ঐতিহাসিক কি করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে জালিম এবং নিষ্ঠুর আখ্যা দিলেন, যখন তিনি তাঁর নাগরিকের রক্তপণ আদায় তথা অপেন কওম ও মিল্লাতের অহংবোধ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর উপর হামলা করেছিলেন এজন্য যে, রাজা দাহির মুসলিম মহিলাদের অসম্মান ও মুসলিম বণিকদের হত্যা করিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি মুসলিম দূতকে কেবল অপমানই করেন নি, বরং তাকে হত্যাও করেছিলেন। অতএব সিন্ধুর উপর মুহাম্মদ বিন কাসিম কেবল বাহানাবাজীর আশ্রয় নিয়ে হামলা করেন নি, বরং মুসলিম জাতির মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই তা করেছিলেন। যদি এই বাস্তব সত্য স্বীকার করে নিতে কারুর আপত্তি থাকে তাহলে তিনি নিম্নোক্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে কি রায় দেবেন ?

১. আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) বাদশাহ থিওডোর একজন ইংরেজ নাগরিককে কোন অপরাধের কারণে বন্দী করলে বৃটিশ গভর্নমেন্ট উক্ত নাগরিককে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি দানের আবেদন জানায়। থিওডোর তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করলে বৃটিশ ১৮৬৮ ঈসায়ীতে আবিসিনিয়াকে আক্রমণ করে বসে।

২. ১৮৬০ সালে চীনের সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ ঐ একই কারণে সংঘটিত হয়।

৩. ১৮৬৩ সালে ফরাসীরা এ ধরনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েই হাওয়াসের উপর চড়াও হয়েছিল।

এসব দৃষ্টান্তের সাথে সেসব সরকার জড়িত যাদেরকে আজকাল শান্তির রক্ষক (?) বলে অভিহিত করা হয়। অথচ আমরা যখন ঐ

www.almodina.com

একই পাল্লায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের হামলাকে মাপি, তখন ভিন্নমত পোষণ করা হয়। কী অদ্ভুত বৈপরিত্য!

মন্ত্রীবর্গ এবং প্রতিরক্ষা স্ট্রাটেজী

ফিল্ড মার্শাল রবার্টসন বলেন ঃ

"আজকাল যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধ চলাকালেও ফৌজের জেনারেল হেড কোয়ার্টার প্রকৃতপক্ষে কমাণ্ডার-ইন-চীফের দফতরে থাকে না, বরং তা মন্ত্রীদের দফতরে গিয়ে ওঠে। অর্থাৎ আজকাল মন্ত্রীদের দফতরেই অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত এবং প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা জন্ম নেয় এবং সেখানেই অভিযানের প্রতিটি দিকের খুঁটিনাটি সম্পর্কে গভীর আলাপ-আলোচনা হয়ে থাকে এবং সেখানেই রাজনীতিবিদরা প্রতিটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ শেষে গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা প্রদান করেন। আর সেনাপতির দায়িত্ব হচ্ছে কেবল সে সব ফয়সালা তথা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা।"

অতীতকালে রাজা-বাদশাহ্‌রা এ কাজটি নিজেরাই সম্পাদন করতেন। মন্ত্রী এবং জেনারেল তাঁদের পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করতেন। আজ অন্যেরা তাদের স্থান দখল করে নিয়েছে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই মূলনীতির উপরই কাজ করেন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ফৌজ, সমরাস্ত্র, রসদ, পরিবহন, চিকিৎসা-সামগ্রী, অর্থকড়ি—সর্বোপরি প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে সিন্ধুর দিকে প্রেরণ করেন। তাঁকে বিদায় করে দেবার পরও তিনি বিবিধ ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কাজে ব্যাপৃত থাকেন, যাতে করে মুহাম্মদ বিন কাসিম কোন জিনিসের ঘাটতি অনুভব না করেন। তিনি দিক-নির্দেশনা দেন বটে, তবে উপস্থিত কর্মপন্থা গ্রহণের বিষয়টি মুহাম্মদ বিন কাসিমের উপরই ছেড়ে দেন।

যেভাবে সেই মহান শিক্ষক নিজেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাবিদরূপে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনি প্রতিটি মুসলমানের উচিত এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখা।

www.almodina.com

জিহাদ প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয এবং কোন মুসলমানই এ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। আমরা স্যার উইল্‌স হেগ-এর Cambridge History-র তৃতীয় খণ্ড পড়েছি। আফসোসের বিষয় যে, তাতে এই সম্মানিত গ্রন্থকার ইসলামী জিহাদ-এর ব্যাখ্যায় ন্যায়-বিচার ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

এই সম্মানিত লেখক স্যার উইলিয়াম ম্যূরের ধ্যান-ধারণার উল্লেখ করেছেন এবং উইলিয়াম ম্যূর জিহাদ-দর্শন, জিযয়া এবং বিজিত জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলমানদের আচার-ব্যবহারের যে পর্যালোচনা করেছেন তিনি তাঁর সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ ধ্যান-ধারণা যে কতখানি ভিত্তিহীন তা আমরা সেসব আহকাম থেকে প্রমাণ করব, যেসব আহকাম আঁ-হযরত (সা), হযরত আবূ বকর (রা) এবং অন্যান্য খলীফা অভিযানে পাঠাবার প্রাক্‌কালে তাঁদের অধিনায়কদেরকে প্রদান করেছিলেন।

কুরআন মজীদ নিউ টেস্টামেন্টের মত কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়। এই পবিত্র গ্রন্থ সংস্কার কিংবা সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই এবং অদ্যাবধি এমন অপচেস্টা কেউ করেও নি। এজন্য এই প্রশ্নও ওঠে না যে, মুসলিম 'আলিম-'উলামা কুরআন মজীদের আহকামে কোন রকমের হেরফের করে থাকবেন।

www.almodina.com

ইসলামের যুদ্ধ-বিধান

আঁ-হযরত (সা)-এর পথ-নির্দেশ

আঁ-হযরত (সা) যুদ্ধভিযানে প্রেরণের পূর্বে অধিনায়ক ও অধীনস্থ ফৌজকে তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির উপদেশ দান করতেন। তাদেরকে বলতেন ঃ

১. আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে অগ্রসর হও এবং যারা কাফির—আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরী করে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

২. যুদ্ধে কারুর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে না।

৩. যুদ্ধলব্ধ সম্পদের খেয়ানত করবে না।

৪. লাশ বিকৃত করবে না অর্থাৎ যুদ্ধে আহত কিংবা নিহতদের নাক, কান ইত্যাদি কাটবে না।

৫. কোন বৃদ্ধ, শিশু, নারী কিংবা অক্ষম পুরুষকে হত্যা করবে না।

৬. যুদ্ধের আগে শত্রুর সামনে এই তিনটি শর্ত পেশ করবে ঃ

ক. 'ইসলাম কবূল কর।' যদি তারা ইসলাম কবূল করে তবে তাদের উপর হাত উঠাবে না।

খ. যদি তারা জিয্‌য়া প্রদানের মাধ্যমে আনুগত্য স্বীকার করে তাহলে তাদের জীবন ও সম্পদের বেলায় কোন রকমের বাড়াবাড়ি কিংবা সীমা লঙ্ঘন করবে না।

গ. যদি তারা উল্লিখিত শর্তাদি মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধ কর।

৭. কথা বলার ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি অনুসরণ কর।

৮. যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।

www.almodina.com

৯. শত্রু যদি অস্ত্র সমর্পণ করে এবং মুখ কিংবা অঙ্গভঙ্গী সহকারে নিরাপত্তা-প্রার্থী হয়, তাহলে তাদের উপর হাত উঠাবার আর কোন অধিকার তোমাদের থাকবে না।

১০. বিজয়ের নেশায় কিংবা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সীমা অতিক্রম করবে না।

খুলাফা-ই-রাশিদীন উল্লিখিত নির্দেশাবলী অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলেছেন এবং অন্যদেরকেও তা মেনে চলতে বাধ্য করেছেন।

নাজরানবাসীদের সঙ্গে কৃত চুক্তিপত্র

এখন আমরা সেই সন্ধিপত্র আপনাদের কাছে পেশ করছি যা নাজরানবাসীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আঁ-হযরত (সা) মঞ্জুর করেছিলেন।

"নাজরানের খৃস্টান অধিবাসী এবং তাদের প্রতিবেশীরা (যারা খৃস্টানদের সঙ্গে উক্ত এলাকায় বসবাস করত) আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিল এবং আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সা) তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাদের জীবন, বিত্ত-সম্পদ, জায়গা-জমি—স্থাবর হোক কিংবা অস্থাবর, উট ও অন্যান্য প্রাণীকুল, তাদের দূত, ধর্মীয় চিহ্নাদি যেখানে যে অবস্থায় আছে ঠিক সে অবস্থায়ই রক্ষা করা হবে। তাদের কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হবে না কিংবা কোন ধর্মীয় চিহ্নের পরিবর্তন সাধন করা যাবে না। তাদের কোন ধর্মযাজককে তাদের পদ থেকে অপসারণ করা হবে না; গির্জার কোন সেবায়েতকেও তার কাজ থেকে সরানো যাবে না। তার আওতায় যা কিছু আছে, তা বেশীই হোক কিংবা কমই হোক, ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। জাহিলিয়া যুগের কোন হত্যা কিংবা প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে তাদের কোন যিম্মাদারী নেই। সামরিক বিভাগে যোগদান করতে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। কোন শত্রুবাহিনীকে তাদের ভূমি নষ্ট কিংবা ধ্বংস করতে দেওয়া হবে না (অর্থাৎ বহিঃশত্রুর হাত থেকেও তাদের রক্ষা করা হবে)। যদি এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অধিকারের দাবী উত্থাপন করে তাহলে উভয়ের মাঝে ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হবে। নাজরানবাসী অত্যাচারী হবে না, অত্যাচারিতও হবে না। এক ব্যক্তির অপরাধের

www.almodina.com

জন্য অন্য ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা হবে না। এই সন্ধিপত্রে যা কিছু আছে তার জন্য আল্লাহ্‌র জামানত এবং রসূল (সা)-এর যিম্মাদারী রইল যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র হুকুম আসে এবং তারা এর শুভাকাঙ্ক্ষী থাকে এবং চুক্তিপত্রে লিখিত শর্তসমূহ পালন করে।"

হযরত আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশসমূহ

হযরত আবূ বকর (রা) জিহাদের জন্য যখন সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে নিম্নোক্ত নির্দেশাদি প্রদান করতেন ঃ

১. নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করবে না
২. লাশ বিকৃত করবে না।
৩. পাদ্রী বা ধর্মযাজককে উৎপীড়ন করবে না এবং তাদের মঠ ও উপাসনালয় ধ্বংস করবে না কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।
৪. ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, শস্যক্ষেত জ্বালাবে না।
৫. জনবসতি ধ্বংস করবে না।
৬. পশুপাল ধ্বংস করবে না।
৭. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।
৮. যারা আনুগত্য স্বীকার করবে—তাদের জানমালকে ঠিক সেরূপ সম্ভ্রমের চোখে দেখবে যেরূপ একজন মুসলমানের জান ও মালকে দেখা হয়।
৯. যুদ্ধলব্ধ সম্পদের খেয়ানত করবে না।
১০. যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।

দেবলবাসীদের জন্য হাবীব বিন মাসলামার প্রতিজ্ঞাপত্র

এখন আমরা সেই সুলেহনামা (সন্ধিপত্র) লিপিবদ্ধ করছি যা দেবলবাসীদের জন্য হাবীব বিন মাসলামা লিখেছিলেন।

"হাবীব বিন মাসলামা এবং দেবলবাসীদের মধ্যে—চাই তারা খৃস্টান হোক, অগ্নি উপাসক হোক অথবা য়াহূদী, উপস্থিত হোক কিংবা অনুপস্থিত—এ প্রতিজ্ঞাপত্র সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করছি। তোমাদের জীবন, সম্পদ, আত্মীয়-পরিজন,

www.almodina.com

উপাসনালয় এবং তোমাদের শহর প্রাচীরের জন্য এ নিরাপত্তা দেওয়া হ'ল। তোমরা ততদিন পর্যন্ত নিরাপদ, যতদিন পর্যন্ত এ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকবে এবং জিযয়া ও রাজস্ব আদায় করতে থাকবে।"

এতদসত্ত্বেও কয়েকজন ঐতিহাসিক এবং কর্নেল হেগও মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি হিন্দী ফৌজের অস্ত্র সমর্পণের পরও হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালান, হিন্দুদের মন্দির ভূপাতিত করেন, মহিলাদেরকে অসম্মান করেন ইত্যাদি। অথচ এটা প্রকৃত সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়। মজার ব্যাপার এই যে, এই কর্নেল হেগই তাঁর পুস্তকের অন্যত্র বলেছেন, "মুহাম্মদ বিন কাসিম ইসলামী রেওয়াজ ও বিধান উপেক্ষা করে হিন্দুদের প্রতি ধর্মীয় সহমর্মিতা ও উদার সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন এবং তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করেন।"

উক্ত পুস্তকে কর্নেল হেগ এ মর্মে খলীফা হারূন-অর-রশীদকেও বিদ্রূপ করেছেন যে, তিনি তাঁর পুত্র আল-মা'মূনকে খুরাসান, তাবিলিস্তান, কাবুলিস্তান, সিন্ধু এবং হিন্দুস্তান এলাকা দান হিসাবে প্রদান করেন। অথচ (তাঁর ধারণা মুতাবিক) হিন্দুস্তান হারূন-অর-রশীদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কখনোই হয়নি। মুহাম্মদ বিন কাসিম তা জয়ই করেন নি। খলীফা তদীয় পুত্রকে এমন কিছু দান করেন, যা তাঁর ছিল না। কিন্তু কর্নেল হেগ ভুলে গেছেন যে, রাজা দাহির সিন্ধু নদের পূর্ব প্রান্তের এলাকাকে হিন্দ্ নামে ডাকতেন। অতএব আরব ঐতিহাসিকগণও একে হিন্দুস্তান নামেই অভিহিত করেছেন।

হযরত 'আলী (রা)-এর দিক-নির্দেশনা

হযরত 'আলী (রা)-এর একটি চিঠি থেকে খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে প্রচলিত ইসলামী হুকুমতের শাসন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। হযরত 'আলী (রা) আল্লাহ্র রসূলের খলীফা হিসাবে কতটা স্থির-মস্তিষ্ক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিরূপ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন তা এই চিঠি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

হযরত 'আলী (রা)-এর চিঠি উদ্ধৃত করবার পূর্বে আমরা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, এর দ্বারা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

১. আমরা আমাদের অতীত ভুলে গেছি। আমাদের মহান মুসলিম খলীফাগণ তাঁদের আমীর-উমারা এবং জনসাধারণের কাছ থেকে

www.almodina.com

কি আশা পোষণ করতেন এবং কেন করতেন তা আমাদের অবশ্যই জানা উচিত।

২. খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগের পর হুকুমতের রঙ এবং রাষ্ট্রীয় ও সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। খলীফা একজন স্বেচ্ছাচারী সম্রাটে পরিণত হন। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই জোয়ার-ভাটা কেন?

৩. এটা কি সম্ভব নয় যে, উল্লিখিত অবস্থা ও কারণগুলো সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে আমরা আমাদের ঐ সব দুর্বলতা নিয়ন্ত্রণ করব, যেগুলোর ব্যাপারে আমরা বিতৃষ্ণ এবং যা চীৎকার করে করে বলছে, 'এমনটি যদি না কর তাহলে বহু বিপদ, যা তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—পরবর্তীকালে প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে।'

৪. আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোন জাতি যখন অবনতি ও অধঃপতনের দিকে যেতে থাকে তখন তাদের গতি হয় দ্রুততর এবং তারা লাঞ্ছনার গভীরে পৌঁছেও সজাগ হয় না; বরং মন্দের পাঁকে অসহায়ভাবে নিমজ্জিত হতে থাকে। ধ্বংসের এ ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যতক্ষণ না সেই জাতির মধ্যে এমন কিছু নেতা বা পথপ্রদর্শক জন্ম নেন, যারা তাদেরকে পুনরায় অহংবোধ ও ব্যক্তিসত্তার দিকে টেনে নিয়ে যান।

খলীফা 'আবদুল মালিক ও তাঁর পুত্র ওয়ালীদের যুগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, কুতায়বা বিন মুসলিম, মূসা বিন নুসায়র এবং খোদ খলীফা 'আবদুল মালিক এবং ওয়ালীদ ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব, যাঁরা মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় প্রাণ স্পন্দন সৃষ্টি করেন এবং জিহাদের গুরুত্বকে আবার নতুন করে সর্ব সমক্ষে তুলে ধরেন।

৫. এই চিঠির প্রতিটি শব্দ মূলত অত্যন্ত অর্থপূর্ণ এবং আমাদের জন্য আলোক-বর্তিকাস্বরূপ। কতই না ভাল হ'ত যদি হযরত 'আলী (রা)-এর এই চিঠির মর্মানুযায়ী বনু উমায়্যা তাদের শাসনকালকে ঢেলে সাজাত।

যা-হোক, হযরত 'আলী (রা)-এর সেই চিঠি—যা তিনি আল্লাহ্‌র রসূলের খলীফা হিসাবে মিসরের তৎকালীন গভর্নর মালিক আশ্‌তারকে লিখেছিলেন, আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

www.almodina.com

"বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহ্‌ীম,
আস্‌সালামু 'আলায়কুম,

"জেনে রাখ হে মালিক! আমি তোমাকে এমন একটি দেশের শাসক করে পাঠাচ্ছি, যারা অতীতে ন্যায়নীতি ও জুলুম-দুর্নীতি—উভয় স্তরই অতিক্রম করে এসেছে। লোকে তোমার কার্যকলাপকে সেভাবে পরীক্ষা করবে, যেভাবে তুমি নিজে তোমার পূর্বেকার লোকদের কার্যকলাপ পরীক্ষা করে থাক এবং সেভাবে তারা তোমার সম্পর্কে একটা রায় কায়েম করবে, যেভাবে তুমি তাদের সম্পর্কে কায়েম করে থাক। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জনসাধারণ কেবল সেসব শাসক ও কর্মচারীকে ভাল জানে যারা সৎকাজ করে। আর জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত রায় হ'ল—তোমার কার্যকলাপ ভাল কি মন্দ তারই মাপকাঠি। সেজন্য সবচেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ তুমি আশা করতে পার, তা হ'ল সৎকর্ম। স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযত রাখ, নিষিদ্ধ বস্তুর হাত থেকে বেঁচে থাক। কেননা কেবল পরহেজগারী অবলম্বন করেই ভাল ও মন্দের মধ্যে তুমি পার্থক্য নিরূপণ করতে পার।

জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা

"তুমি তোমার অন্তরে জনসাধারণের প্রতি ভালবাসার প্রেরণা লালন কর এবং একে লোকদের প্রতি দয়া ও সহৃদয়তার মাধ্যম বানাও। তাদের সঙ্গে পশুর মত আচরণ ক'র না এবং তাদের ধন-সম্পদের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ক'র না। মনে রেখ, জনসাধারণের মধ্যে দু'ধরনের লোক রয়েছে ঃ হয় তারা তোমার ঈমানী ও দীনী ভাই অথবা (আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে) তোমারই মত মানুষ (যদিও তারা ভিন্নধর্মী) আর মানুষ হিসাবে নিশ্চয়ই তারাও তোমার ভাই। তাদের ভেতর দুর্বলতা যেমন থাকবে —তেমনি থাকবে ভুলত্রুটি ঘটবারও আশংকা। কতক মানুষ অপরাধী হবে। তুমি তাদেরকে ক্ষমা করবে যেমন তুমি চাও আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করুন। মনে রেখ, শাসক হিসাবে তুমি যেমন তাদের উপর রয়েছ—তেমনি তোমার উপর এবং আমাদের সকলের উপর রয়েছেন আল্লাহ্‌—যিনি তোমাকে এজন্য গভর্নর পদে

www.almodina.com

নিযুক্তি দিয়েছেন যাতে তুমি তোমার অধীনস্থ লোকদের দেখাশুনা করতে পার এবং পূরণ করতে পার তাদের প্রয়োজন। তাদের জন্য তুমি যা করবে তারই ভিত্তিতে তোমার (সবকিছুকে) বিচার করা হবে।

আল্লাহ্-ভীতি

"আল্লাহ্র মুকাবিলায় নিজকে দাঁড় করিও না। কেননা আল্লাহ্র ক্রোধাগ্নি থেকে নিজেকে বাঁচাতে তুমি সমর্থ নও, আর তুমি তাঁর রহম, করম ও ক্ষমার গণ্ডী থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতাও রাখ না। কাউকে ক্ষমা করার জন্য আফসোস ক'র না। আর কাউকে যদি শাস্তি দিতেই হয় তজ্জন্য উল্লসিত কিংবা পুলকিত বোধ ক'র না। নিজের ক্রোধকে উদ্দীপ্ত হবার সুযোগ দিও না; কেননা এর দ্বারা উপকার লাভের কোনই সম্ভাবনা নেই।

"আমি তোমাদের মালিক ও শাসক এবং এজন্য তোমাদেরকে আমার নির্দেশের সামনে মাথা নত করতে হবে—এমন কথা কখনো বল না। এটা তোমার আত্মাকে কলুষিত ও তোমার ঈমানকে দুর্বল করে দেবে এবং সারাদেশে অশান্তি ও অরাজকতার সৃষ্টি করবে। ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব তোমার ভিতর গর্বের সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিজের ভেতর যখনই গর্ব ও অহংকারের এতটুকু আলামত দেখতে পাবে তখনি গোটা সৃষ্টিজগতের বুকে আল্লাহ্র অপার শান ও কুদরতের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। দেখবে এই সৃষ্টিজগতে তোমার এতটুকু কর্তৃত্বও নেই। এই আচরণ তোমার ভ্রষ্ট মেধাকে ভারসাম্য দান করবে এবং তোমাকে শান্তি ও তৃপ্তি দেবে। মনে রেখ, আর সাবধান থেকো। কখনই নিজেকে আল্লাহ্র মহান শান ও মর্যাদার সামনে দাঁড় করাবে না এবং তাঁর ন্যায় সার্বভৌমত্বের অনুকরণও করতে যাবে না। কেননা যারাই আল্লাহ্র সঙ্গে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করেছে এবং যারাই মানুষের উপর জুলুম ও নিপীড়ন চালিয়েছে আল্লাহ্ তাদেরই ধ্বংস করে ছেড়েছেন।

হক্কুল-'ইবাদ (বান্দার অধিকার)

"স্বীয় কার্যকলাপ দ্বারা হক্কুল্লাহ্র এবং হক্কুল-'ইবাদের প্রতি সম্মান দেখাবে। স্বীয় সঙ্গী-সাথী ও আত্মীয়-স্বজনকেও এর শিক্ষা

www.almodina.com

দেবে। এ না করলে তুমি নিজের প্রতি ও মানবতার প্রতি অবিচার করবে এবং আল্লাহ্ ও গোটা মানব সমাজ তোমার দুশমনে পরিণত হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে দুশমন বানায় তার আশ্রয় কোথাও নেই; তাকে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলে ততক্ষণ গণ্য করা হবে, যতক্ষণ না সে তওবা করে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়। কোন কিছুই মানুষকে আল্লাহ্র বরকত থেকে ততটা বঞ্চিত করে না আল্লাহ্র রোষাগ্নি ও ক্রোধবহ্নিকে ততটা প্রলম্বিত করে না যতটা করে জুলুম। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ জুলুমের ফরিয়াদ এবং জালিম ও অত্যাচারীকে পাকড়াও করবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

সাধারণ জনগণ

"রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজে ইনসাফ ও সুবিচার কর, একে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও। জনগণের সন্তুষ্টি অর্জন কর; কেননা জনগণের অতৃপ্তি ও অসন্তোষ সংখ্যালঘিষ্ঠ সুবিধা-ভোগী ও বিত্তশালী লোকদের তৃপ্তি ও সন্তোষকে নষ্ট করে দেয়। পক্ষান্তরে বিত্তশালী লোকের অতৃপ্তি ও অসন্তোষ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের প্রাচুর্যের মধ্যে অনায়াসে হারিয়ে যায়। মনে রেখ, মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণী বিপদ ও সংকটকালে তোমার ডাকে সাড়া দেবে না। তারা ন্যায়নীতি ও ইনসাফের রাস্তা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবে এবং নিজেদের প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী চাইবে। তাদের সঙ্গে যে সদয় আচরণ করেছ এবং তাদেরকে যে অনুগ্রহ করেছ সেজন্য তারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে না। জনসাধারণই যে কোন দেশ ও রাষ্ট্রের এবং যে কোন মিল্লাত ও মযহাবের স্থিতি ও শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। তারাই শত্রুর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে। অতএব সাধারণ গণ-মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করবে এবং তাদের কল্যাণের প্রতি সর্বাধিক মনো যাগ দেবে।

সাধারণ দোষত্রুটিগুলি উপেক্ষা কর

"এমন সব ব্যক্তিকে দূরে রাখবে যারা অপরের দোষ-ত্রুটি ও ছিদ্রান্বেষণে সদাব্যস্ত। সাধারণ মানুষ কিন্তু মানবীয় দুর্বলতা থেকে

www.almodina.com

মুক্ত নয়। তাই শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তির জন্য সেসব উপেক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। অন্যের যে ত্রুটি বা দুর্বলতা গোপনীয় রয়েছে তা দিবালোকে টেনে এনো না; বরং যা প্রকাশ পেয়েছে তা দূর করার চেষ্টা কর। আল্লাহ্ই অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে। জনগণের দুর্বলতাগুলো যথাসম্ভব উপেক্ষা কর তাহলে আল্লাহ তোমার সেই সব দুর্বলতা ঢেকে দেবেন, যা জনগণের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখতে তুমি চিন্তিত। জনগণ ও সরকারের মাঝে বিরাজিত ঘৃণার গ্রন্থিগুলো খুলে দিও না এবং ঐ সমস্ত কারণ দূরীভূত করো, যা উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত তিক্ততার সৃষ্টি করতে পারে। নিজেকে এমন সব কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ রাখো যা তোমার জন্য শোভনীয় কিংবা সমীচীন নয়। যদি কেউ তোমার নিকট কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে তাহলে সেগুলোর প্রমাণ সংগ্রহ করতে তুমি তাড়াহুড়োর আশ্রয় নিও না। কেননা চোগলখোররা বন্ধুর ছদ্মবেশেই অন্যকে ধোকা দেয়।

উপদেষ্টা নির্বাচন

"কোন কৃপণকে কখনও তোমার উপদেষ্টা ক'র না। কেননা সে তোমার ঔদার্য ও দানশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং তোমাকে দারিদ্র্যের ভীতি প্রদর্শন করবে। ভীরু ও কাপুরুষের পরামর্শও নেবে না। কেননা সে তোমার অটুট সংকল্প ছিনিয়ে নিতে চাইবে (অর্থাৎ তোমাকে সংকল্পচ্যুত করবে)। লোভী ব্যক্তির মতামতও নেবে না, কেননা সে তোমার ভেতর লোভের সঞ্চার করবে এবং তোমাকে একজন অত্যাচারী শাসকে পরিণত করবে। কার্পণ্য, ভীরুতা এবং লোভ মানুষকে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করা থেকে বিরত রাখে।

"নিকৃষ্টতম মন্ত্রণাদাতা তারাই, যারা কোন জালিম ও অত্যাচারী শাসকের উপদেষ্টা ও মন্ত্রণাদাতা হিসাবে কাজ করেছে এবং তাদের সকল অন্যায় ও অপকর্মকে সমর্থন করেছে। কখনই এমন সব লোককে পরামর্শদাতা করবে না, যারা জালিমদের সহযোগী ছিল এবং তাদের অনাচার ও অত্যাচারে শরীক ছিল। তুমি এমন লোককে পরামর্শদাতা কর, যে প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী, পাপাচার ও অন্যায়-

www.almodina.com

অপকর্ম থেকে মুক্ত এবং যে কোন জালিমের জুলুমে কিংবা কোন পাপীর পাপকর্মে কখনো সাহায্য বা সহযোগিতা করেনি। এ সমস্ত লোক কখনো তোমার বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না বরং সর্বদা তোমার শক্তি ও সংহতির উৎস হিসাবে কাজ করবে। এরাই হবে তোমার সত্যিকারের বন্ধু ও দোস্ত। এ ধরনের লোককে তোমার ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বন্ধু হিসাবে গণ্য করবে। এদের ভেতর আবার অগ্রাধিকার দেবে তাদেরকেই, যারা স্বভাবতই সততার পূজারী। সততার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবে—এজন্য তোমাকে যত বেশী মূল্যই দিতে হোক না কেন কিংবা তোমার ধৈর্যের পক্ষে তা যতই প্রাণান্তকর হোক না কেন।

ভাল-মন্দের পার্থক্য

"নেককার ও আল্লাহ্-ভীরু লোকদেরকে তোমার নৈকট্য দেবে। যে কোন বিষয় তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবে। তারা যেন কখনো তোমায় তোষামোদ না করে এবং তুমি যা করনি সে বিষয়ে চাটুকারিতার আশ্রয় না নেয়। কেননা তোষামোদ ও চাটুকারিতা বিনয়ী ও নম্র মানুষের মধ্যেও অহংকারের সৃষ্টি করে। ভাল ও মন্দের সাথে একই আচরণ করবে না। এটা ভাল মানুষকে ভাল কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং মন্দ লোককে মন্দ কাজে আরো উৎসাহিত করবে। যার যেমন কর্ম তাকে তেমন প্রতিদান দেবে। মনে রেখ—কল্যাণ, ন্যায়, সুবিচার এবং সেবার দ্বারা শাসক ও শাসিতের মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। লোকের ভেতর তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামী তৈরী কর। কেননা তাদের কল্যাণ কামনাই তোমাকে বিপদ-আপদ ও সমস্যা-সংকটের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাদের কল্যাণ কামনার বিনিময় হবে তোমার উপর তাদের আস্থা বৃদ্ধি আর অকল্যাণ ও অসদাচরণের বিনিময় হবে তোমার প্রতি শত্রুতা।

পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য

"আমাদের পূর্বপুরুষদের উত্তম ঐতিহ্য অর্থাৎ ঐক্য, সংহতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করাকে কখনো পরিত্যাগ করবে না এবং

www.almodina.com

এমন কিছুর সূত্রপাত কিংবা সূচনা করবে না যা তাদের ঐতিহ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা বিনষ্ট করে। উত্তম ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাকারীরা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছেন। ঐ সব ঐতিহ্য যদি আহত কিংবা বিনষ্ট হয় তাহলে তোমরাই তার জন্য দায়ী হবে। হামেশা জ্ঞানী-গুণী ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভবান হবার চেষ্টা কর এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি ও কার্যক্রম পরিচালনায় তাদের থেকে বারবার পরামর্শ নিতে চেষ্টা কর। এতে করে তুমি রাষ্ট্রে শান্তি ও কল্যাণের আবহাওয়া বহাল রাখতে পারবে, যা তোমার পূর্ববর্তিগণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী

"মনে রেখ, জনগণ বিভিন্ন শ্রেণীর সমষ্টি এবং এদের একের উন্নতি অন্যের উন্নতির উপর নির্ভরশীল। তাই এক শ্রেণী অন্য শ্রেণী থেকে সম্পর্কহীন হয়ে থাকতে পারে না। আমাদের ফৌজ—যা আল্লাহ্‌র সৈনিকদের নিয়ে গঠিত, আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসকবৃন্দ, তাদের দফতরসমূহ, আমাদের বিচার-বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা, বিচারকবৃন্দ, আমাদের রাজস্ব বিভাগ এবং অন্যান্য শাখার কর্মচারীবৃন্দ—এককথায়, বিভিন্ন বিভাগ ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নিয়েই আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সংগঠিত ও পরিচালিত। জনগণের ভেতর মুসলিম নাগরিক এবং যিম্মী প্রজা রয়েছে। এদের ভেতর ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগর, কর্মী, বেকার, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। আল্লাহ পাক এদের সবার জন্যই আলাদা আলাদা অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এব ঐশী-গ্রন্থে তা সুরক্ষিত করে রেখেছেন'

"আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সেনাবাহিনী জনগণের নিরাপত্তা বিধানে একটি দুর্গের ভূমিকা পালন করে। সাম্রাজ্যের শান-শওকত ও মর্যাদা রক্ষা করে তারাই। ধর্মের সম্ভ্রম তারা বজায় রাখে এবং রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা তারাই বহাল রাখে। সেনাবাহিনী ব্যতিরেকে যেমন একটি দেশ চলতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্রের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া একটি সেনাবাহিনীও টিকতে পারে না। আমাদের সৈনিকেরা শত্রুর মুকাবিলায় শক্তিশালী প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে স্বয়ং নিজেদের জন্যই যুদ্ধ করবার

www.almodina.com

সৌভাগ্য দান করেছেন (অর্থাৎ তারা এমন কোন ভাড়াটে সেনা-বাহিনী নয়, যাদেরকে অন্যের স্বার্থ রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে হয়)। কিন্তু তাদেরকে নিজেদের সমস্ত প্রয়োজন নিজেদেরই পূরণ করতে হয়; আর সেজন্যই তারা রাষ্ট্রীয় রাজস্ব খাত থেকে প্রদত্ত বেতনের মুখাপেক্ষী। সৈনিক এবং সেনাবাহিনী বহির্ভূত সাধারণ শ্রেণীর আপামর মানুষ—যারা রাজস্ব প্রদান করে থাকে, এতদুভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজনীয়। বিচার বিভাগীয় এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসারবৃন্দ এবং তাদের কর্মচারী-কুলের মধ্যেও সহযোগিতা প্রয়োজন। কাযী দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধিকে প্রয়োগ করে থাকেন। অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ রাজস্ব সংগ্রহ করেন। প্রশাসনিক বিভাগ তার নিয়োজিত অফিসার ও কর্মচারীর সাহায্যে নাগরিক জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। এরপর আছে বণিককুল, যারা রাষ্ট্রের আমদানী বৃদ্ধি করেন। এরাই বাজার ও ব্যবসা-কেন্দ্র পরিচালনা করেন এবং এরা (চাইলে) অন্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী হক্‌কুল-'ইবাদ আদায় করতে পারেন। এ ছাড়া গরীব ও প্রয়োজন মুখাপেক্ষী অভাবী ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকও রয়েছে। এদের লালন-পালন করা অন্যান্য শ্রেণীর জন্য ফরয (বাধ্যতামূলক কর্তব্য)। আল্লহ প্রতিটি লোককেই খেদমত করবার উপযোগী মওকা দিয়েছেন। সব লোকের অধিকার রয়েছে রাষ্ট্রের উপর। জনকল্যাণকে সামনে রেখে এদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এটি এমন একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব, যা কোন শাসকই পরিপূর্ণরূপে পালন করতে পারেন না—যতক্ষণ না তিনি এ ক্ষেত্রে নিজের অন্তর থেকে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা পান এবং আল্লাহর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। এটা তার পক্ষেই সম্ভব, যিনি এই অবশ্যকরণীয় ও পালনীয় দায়িত্বটি নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিতে পারেন এবং তা পালন করতে গিয়ে যে সব কষ্ট ও অসুবিধা দেখা দেবে তা ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করার মত সৎসাহসের অধিকারী হন।

"ফৌজে ঐ সব লোকের মঙ্গল ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে, যারা তোমার মতে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সা)-এর উপর গভীরভাবে বিশ্বাসী, যারা ক্রোধের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ঠাণ্ডা মাথায় অভিযোগ শ্রবণ করতে পারেন,

www.almodina.com

যারা দুর্বলকে সাহায্য এবং শক্তিশালীকে পরাভূত করতে পারেন এবং যারা যে কোন পরিস্থিতিতে বিচলিত কিংবা উত্তপ্ত হন না।

"যে সব পরিবার খ্যাতি, বিশ্বস্ততা এবং গৌরবোজ্জ্বল অতীতের অধিকারী—তাদেরকে নৈকট্য দান করবে এবং সাহসী বীর, সত্যবাদী, দানশীল এবং উত্তম স্বভাববিশিষ্ট লোকদেরকে নিজের দিকে টেনে নেবে। কেননা এসব লোকই সমাজ ও রাষ্ট্রের সৌন্দর্য।

জনগণের সঙ্গে সদাচরণ

"লোকের সঙ্গে ঠিক সেরূপ ব্যবহার করবে—যেরূপ ব্যবহার তুমি তোমার শিশু সন্তানের সাথে করে থাক। যদি তাদের উপর কোন অনুগ্রহ করে থাক তাহলে সেজন্য তাদেরকে খোটা দিও না। এমত আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি জনসাধারণকে তোমার প্রতি কল্যাণকামী করে তুলবে। তাদের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দেবে। তুমি তাদেরকে সাধারণভাবে যে সাহায্য প্রদান করেছ, সেটাকে যথেষ্ট মনে ক'র না। কেননা সময় বিশেষে তাদের একটি মামুলী প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিলেও তাদের জীবন আরাম ও প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। নিশ্চিত জেনে রেখ, এসব লোক তোমাকে প্রয়োজন মুহূর্তে কখনো ভুলে যাবে না।

সেনাপতি নির্বাচন ও এতদ্‌সম্পর্কিত বিষয়

"সেনাপতি হিসাবে তুমি এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে, যিনি আপন লোকদের সাহায্য করাকে নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য মনে করেন; যিনি তার অধীনস্থ লোকদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন, তাদের পরিবার-পরিজনদের দেখাশোনার ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। মোটকথা, তার আচার-আচরণ এমন হবে যে, গোটা সেনাবাহিনী যেন শোকে ও আনন্দে, হর্ষ ও বিষাদে তাঁকে নিজেদেরই আপন লোক হিসাবে মনে করে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি এই একাত্মতা তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে অধিকতর শক্তি যোগাবে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে সর্বদা ভালবাসার সম্পর্ক কায়েম রাখবে, যাতে তারা হামেশাই তোমার প্রতি প্রীত থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিদের প্রকৃত আনন্দ ও তৃপ্তি এখানেই যে,

www.almodina.com

দেশে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রয়েছে। জনগণের আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগের প্রকাশ এই প্রীতি ও ভালবাসা থেকেই ঘটে, আর শাসকদের নিরাপত্তা এর উপরই নির্ভরশীল। তোমার উপদেশ তাদের কোন উপকারেই আসবে না, যতক্ষণ না তুমি সাধারণ সৈনিক ও অফিসার উভয়ের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াপরবশ হবে। তা হলে সরকারের কোন কর্মপন্থাই তাদের কাছে কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক মনে হবে না এবং একে বানচাল করতেও তারা পরস্পরের সহযোগী হবে না।

"তাদের প্রয়োজনসমূহ সর্বদা পূরণ করতে থাকবে এবং তাদের সেবা ও আনুগত্যের প্রশংসা করবে। এমন আচরণ বীর সৈনিকদেরকে অধিকতর বীরত্বব্যঞ্জক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করবে এবং ভীরুদেরকেও সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে।

"অন্যের আবেগের সাথে আন্তরিকভাবে শরীক হতে চেষ্টা ক'র এবং একের ভুলকে অন্যের প্রতি নিক্ষেপ ক'র না। যে পুরস্কৃত হবার উপযোগী তাকে পুরস্কার প্রদানে দ্বিধা করবে না। তুমি এমন কোন ব্যক্তিকে অনুগৃহীত করবে না, যে কোন কাজ করে না, কেবল খান্দানী মান ইযযতের আশ্রয় নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। কোন ব্যক্তিকে তার কৃতিত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনের বিনিময়ে প্রাপ্য পুরস্কার থেকে কেবল এই অজুহাতে বঞ্চিত করবে না যে, সে সমাজের নীচু শ্রেণী থেকে এসেছে।

প্রকৃত নেতৃত্ব

"যদি কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত হও তাহলে দিক-নির্দেশনার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে ধাবিত হও। আল্লাহ্ যে সমস্ত লোককে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চান তাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ হ'ল, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং ঐ ব্যক্তির আনুগত্য কর যিনি তোমাদের মধ্য থেকে শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন হয়েছেন। যদি কখনো কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয় তবে তা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।' আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ তাঁর প্রেরিত

www.almodina.com

গ্রন্থের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া এবং রসূলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ তাঁর হাদীছের অনুসরণ করা ।

কাযীউ'ল-কুযাত (চীফ জাস্টিস) মনোনয়ন

কাযীদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে কাযীউ'ল-কুযাত মনোনীত করবে। তিনি এমন ব্যক্তি হবেন, যিনি পারিবারিক চিন্তা-ভাবনা দ্বারা পীড়িত নন, যাঁকে ভয় দেখানো যায় না, যিনি কারো ধমকের ভয়ে ভীত নন, যিনি বারবার ভুল করেন না কিংবা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেন না, যিনি একবার সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তা থেকে সরে যান না, যিনি আত্মকেন্দ্রিক নন, যিনি সকল ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ না জেনে ফয়সালা প্রদান করেন না, যিনি প্রতিটি সন্দেহমূলক বিষয়কে সর্তকতার সঙ্গে মেপে দেখেন এবং সমস্ত কথাকে গভীরভাবে ভেবে-চিন্তে তবেই ফয়াসালা দেন, যিনি উকিল কিংবা আইনজীবীর পেশকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর জিদ করেন না, যিনি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি গ্রন্থি ধৈর্যের সাথে পরখ করেন, যিনি স্বীয় ফয়সালার ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নিরপেক্ষ থাকেন, যাঁকে খোশামোদ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যিনি স্বীয় মর্যাদার কারণে গর্বিত নন। এমন লোক পাওয়া কিন্তু সহজ নয়। একবার এই পদের জন্য উপযুক্ত লোক পাওয়া গেলে তাকে নিযুক্তি দানের পর এমন একটা যুক্তিসঙ্গত সম্মানী প্রদান করবে, যদ্দ্বারা তিনি আরাম-আয়েশের সঙ্গে তাঁর মর্যাদা মাফিক জীবন ধারণ করতে পারেন এবং লোভ-লালসা থেকে উর্ধ্বে থাকতে পারেন। তুমি তোমার দরবারে তাঁকে এমন উচ্চাসন প্রদান করবে, যা পাবার কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

অধীনস্থ কাযী মনোনয়ন

বেশ ভালভাবে অবহিত হও যে, কাযী মনোনয়নের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রকমের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা এটাই এমন একটা উচ্চ মর্যাদা যা লাভ করে ভাগ্যান্বেষী আত্মকেন্দ্রিক লোকেরা অবৈধভাবে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের প্রত্যাশী হয়। অন্যান্য কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন এবং চিন্তা-ভাবনা করে অগ্রসর হওয়া উচিত। ঐ সমস্ত কর্মকর্তাকে তাদের

www.almodina.com

পদে ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী করা উচিত নয়, যতক্ষণ না তাদের শিক্ষা লাভের কাল (প্রবেশনারী পিরিয়ড) তোমার নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হয়। দায়িত্বপূর্ণ পদে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিংবা কোনরূপ প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কখনো লোক মনোনীত করবে না। কেননা তা বেইনসাফী ও মন্দের দিকে তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

উচ্চ পদের জন্য এমন অভিজ্ঞ লোক নির্বাচন কর, যার ঈমান শক্তিশালী এবং যিনি উচ্চ বংশজাত। এ ধরনের লোক সহজে লোভের শিকার হবে না, বরং অন্যের চিরন্তন ও স্থায়ী কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে যাবে। এসব কর্মকর্তাদের বেতন বাড়িয়ে দাও, যাতে তারা নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করতে পারে। এতে তারা কখনো তাদের অধীনস্থ লোকদের উপার্জনের উপর নিজেদের প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে কোন রূপ ট্যাক্স বসাবে না এবং তোমার নির্দেশ অমান্য করার কিংবা রাষ্ট্রীয় অর্থকড়ি অহেতুক ও অযথা অপচয়ের কোন অজুহাতও তাদের থাকবে না। অতঃপর তাদের অজ্ঞাতে তাদের উপর বিশ্বস্ত, সৎ ও যোগ্য লোক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত কর। আশা করা যায় যে, তাদের ভেতর জনকল্যাণের প্রতি সত্যিকারের আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। কিন্তু যেই তাদের কারোর উপর অবিশ্বস্ততার অভিযোগ উত্থাপিত হবে এবং তোমার গোপন তত্ত্বাবধায়কও উক্ত অভিযোগের সত্যতা সমর্থন করবে, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান কর। সে শাস্তি দৈহিক হবে এবং তা নির্দিষ্ট স্থানে ও সাধারণ্যে হতে হবে।

কৃষি ও রাজস্ব বিভাগ

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে যারা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণে রাজস্ব প্রদান করে থাকে তাদের কল্যাণ সুরক্ষিত হয়। রাজস্ব দাতাদের কল্যাণ ও প্রাচুর্যের উপরই অপরাপর শ্রেণী তথা গোটা জাতির কল্যাণ নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে রাজস্বের উপরই গোটা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকে থাকে। রাজস্বের কৃষি জমির উর্বরতার প্রতি দৃষ্টিদান ও এর সংরক্ষণ অধিক গুরুত্ববহ। জমির উপযুক্ত সংরক্ষণ ও উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের ব্যাপারে কৃষককে সাহায্য না

www.almodina.com

করে যে শাসক রাজস্ব চেয়ে বসেন, তিনি কৃষককুলের উপর তাদের সহ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে থাকেন এবং দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করেন। এ ধরনের অত্যাচারী শাসকের অধীনে দেশ বেশীদিন চলতে পারে না। যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, অনাবৃষ্টি কিংবা অতিবৃষ্টির কারণে কিংবা ভূমির অনুর্বরতা অথবা প্লাবনের কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং এই প্রেক্ষিতে কৃষকরা করের পরিমাণ কমানোর জন্য আবেদন করে তাহলে তাদের আবেদন অনুযায়ী করের পরিমাপ কমিয়ে দাও, যেন তারা তাদের অবস্থা সামলে নিতে পারে। এতে রাজস্বে ঘাটতি দেখা দেবে; তুমি তার পরওয়া করবে না। কেননা রাষ্ট্রের সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য ফিরে এলে তুমি এই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মান-মর্যাদা উন্নততর করার সুযোগ পাবে। তখন তুমি বিশ্বে একজন প্রশংসাধন্য ব্যক্তিতে পরিণত হবে এবং জনসাধারণ তোমার ন্যায় ও সুবিচারপূর্ণ অনুভূতির প্রশংসা করবে। এর পরিণতিতে তারা তোমার উপর যে আস্থা স্থাপন করবে তাতে তোমার এবং সমগ্র জাতির শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তোমার বিপদের দিনে জনসাধারণই স্বেচ্ছাকৃতভাবে তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

যত বেশী পরিমাণে চাও, যমীনে লোক বসতি স্থাপন কর। কিন্তু জমির অবস্থা উন্নয়নে যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না কর তাহলে তাদের মধ্যে অতৃপ্তি ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়বে। কৃষকদের ধ্বংসের কারণ ঐসব শাসক, যারা যে কোন মূল্যে কেবল সম্পদ আহরণে ব্যস্ত থাকে এই ভয়ে যে, না-জানি কখন আবার সরকারের আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায়। এরা সেই সমস্ত লোক—যারা উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত এবং অতীত ঘটনাবলী থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে না।

অফিস ব্যবস্থাপনা (সচিবালয়)

সরকারী অফিস এবং সেখানে আসীন সচিবদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ এবং তাদের মধ্যকার সর্বোত্তম লোকদেরকে সরকারের গোপনীয় চিঠিপত্র ও লিখিত নির্দেশাদি নির্বাহের কাজে মনোনীত কর। সর্বোত্তম লোক তারাই, যারা যোগ্য এবং পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত, যারা কখনো তাদের পদমর্যাদার অবৈধ সুযোগ নিয়ে তোমাকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে না, নিজেদের দায়িত্ব পালনে

www.almodina.com

গাফলতি কিংবা অলসতার আশ্রয় নেবে না, রাষ্ট্রীয় চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির প্রলোভনের শিকার হবে না, তোমার স্বার্থ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, তোমাকে সঠিক ও যথার্থ সাহায্য করতে ব্যর্থ হবে না এবং তোমাকে চিন্তা-ভাবনা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচাতে পারবে। স্রেফ ধারণার ভিত্তিতে লোক নির্বাচন করবে না। কেননা বাস্তবে এমন বহু লোক আছে, যারা প্রকৃতই বিশ্বস্ততা ও যোগ্য প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত, কিন্তু নিজেদের লম্বা চওড়া দাবী ও গালভরা বুলি দ্বারা শাসকের সামনে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণে সচেষ্ট থাকে। তাদেরকে উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই কোন কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে হতে হবে। সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে কাউকে কোন পদে নিযুক্ত করার আগে খেয়াল রাখবে, সে লোকের ভেতর প্রভাবশালী এবং ঈমানদারীর দিক দিয়েও মশহূর কিনা। এ ধরনের নির্বাচনই আল্লাহ্‌র নিকট এবং শাসকের নিকট সমভাবে পসন্দনীয়। রাষ্ট্রের প্রতিটি শাখায় এমন একজনকে প্রধান নিয়োগ করা দরকার, যাকে কোন পরিস্থিতিই পেরেশান করতে পারবে না, এমনকি বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী লোকেরাও।

মনে রাখবে, তোমার কর্মচারী ও সচিবদের মধ্যে যে সব দুর্বলতা রয়েছে, তা তুমি দেখেও যদি না দেখার ভান কর, তাহলে তোমার আমলনামা তোমার বিরুদ্ধেই লেখা হবে।

বাণিজ্য ও শিল্প

শিল্পকর্মে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত লোকদের জন্য উপকারী ও ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর এবং বিজ্ঞোচিত পরামর্শ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য কর। তাদের কতক লোক শহরে অবস্থান করে আর কতক লোক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালমাত্তা ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে ফেরী করে বেড়ায়। এভাবে তারা স্বহস্তে উপার্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। এই পেশার সাথে জড়িত লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তা পসন্দ করে। বরং বলা চলে, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোন

www.almodina.com

যোগ্যতাই তাদের নেই। দেশের প্রান্তে প্রান্তে যাও এবং এই দলটি সম্পর্কে ব্যক্তিগত জানাজানির সম্পর্ক সৃষ্টি কর। তাদেরকেও জানতে চেষ্টা কর। মনে রাখবে, এদের মধ্যেও এমন লোভী লোক রয়েছে যারা কায়কারবারে বিশ্বস্ত নয়। তারা খাদ্যশস্য, আহার্য দ্রব্য জমা করে এবং ভীষণ চড়ামূল্যে বিক্রয় করতে চেষ্টা করে। তাদের এই আচরণ জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই দুরাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করা শাসকের সুনামের পক্ষে কলংকস্বরূপ। খাদ্য-শস্য গুদামজাতকরণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে। কেননা রসূলুল্লাহ (সা) তা করতে নিষেধ করেছেন। খেয়াল রাখবে যেন ব্যবসা-বাণিজ্য সুলভে সম্পন্ন হয়। মাপ-জোখের ক্ষেত্রে যাতে সুবিচার রক্ষিত হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে। পণ্যদ্রব্যের মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তোমার সতর্কীকরণের পরও যদি কেউ তোমার নির্দেশ অমান্য করে এবং সম্পদ গুদামজাতকরণের মত অপরাধে লিপ্ত হয়, তাহলে যথোপযুক্ত শাস্তি দেবে।

গরীবদের অধিকার

"সতর্ক ও সাবধান হও এবং আল্লাহকে ভয় কর—যখন গরীবদের সমস্যা তোমার সামনে পেশ করা হয়। তাদের কোন বন্ধু নেই, সহায় নেই, আশ্রয় নেই। তারা বড় নিঃস্ব; তাদের মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত। তারা যুগের আবর্তন-বিবর্তনের শিকার। তাদের ভেতর এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা নিজের ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই না করে বরং ভাগ্যের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং শত দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও কারো কাছে হাত পাতে না। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এদের অধিকারের হেফাজত কর। কেননা এদের দায়িত্ব রয়েছে তোমারই উপর। বায়তুলমালের একটি অংশ তুমি এদের অবস্থার উন্নয়নে নিয়োজিত কর। তারা দূরে অথবা নিকটে যেখানেই থাকুক না কেন—তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তোমার উপর—তোমার কোন ব্যস্ততাই যেন তাদের কল্যাণ চিন্তাকে তোমার মস্তিষ্ক থেকে দূরে সরিয়ে দিতে না পারে। কেননা তাদের অধিকার সম্পর্কে তোমার

www.almodina.com

নিস্পৃহ মনোভাবের পক্ষে কোন ওযরই আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না। তাদের স্বার্থকে তোমার স্বার্থ চিন্তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে কর না এবং নিজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির গণ্ডী থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করে দিও না। সে সব লোককে চিনে রাখ, যারা গরীবদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে অনবহিত রাখে।

"তোমার নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভেতর থেকে এমন কিছু লোক বাছাই করে নাও, যারা কোমল হৃদয়, আল্লাহ্‌-ভীরু এবং যারা গরীবদের অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে যথাযথ অবহিত রাখবে। এ সব গরীব লোকের জন্য এমন ব্যবস্থা কর যাতে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌র সামনে তোমাকে কোন ওযর পেশ করতে না হয়। কেননা এরাই তোমার সদয় ও সহানু ভূতিপূর্ণ ব্যবহার পাবার বেশী হকদার। সবার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার প্রার্থী হও। তাদের ভেতর যে সব বৃদ্ধ রুগী-রোজগারের সামর্থ্য রাখে না এবং ভিক্ষাবৃত্তির দিকেও যাদের কোন প্রবৃত্তি নেই, তাদের প্রয়োজন পূরণকে তুমি তোমার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞান কর। এই অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন সাধারণভাবে শাসকদের নিকট কষ্টকর মনে হয়। কিন্তু সেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনপ্রিয়, যারা দূর দৃষ্টিসম্পন্ন, নম্র হৃদয় ও মুত্তাকী—প্রকৃত অর্থে তারাই একাগ্রতার সঙ্গে ঐ সব দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়।

সাধারণ বৈঠক

কাজের ফাঁকে ফাঁকে মজলুম এবং দরিদ্র শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সাধারণ বৈঠকে মিলিত হবে এবং 'আল্লাহ্‌ তোমার সাথে আছেন'—এই অনুভূতি নিয়েই তাদের সঙ্গে খোলা মন নিয়ে কথাবার্তা বলবে। সে সময় তুমি তোমার ফৌজ, পাহারাদার, দেওয়ানী বিভাগের অফিসার, পুলিশ অথবা বার্তা সংস্থার কর্মচারী—কাউকেই কাছে থাকতে দেবে না, যাতে করে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের পক্ষে তাদের কোন প্রতিনিধি তাদের অভিযোগ নিঃশংক চিত্তে এবং দ্বিধাহীনভাবে তোমার কাছে বলতে পারে। আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে বলতে শুনেছি ঃ এমন কোন

www.almodina.com

জাতি-গোষ্ঠী কিংবা দল উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে পারে না যাদের সবল দুর্বলের ব্যাপারে তার দায়িত্ব পালন করে না। প্রশান্তচিত্তে সহ্য কর যদি দুর্বল কোন শক্ত কথাও তোমাকে বলে ফেলে। যদি সে সহজ-সরল ভাষায় তোমার কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করতে সক্ষম না হয় তবু বিরক্তি বোধ ক'র না। তাহলে আল্লাহ্ তোমার জন্য স্বীয় রহমত ও করুণার উৎসমুখ খুলে দেবেন। তুমি তাদের যা কিছু দিতে পার---অসংকোচে তা দিয়ে দাও। তুমি যা তাদের দিতে পার না, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তা তাদের জানিয়ে দাও।

"এমন কতকগুলো বিষয় আছে যেগুলোর জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। সেরেস্তার মহুরীদের অভিযোগ দূর করবার জন্য তোমার অফিসারদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত থাক। খেয়াল রাখবে—যেদিন তোমার নিরীক্ষণের জন্য কোন আর্জি কিংবা দরখাস্ত দাখিল করা হবে, সেদিনই যেন সে সম্পর্কিত তথ্যাদি তোমার জানা হয়ে যায়---চাই কি তোমার অফিসার মাঝখানে আড় হয়ে দাঁড়াতে যতই চেষ্টা করুক। প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিনেই শেষ করে ফেল। কেননা আগামী দিন তোমার সামনে আরও অনেক কাজ এসে হাযির হবে।

নিয়মিত 'ইবাদত

নিজের সর্বোত্তম মুহূর্তগুলোকে আল্লাহ্র সমীপে হাযির হবার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখ, যদিও তোমার প্রতিটি মুহূর্ত সে উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। তবে পূর্বশর্ত হ'ল, জনসাধারণের জন্য নির্ধারিত মুহূর্তগুলো অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাদেরই সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। নির্ধারিত সালাত আদায়ে দিনরাত নিজেকে মশগুল রেখ এবং পরিপূর্ণ নিবেদিত-চিত্ততা হাসিল করতে যতটা সম্ভব নিজের সালাতকে ক্লান্তিকর ও একঘেয়েমী থেকে মুক্ত রাখ। যখন তুমি সালাতে ইমামতি কর তখন সালাতকে এতটা দীর্ঘ করবে না, যাতে করে জামা'আতে শরীক অন্যান্য লোকের কষ্ট হয় কিংবা মুসল্লীদের ভেতর বিরক্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এতে সালাতের যে গুণগত প্রভাব, তা নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া জামা'আতে এমনও লোক থাকতে পারে, যারা অসুস্থ কিংবা যাদেরকে সালাত শেষে অন্যান্য জরুরী কাজে মনোনিবেশ করতে হবে।

www.almodina.com

"য়ামান যাবার নোটিশ পেয়ে আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমাকে সেখানে কিভাবে সালাতে ইমামতি করতে হবে ? তখন তিনি বললেন, 'এভাবে যেভাবে তোমাদের ভেতরকার সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিটি আদায় করে।' ঈমানদারদের আরামের দিকে খেয়াল রাখার দৃষ্টান্ত স্থাপন কর।

সন্ধি ও চুক্তি

"উল্লিখিত বিষয়গুলো আমল করবার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কথা তোমার স্মৃতিতে গেঁথে নাও ঃ নিজেকে এক মুহূর্তের জন্যও জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন রাখবে না। নিজেকে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন রাখা তাদের অবস্থা সম্পর্কে নিজেকে বেখবর রাখারই নামান্তর। এটা শাসকের মনে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয় এবং তাকে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়, ভুল ও বিশুদ্ধ এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের অযোগ্য করে তোলে।

"আসল কথা, তোমার ভেতর দু'টি বিষয়ের একটি থাকতেই হবে ; হয় তুমি বিচারক, নয়ত অবিচারক। যদি তুমি বিচারক হও তাহলে তুমি নিজেকে লোকের সঙ্গে সম্পর্কহীন রাখবে না ; বরং তাদের কথা ও অভিযোগ শুনবে এবং তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করবে। আর তুমি যদি বিচারক না হও তাহলে লোকেরাই তোমার থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে। নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার মধ্যে কোন্ কল্যাণটা আছে বল ? মোটকথা, জনগণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা কোন ভাল কথা নয়। বিশেষ করে লোকের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখা যখন তোমার একটি অপরিহার্য দায়িত্ব (ফরয)। তোমার নিয়োজিত পদাধিকারী লোকদের জুলুম, অত্যাচার ও বেইনসাফীর কথা শ্রবণ করা তোমার জন্য বিরক্তিকর হওয়া উচিত নয়। তুমি বেশ ভাল করে বুঝে নাও যে, তোমার আশেপাশে যেসব লোক রয়েছে তারা তাদের পদমর্যাদা দ্বারা অবৈধ ফায়দা লুটতে চাইবে। অন্যের প্রাপ্য তারা নিজেরা হাসিল করতে চাইবে এবং অন্যায় ও অবিচারমূলক কাজ করবে। তাদের এ ধরনের প্রবণতাকে দাবিয়ে দেওয়াকে তুমি তোমার নিয়মিত রুটিনে পরিণত কর। তুমি কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে একখণ্ড ভূমিও দেবেনা। এটা তোমাকে

www.almodina.com

অন্যের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে অনেকাংশে বিরত রাখবে। আল্লাহ্ ও তদীয় বান্দা মানুষের অসন্তুষ্টি থেকে তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ।

"আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য না করে পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। তোমার আত্মীয়-বান্ধবের মধ্যে কেউ যদি কোন আইন ভঙ্গ করে তাহলে নির্ধারিত আইন অনুযায়ী তাকেও শাস্তি দাও—চাই তা তোমার ব্যক্তিসত্তার জন্য যতই কষ্টকর হোক। তোমার এই নীতি রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। যদি কখনো লোকে তোমার সম্পর্কে সন্দেহ করে যে, তুমি কোন বিষয়ে তাদের প্রতি অবিচার করেছ তাহলে সে বিষয়ে তোমার ধ্যান-ধারণা তাদের সামনে পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধর এবং তাদের সন্দেহের অপনোদন কর। এভাবে তোমার মস্তিষ্ক ইনসাফ ও সুবিচারের রঙে রঞ্জিত হবে এবং লোকে তোমাকে ভালবাসতে থাকবে। এতে করে তাদের আস্থা অর্জনের পথ খোলাসা হবে।

নির্বিকার ও নিস্পৃহ মানসিকতা সমীচীন

"এ বিষয়ে তুমি খেয়াল রাখবে যে, দুশমনের পক্ষ থেকে আগত সন্ধির আবেদন তুমি প্রত্যাখ্যান করবে না--বরং গ্রহণ করবে। কেননা আল্লাহ্ এতে খুশী হবেন। সন্ধি ও সমঝোতা ফৌজের জন্য সন্তোষের বিষয়। তা তোমার দুশ্চিন্তাকে কম করে দেবে এবং দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু খবরদার! যে মুহূর্তে সন্ধিপত্রে দস্তখত দেবে, তখন সতর্ক ও সজাগ থাকবে। কেননা কতক দুশমন প্রতিপক্ষকে শুধু ধোঁকা দেবার জন্য সন্ধির শর্তাবলী পেশ করে থাকে। মিথ্যা আশ্বাসের উপর যখন প্রতিপক্ষ লড়বার প্রস্তুতি ছেড়ে দেয় তখন সে তার উপর দ্বিতীয়বার হামলা করে। অতএব তোমাকে মাত্রাতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। শত্রুর কথা বেশী মাত্রায় বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। তবে সন্ধিপত্রের আওতাধীনে তুমি যদি কিছু যিম্মাদারী কবুল করে থাক তাহলে ঈমানদারীর সাথে তা পালন করবে। সন্ধিপত্র একটি ওয়াদা। বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার উপর কায়েম থাকতে হবে। যদি কখনো কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও তাহলে যে কোন মূল্যে তা পালন করতে হবে। কেননা প্রতিজ্ঞা পূরণের চেয়ে উত্তম বস্তু আর নেই। অমুসলিমরাও এটা স্বীকার করে। তারাও প্রতিশ্রুতি

www.almodina.com

ভঙ্গের ফলাফল ও মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কখনো নিজ যিম্মাদারী আদায়ের ক্ষেত্রে ওযর তালাশ কর' না। কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর না, কখনো শত্রুকে ধোঁকা দিও না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ আল্লাহ্‌র বিরোধিতারই শামিল। প্রকাশ্য বদকার ছাড়া অনুরূপ কাজ কেউ করে না।

"তবে এমন কোন প্রতিজ্ঞা কর না, যেখান থেকে পরবর্তীকালে সরে আসতে তোমাকে ওযর কিংবা বাহানা পেশ করতে হয়। কখনো ওয়াদা থেকে ফিরে যেও না কিংবা তা ভঙ্গও কর না। ভয় পেয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করবার চেয়ে ধৈর্যের সঙ্গে ভাল ফলাফল ও উত্তম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

রক্তপাত

"অন্যায় রক্তপাত থেকে বিরত থাক। এর চেয়ে ক্ষতিকর জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। সজ্ঞানে রক্তপাত রাষ্ট্রের জীবনী শক্তিকে কমিয়ে দেয়। হাশরের ময়দানে মানুষকে সর্বপ্রথম রক্তপাতজনিত অপরাধের জওয়াবদিহি করতে হবে। অতএব সতর্ক ও সাবধান হও। রক্তপাতের মাধ্যমে সরকারের শক্তি বৃদ্ধির কোশেশ কর না। এটা শেষতক দেশকেই ধ্বংস করবে এবং অন্যের হাতে তা তুলে দেবে। আমার এবং আমার মহান স্রষ্টার দরবারে অন্যায় প্রাণহানির কোন ওযর শোনা হবে না।

"হত্যা করা একটি অপরাধ--যার শাস্তি মৃত্যু। যদি হুকুমতের পক্ষ থেকে কোন লঘু পাপ ও অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে দৈহিক সাজা দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হয় তাহলে ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের কিসাস-এর দাবীকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রশ্ন উঠিয়ে কখনো আড়াল করে ফেল না।

শেষ হেদায়েত

"নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোন কাজ করবার জন্য তাড়াহুড়া কর না। আর যখন সঠিক মুহূর্ত এসে যাবে, তখন কোন কাজ মুলতবী রেখো না। জিদের বশবর্তী হয়ে কোন ভুল কাজ কর না। ভুল ধরা পড়া মাত্রই তা শুধরে নিতে আলস্যের আশ্রয়

www.almodina.com

নিও না। প্রতিটি কাজ যথার্থ ও সঠিক মুহূর্তে কর এবং প্রতিটি বস্তুকেই তার উপযুক্ত স্থানে রাখ। যখন গোটা জাতি কোন মতের উপর ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তুমি তোমার একক রায়কে তার উপর চাপিয়ে দিও না। নিজের উপর যে যিম্মাদারী অর্পিত হয় তা পালন করতে কখনো আলস্যের আশ্রয় নিও না। কেননা জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে তোমার প্রতি। তুমি যার সঙ্গে যে ব্যবহার করবে তার জন্য তোমাকেই জওয়াবদিহি করতে হবে। অবশ্য-পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে এতটুকু পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর না। ক্রোধ সংবরণ কর এবং হাত ও মুখকে সংযত রাখ। অন্যথায় তুমি কেবল তোমার অশান্তিই বাড়াবে।

"সেসব মূলনীতির গভীর অধ্যয়ন তোমার জন্য অপরিহার্য, যেসব মূলনীতি তোমার পূর্ববর্তী শাসকদেরকে পথ প্রদর্শন করেছে। আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান, নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ এবং যা কিছু আমার কর্মপন্থা থেকে লাভ করেছ--তা গভীরভাবে অনুধাবন করবে। যে পথ-নির্দেশনা আমি তোমাকে দিয়েছি এবং যার উপর আমল করবার ওয়াদা তুমি করেছ---তার উপর সুদৃঢ় থাকতে তুমি সাধ্যমত চেষ্টা করবে। আমি তোমাকে তাকীদ করছি যে, তুমি কখনো তোমার প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার সামনে ঝুঁকে পড়বে না এবং নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না।

"আমি সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কুদরত ও অসীম রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তোমাকে আমার সঙ্গে দু'আ করবার দাওয়াত জানাচ্ছি। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে এই তওফীক দেন যেন আমরা আমাদের মর্যিকে তার মর্যির সাথে জুড়ে দিতে পারি। তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর এবং তাঁর সৃষ্টির অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকার যোগ্য বানিয়ে দেন। মানবতা যেন আমাদের হাড়ছাড়া না হয় এবং আমাদের পুণ্য-কর্ম যেন চিরস্থায়ী হয়। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর রহমতের পূর্ণতা দানের আবেদন জানাচ্ছি এবং দু'আ করছি যেন তিনি তোমাকে এবং আমাকে সে তওফীকই দেন এবং তাঁরই পথে শাহাদত লাভের মর্যাদা দান করেন। নিঃসন্দেহে আমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

"আমি আল্লাহর রসূল এবং রসূলের পরিবারবর্গের উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি।"

www.almodina.com

পরিশিষ্ট

মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক

আমরা এই সংক্ষিপ্ত-সার আপনাদের সামনে এজন্য পেশ করছি, যাতে আমরা এবং আপনারা উল্লিখিত শিক্ষা থেকে ভাল-ভাবে এবং পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হতে পারি।

যেসব বন্ধু সমর-বিজ্ঞানে (Military Science) দৃঢ় সংকল্প মুজাহিদের ভূমিকা পালনে আগ্রহী---তারা যেন মুহাম্মদ বিন কাসিমের কার্যাবলী এবং প্রতিরক্ষা কৌশল (Strategy) ও সমরক্ষেত্রে ব্যূহ রচনার কলা-কৌশল (War tactics)-এর মূলনীতিগুলো ভালভাবে হৃদয়পটে গেঁথে নিতে পারেন। এতে তাঁরা ইসলামী বিশ্বের সত্যিকার মুজাহিদরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারবেন।

আমরা নিম্নোদ্ধৃত মূলনীতিগুলো সার-সংক্ষেপ হিসাবে প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকদের ঐসব নির্দেশাদি থেকে গ্রহণ করেছি, যে সব নির্দেশ ১৯৩৯-৪৫ ঈসায়ীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে মাঝে মাঝে বিরতি সহ বিভিন্ন সময়ে লণ্ডনের যুদ্ধ অফিস (War Office) থেকে আমাদের কাছে এসে পেঁৗছেছিল। এগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আপনার সমনে ইসলামী প্রতিরক্ষা শাস্ত্রের মূলনীতিগুলোর মর্যাদা আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং আপনি জানতে পারবেন যে, ইসলামের প্রতিরক্ষা নীতিগুলো ১৯৩৯--৪৫ ঈসায়ীতে এবং পরবর্তীতেও অনড় ও অটল রয়েছে এবং এখনও আছে। আপনি এও বুঝতে পারবেন যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম আঁ-হযরত (সা) অনুসৃত প্রতিরক্ষা কৌশলের মূলনীতি-

www.almodina.com

গুলোর ভক্ত ও অনুরক্ত ছাত্র ছিলেন বলেই এত অল্প বয়সে এতবড় নামকরা বিজয়ী জেনারেল হতে পেরেছিলেন।

সাধারণ সমর নীতি (General Principles of War)

আমরা আশা করি, মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ইতিহাস পড়বার পর আপনার সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে গেছে যে, কোন জাতিগোষ্ঠীর বিজয়ী কিংবা বিজিত জাতিতে পরিণত হওয়া তার সেনাবাহিনীর মধ্যে কতিপয় জরুরী ও অপরিহার্য গুণাবলী থাকা কিংবা না থাকার উপরই নির্ভরশীল। যেমন ঃ

১. ফৌজের সিপাহ্সালার এবং তার অধীনস্থ সেনানায়কদের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সঠিকভাবে সৈন্য পরিচালনা করবার মত গুণ আছে কি না।

২. ফৌজের ভেতর লড়াই করবার যোগ্যতা ও দৃঢ় সংকল্প আছে কি না।

৩. ফৌজেকে উন্নতমানের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে কি না।

৪. ফৌজের ভেতর আইন-শৃঙখলাগত এমন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কিনা, যা যুদ্ধক্ষেত্রের কঠিন মুহূর্তে দুর্বলতার কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

৫. ফৌজের সমরাস্ত্র তার প্রতিপক্ষের অনুপাতে মানসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য কি না।

৬. ফৌজের অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ অস্ত্র-শস্ত্র সঠিক ও কার্যকর-ভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা রাখে কি না।

অধিনায়কত্ব (Leadership)

প্রধান সেনাপতির নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তাঁর ব্যক্তিগত মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে থাকে। তবে তাঁর উপর তাঁর অধীনস্থ সেনানায়কদের আস্থা থাকা অপরিহার্য। আর এই নির্ভরতা ও আস্থা ক্রয়যোগ্য জিনিস নয়। একজন অধিনায়ক এই আস্থা ও নির্ভরতা তখনই লাভ করতে পারেন যখন তাঁর অধীনস্থ সেনানায়কগণ তাঁর যোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, সংবেদনশীলতা, সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তি, স্থৈর্য

www.almodina.com

ও সংহতি, সাহসিকতা, মানবতা, ভয়-ভীতিশূন্যতা প্রভৃতি গুণকে গভীরভাবে পরখ করে তবে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যদি তারা তাঁকে নিজ দায়িত্ব পালনে গাফলতি করতে দেখে কিংবা নিজের উপর নিজের আস্থা থাকার ক্ষেত্রে শিথিল দেখতে পায় তাহলে তাঁর উপর তাদের আস্থাও শিথিল হয়ে পড়ে।

অধিনায়ক নিজের উপর কেবল তখনই আস্থা স্থাপন করতে পারেন, যখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহ রচনার কলাকৌশল তথা প্রতিরক্ষার মূলনীতিগুলো ভালভাবে আয়ত্ত করে নিতে সক্ষম হন। এসব মূলনীতি অদৃশ্য জগত থেকে জানা যাবে না ; বরং প্রতিটি অধিনায়কের জন্য অপরিহার্য যে, যদি তিনি সেসব মূলনীতি যুদ্ধক্ষেত্রে শেখার সুযোগ না পেয়ে থাকেন তাহলে প্রতিরক্ষা ইতিহাস ও প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত ভূগোল অধ্যয়ন করে যেন তা ভালভাবে শিখে নেন। সৌভাগ্যবশত তিনি যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন, তাহলে শান্তিকালীন সময়ে পুস্তক পাঠের মাধ্যমে সে অভিজ্ঞতাকে যেন আরো ধারালো করে তোলেন। এমনটি করলে তিনি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মূলনীতিগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করার পদ্ধতি শিখে যাবেন। যুদ্ধক্ষেত্র অধিনায়কের জন্য একটি পরীক্ষাস্থল। এই পরীক্ষায়, নেপোলিয়নের ভাষায়, কেবল তিনিই কৃতকার্য হতে পারেন, যিনি তার প্রতিরক্ষাগত যোগ্যতাকে গভীর অধ্যয়ন-অভিজ্ঞতা এবং চিন্তা-ভাবনা দ্বারা শানিত করে রাখেন। নেপোলিয়ন বলেছেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সাফল্যের গোপন রহস্য কোন দৈববাণীর ফল নয় ; বরং আমার সাফল্যের রহস্য এই যে, প্রতিটি যুদ্ধের পূর্বেই আমি সে বিষয়টির প্রতিটি দিক গভীরভাবে ভেবে দেখি। যদি কোন বিষয় আমার অভিজ্ঞতায় না থাকে তাহলে আমি প্রতিরক্ষার ইতিহাস থেকে সে ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ করে থাকি।"

অধ্যয়ন এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা থেকে একটি বিশেষ পন্থায় অধিনায়কের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার জগত গড়ে ওঠে। এর কারণ এই যে, তিনি কেবল স্বীয় ফৌজের নেতৃত্ব দানের জন্য কৌশল উদ্ভাবন করেন--না বরং সেই সাথে স্বীয় শত্রুর বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোর সঠিক তুলনামূলক বিচার করে একটি কার্যকর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাও তৈরী করেন। চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণাকে সুশৃঙ্খল রূপদান প্রতিটি অধিনায়কের জন্য অপরিহার্য। আর এ কাজ কেবল সুবিন্যস্তভাবেই

www.almodina.com

আঞ্জাম দেওয়া যেতে পারে। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার সহজ ও কার্যকর বাস্তবায়ন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অধ্যয়নের উপরই নির্ভরশীল।

যুদ্ধের মূলনীতি (Principle of War)

প্রতিরক্ষা ইতিহাস থেকে এটা পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত যে, সফল ও কৃতি অধিনায়কদের বিজয় কতিপয় মূলনীতির কাছে আত্মসমর্পণের উপর নয় বরং সেগুলোকে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রয়োগ করার উপরই নির্ভর করে। এসব মূলনীতি প্রতিবারের ঘটনার নিরিখে নির্ধারিত হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতা এবং প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত ইতিহাস অধ্যয়নের ভিত্তিতে একজন যোগ্য ও সচেতন জেনারেল ঐসব ঘটনা থেকে প্রত্যেক বারই কার্যকর ও ফলপ্রসূ দিক-নির্দেশনা পেয়ে থাকেন এবং সেই অনুযায়ী প্রতিরক্ষানীতি সঠিক পন্থায় প্রয়োগ করে থাকেন। নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির উল্লেখ করা গেল।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল (Maintenance of Object)

প্রতিটি অধিনায়ক—চাই তিনি বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক হোন কিংবা ক্ষুদ্র কোম্পানীর সেনানায়ক, তাঁর সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল, তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার পর কোন কারণেই তা হাসিল করা থেকে সরে আসবেন না, বরং অটুট সংকল্প ও সংহতির সঙ্গে তা হাসিল করার জন্য কোশেশ করবেন।

সমাবেশ (Concentration)

সৈন্য সমাবেশের পেছনে প্রতিরক্ষা নীতির দিক দিয়ে উদ্দেশ্য থাকে এই যে, সিপাহ্‌সালার তাঁর ফৌজের বড় বড় অংশগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রের সেই নির্ধারিত স্থানে এবং নির্ধারিত সময়ে একত্র করবেন, যেখানে এবং যে সময়ে তিনি শত্রুর উপর পরিপূর্ণ বিজয় লাভের আশা করেন।

কেবল মানুষের সংখ্যাশক্তি নয়, বরং নীতি, সমরাস্ত্র, রসদ-সম্ভার, সরকারী বাহিনী, রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতিও সৈন্য সমাবেশের অন্তর্ভুক্ত।

www.almodina.com

অন্য কথায়, এ শক্তির সবটুকুই জেনারেল তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে সেই স্থানে একত্র করবেন, যেখানে তাঁর শত্রুর পরাজয় নিশ্চিত।

প্রতিরক্ষাগত সংকোচন (Economy of Force) ও আক্রমণ এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ও সৈনাপত্য সম্পর্কে যিনি অভিজ্ঞ, তিনি প্রতিরক্ষাগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে তা অর্জনের জন্য ছোট ছোট প্লাটুন ও কোম্পানীকে শত্রু ফৌজের বিরুদ্ধে লড়িয়ে থাকেন এবং অবশিষ্ট ফৌজকে রিজার্ভ ফোর্স হিসাবে সংরক্ষিত রাখেন। এটা ঠিক সেরূপ--যেরূপ প্রতিটি মানুষ যৌবনের উপার্জন থেকে কিছু অংশ বার্ধক্য, অসুস্থাবস্থা অথবা দৈব দুর্ঘটনার জন্য বাঁচিয়ে রাখেন।

শত্রুকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করবার জন্য তার উপর সর্বাগ্রে হামলা করতে হবে। শত্রু প্রথমে হামলা করলে তার সাহস ও মনোবল বেড়ে যায় এবং সে ধারণা করে বসে যে, দুশমনের উপর নিজ পরিকল্পনা মাফিক সঠিক সময়ে ও নির্ধারিত জায়গায় সে কার্যকর আঘাত হানতে পেরেছে।

আত্মরক্ষা নীতির উপর আমল করলে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ দীর্ঘকাল চালাতে থাকলে সাধারণত ফৌজের ভেতর হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়।

অতর্কিত আক্রমণ (Surprise)

আক্রমণকারী সিপাহ্‌সালারের জন্য চূড়ান্ত ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে অতর্কিত আক্রমণ একটি মোক্ষম অস্ত্র। এ ধরনের আক্রমণে শত্রুর মনোবল ও ধ্যান-ধারণার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বল্প প্রাণহানির দ্বারাই শত্রুকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করা যায়।

হেফাজত (Security)

যতক্ষণ পর্যন্ত সিপাহ্‌সালার উপযোগী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি শত্রুর উপর অতর্কিত হামলা চালাতে পারেন না কিংবা তার হাত থেকে আত্মরক্ষাও করতে পারেন না।

www.almodina.com

অতএব দুশমনকে পরাজিত করবার জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা খুবই জরুরী, যাতে করে শত্রুর অসতর্কতার সুযোগে তাকে পাকড়াও করে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া যায়।

পারস্পরিক সহযোগিতা (Co-operation)

যতক্ষণ না ফৌজের সকল সেনানায়ক, অতঃপর অধিনায়ক, অতঃপর রাষ্ট্রের মন্ত্রীবর্গ জনসাধারণের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ জয়লাভ সম্ভব নয়। যেমন মোটরের চাকা যতক্ষণ পর্যন্ত সচল ও সক্রিয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল মোটরের ইঞ্জিন ঐ গাড়ীকে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে পারে না।

চলাচহ ও গতিবিধির যোগ্যতা (Mobility)

যে ফৌজের চলাচল ও গতিবিধি তার প্রতিপক্ষের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর, সে ফৌজ তার দুশমনের প্রতিটি সামরিক চালকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

এখন আপনি উপরোল্লিখিত মূলনীতিগুলোকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করলে পরিষ্কার দেখতে পাবেন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে তিনি সবগুলো মূলনীতিকেই কার্যকরী করেছেন।

তবে তিনি সবকিছুই একাকী করেন নি; বরং একজন পারদর্শী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন জনের উপর সোপর্দ করেছেন। অতঃপর সবাই মিলে একাত্ম হয়ে গোটা কাজটি সম্পন্ন করেছেন। যেহেতু সেনানায়কবৃন্দ ছাড়াও গোটা ফৌজের উপর তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল, তাই তাঁর বাহিনী ছোট হওয়া সত্ত্বেও বিশাল শত্রুবাহিনীকে পরাভূত করতে পেরেছে।

অন্য কথায়, মুহাম্মদ বিন কাসিম আমাদেরকে শিখিয়ে দেন যে, যে অধিনায়ক আক্রমণ ব্যূহ রচনার কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং যিনি কেবল নিজের উপরই আস্থা রাখেন না, বরং আপন সেনানায়কবৃন্দ ও গোটা ফৌজের উপরও আস্থা রাখেন, তিনি যখন দূরদর্শিতার

www.almodina.com

সঙ্গে পরিকল্পনা করেন, অতঃপর দৃঢ়সংকল্প হয়ে তা অনুসরণ করেন এবং স্বীয় পরিকল্পনার গোপন রহস্য শত্রু থেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নির্ধারিত স্থানে এবং নির্ধারিত সময়ে স্বীয় ফৌজের সাহায্যে একই সঙ্গে সংঘবদ্ধ অতর্কিত হামলা চালান, সাধারণত সাফল্য তাঁর পদ চুম্বন করেই থাকে।

প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা (Plan)

মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুনদ পার হবার পরিকল্পনা অত্যন্ত সহজ, সরল ও কার্যকর পদ্ধতিতে তৈরী করেছিলেন। তিনি পূর্বাহ্নে দুশমনের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মান যে, তিনি এমন জায়গা দিয়ে সিন্ধু পার হবেন, যেখানে পানি কম। সেজন্য রাজা দাহিরের ফৌজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে সব জায়গারই হেফাজত করতে থাকে। কিন্তু ইবন কাসিম সিন্ধুনদের বিভিন্ন জায়গা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে শেষাবধি গভীর পানির একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে নেন। তারপর অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে নৌকা তৈরী করেন। নৌকা তৈরী হয়ে গেলে সেগুলো একত্রে বেঁধে দেন। অতঃপর এক রাতেই পুল তৈরী করে গোটা সেনাবাহিনী সমেত সিন্ধু পার হন। রাজা দাহির বিষয়টি তখন জানতে পারেন, যখন আরব ফৌজ তার উপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে—অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রথমে এই মর্মে তাঁর লক্ষ্য স্থির করেন যে, তিনি রাজার ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়ে তাকে পরাজিত করবেন। অতঃপর আনুষঙ্গিক অবস্থা অর্থাৎ সিন্ধু পার হবার রাস্তা, সেখানকার জমি, রাজা দাহিরের রক্ষক ফৌজ প্রভৃতির সঠিক পরিমাপ করে সম্মুখপানে অগ্রসর হন।

রাজা দাহির যখন রাজা গোপীর অধীনে একটি বিশাল সেনা-বাহিনী সিন্ধুনদের পারে পাঠিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পশ্চাদ্দেশে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালান এবং সেই সঙ্গে রাজা বেট-এর বিরুদ্ধে অপর একটি বাহিনী পাঠান তখন মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বীয় লক্ষ্য হাসিল অর্থাৎ সিন্ধুনদের অপর পারে গিয়ে রাজা দাহিরকে পরাজিত করার লক্ষ্যে স্বীয় ফৌজের সর্বোত্তম পরিমাপের সামরিক গতিবিধির যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে প্রথমে পশ্চাদ্দেশের বিপদ দূরীভূত করেন। রাজা গোপীর বিরুদ্ধে

www.almodina.com

তিনি নিজেই তাঁর ফৌজের একটি বড় অংশ নিয়ে অগ্রসর হন। সেই সাথে অশ্বারোহী বাহিনীর কয়েকটি কোম্পানী বিভিন্ন স্থানে—যেখানে বিপদ খুবই প্রকট আকারে দেখা দেওয়ার আশংকা ছিল—বিদ্যুৎ গতিতে পাঠিয়ে দেন। ফৌজের বিশাল অংশের সঙ্গে ঐ সব কোম্পানীর পরিপূর্ণ যোগাযোগ ছিল। যেহেতু সেনানায়কবৃন্দের উপর সিপাহসালারের এবং সিপাহসালারের উপর সেনানায়কদের আস্থা ছিল, তাই রাজা গোপীর সেনাবাহিনী কোনরূপ লড়াই ব্যতিরেকেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। এর পর মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর সামরিক গতিবিধিকে স্বীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে এমনই গোপন রাখেন যে, যখন তিনি তাঁর ফৌজ নিয়ে রাজা জয়চান্দ এবং তাঁর সহযোগী রাজা রাসেলের দিকে অগ্রসর হন, তখন তারা উভয়েই এই আকস্মিক হামলায় পর্যুদস্ত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম, আলেকজাণ্ডার এবং নেপোলিয়ন

যোগ্যতার দিক দিয়ে উপরোল্লিখিত তিনজন জেনারেলকে আমরা একই কাতারে দেখতে পাই। তিনজনই নিজ নিজ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, নির্ভীক, দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী এবং বীর অধিনায়ক ছিলেন। ভয় তাঁদের কাছে ঘেষতেই পারত না।

মহান আলেকজাণ্ডার

সৌভাগ্যবশত আলেকজাণ্ডারের নিকট তাঁর পিতা ফিলিপ সর্বোত্তমভাবে শিক্ষিত একটি ফৌজ এবং ধনসম্পদে পরিপূর্ণ একটি রাজকোষ রেখে গিয়েছিলেন। সম্রাট ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত ছিল এবং তাদের অন্তর ছিল দেশপ্রেমে ভরপুর। আলেকজাণ্ডারের সাথে দার্শনিক শ্রেষ্ঠ এ্যারিস্টটলের মত পরামর্শদাতাও ছিলেন। গ্রীকদের মনোবলও ছিল বিরাট। কিন্তু শেষাবধি অনেকগুলো বিজয়ের পর আলেকজাণ্ডারের ফৌজ তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আলেকজাণ্ডারকে পাশ্চাত্য বিশ্ব 'মহান আলেকজাণ্ডার' উপাধি দিয়েছে বটে, তবে এমন একজন জেনারেল—যিনি তাঁর ফৌজকে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা থেকে সরিয়ে

www.almodina.com

রাখতে অক্ষম—তিনি কি করে 'মহান অধিনায়ক' উপাধি পেতে পারেন, তা অবশ্যই বিবেচনাসাপেক্ষ।

হতভাগ্য নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারের চাইতে বেশী প্রশংসা পাবার যোগ্য। কেননা উত্তরাধিকারসূত্রে না তিনি অর্থ-বিত্ত পেয়েছিলেন, না পেয়েছিলেন সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত ফৌজ। তাঁর জাতিও সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ছিল না। তবে তাদের মধ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতি হবার মত আবেগ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল।—আর সেজন্য নেপোলিয়ন অল্প সময়ের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত ফৌজ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই ফৌজের মাধ্যমে বিজয়ের পরিধি বিস্তৃত হবার সাথে সাথে সমগ্র জাতি সম্পদশালী হয়ে ওঠে। ফলে তাদের মধ্যে আরামপ্রিয়তা দেখা দেয়। এমনকি স্বয়ং নেপোলিয়নও বিলাসপরায়ণ ও আরামপ্রিয় ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হন। তাঁর এই আচরণ অধীনস্থ লোকদেরকে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত করে তোলে! আস্তে আস্তে অধিনায়ক বৃন্দ এবং তাদের সৈনিকেরাও প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত হয়। তারা তাদের প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা পূরণের নিমিত্তে লুটপাট এবং অন্যান্য দুষ্কর্মে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

নেপোলিয়ন দিগ্বিজয়ী তৈমুরকে অনুকরণ করতে গিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করেন এবং মস্কো পর্যন্ত রাশিয়ানদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যান। কিন্তু প্রাকৃতিক দুশমন—সর্দি ও বরফপাত—তাঁর আরামপ্রিয় ফৌজের কাল হয়ে দাঁড়ায়। ৭৫ বছরের বৃদ্ধ তৈমুর বরফ-গুলীর তীব্রতা সহ্য করতে পেরেছিলেন, কিন্তু যুবক নেপোলিয়ন ও তাঁর ফৌজ তা সহ্য করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন।

সেজন্য আমরা নেপোলিয়নকে 'মহান শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক' হিসাবে মেনে নিতে পাশ্চাত্য বিশ্বের সঙ্গে একমত নই।

মহান বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম

এবার মুহাম্মদ বিন কাসিমকে দেখুন। তিনি মাত্র কয়েক হাজার মুজাহিদ, যারা বিভিন্ন কারণে জিহাদ পরিচালনার অনেকগুলো

www.almodina.com

সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল—সঙ্গে নিয়ে জিহাদে বের হয়েছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম সেই যুগে অধিনায়ক হন—যখন ইসলামী বিশ্ব ছিল একটি বিরাট বিপ্লবের শিকার। মুসলিম খলীফা খুবই কষ্টের সঙ্গে তাঁর দেশবাসীকে সঠিক পথে এনেছিলেন বটে, তবে সঠিক অর্থে শান্তি-শৃঙ্খলা তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মুহাম্মদ বিন কাসিম বিভিন্ন স্থান এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে মুজাহিদ সংগ্রহ করেন। তিনি তাদেরকে কেবল সামরিক প্রশিক্ষণই দেন নি—বরং সঠিক অর্থে তাদেরকে মুজাহিদরূপে গড়ে তুলেছিলেন। আর তাও করেছিলেন মাত্র কয়েক মাসের ভেতর। তাঁর নিকট টাকা-পয়সা ছিল সীমিত। ছোট একটি বাহিনী নিয়ে দূর-দূরান্তরে যাত্রা। শত্রুদেশের বাসিন্দারাও ছিল তাঁর কটর শত্রু। কেননা তারা মুসলমানদেরকে ম্লেচ্ছ ও অপবিত্র জ্ঞান করত। এতদ্‌সত্ত্বেও এই মহান জেনারেল কেবলমাত্র একজন বিজেতার ভূমিকাই পালন করেন নি—বরং আঁ হযরত (সা)-এর সত্যিকার শাগরিদ হিসাবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি দুশমনকে কেবল নৈতিক ও পার্থিব দিক দিয়েই পরাজিত করেন নি, বরং মানসিক দিক দিয়েও পরাজিত করে তাদেরকে আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সংশ্রবে এসে সিন্ধুর অনেক অধিবাসী নিজে থেকেই মুসলমান হয়ে যায়। এভাবে ইসলামের সাথে তাদের চিরন্তন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ছায়াতলে তারা দলে দলে আশ্রয় নেয়। এ কারণেই আমরা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে বিশ্বের মহান শ্রেষ্ঠ অধিনায়কদের মধ্যে গণ্য করি। বিজয় তাঁকে আত্মগর্বী ও উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত করতে পারেনি, সম্পদ তাঁকে বৈষয়িক করে তুলতে পারেনি, প্রবৃত্তি তাঁর উপর শাসন চালাতে পারে নি; বরং বিজয় যতই তাঁর পদ চুম্বন করেছে, ঈমান ও আমলের দিকে দিয়ে তিনি ততই উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছেন এবং একজন নজীরবিহীন মু'মিন হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শেষাবধি তিনি দুর্ভাগ্যজনক পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু যখন তাঁকে বন্দী করা হ'ল এবং নিজের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি স্থির নিশ্চিত হয়ে গেলেন—এমন মৃত্যু যা ছিল বিনা দোষে

www.almodina.com

এবং অকারণে—তখনো এই মর্দে মুজাহিদ তাঁর এতটুকু অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি, অভিযোগের একটি বাক্যও তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় নি ঃ বরং এরূপ ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন ঃ

"লোকে আমাকে নষ্ট করে দিল। কোন্ যুবককে নষ্ট করল? সেই যুবককে যে তাদের বিপদের দিনে কাজে লেগেছিল এবং সীমান্তের দৃঢ়তা বিধানে যে ছিল উপযোগী।"

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি'উন।

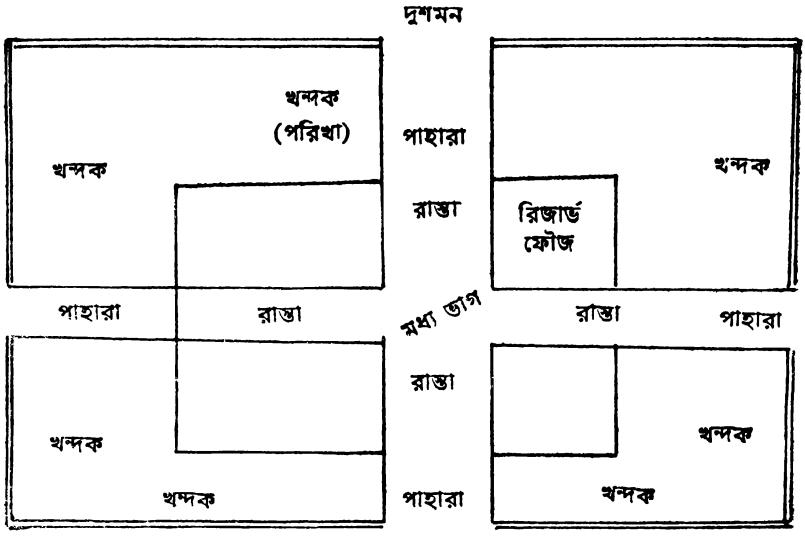

বি. দ্র. ঃ উপরের চিত্রটি বর্তমান পুস্তকের ৫২ পৃষ্ঠার "ছাউনী এবং পদ্ধতি" শিরোনামের অধীনে ১ম প্যারার নীচে যাবার কথা ছিল। ব্লকটি যথাস্থানে দিতে না পারায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। পাঠক আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা করবেন বলে আশা করি। —অনুবাদক।

www.almodina.com

নির্ঘণ্ট

নাম

অ

অকিনলেক, জেনারেল ১৪১

আ

আইজেন হাওয়ার, জেনারেল ৪৮, ১২৮, ১৩১, ১৩২

আবূ বকর (রা), হযরত ১৫, ২২, ২৬, ৪৫, ৪৯, ১৪৫, ১৬২, ১৬৫

আবূ সাবির হামদানী ১০৮

'আবদুর রহমান বিন আশ'আছ ৫৬

'আবদুল 'আযীয (ইব্ন মূসা) ১১২

'আবদুল মালিক, খলীফা ১৮, ৫৪, ৫৫, ৬০, ১৬৭ (ইব্ন মারওয়ান)

'আবদুল্লাহ বিন ছাকাফী ১০৬

'আবদুল্লাহ বিন যুবায়র ৪০, ৫৪

'আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা ১৩৯

আলাফী, মুহাম্মদ ৭৮, ৮২

'আলী (রা), হযরত ২৫, ৪২, ১৬৬, ১৬৭

আলেকজাণ্ডার, সম্রাট ৩, ৪, ১০, ৪৩, ৬২, ৬৩, ৭২, ৭৩, ১৩০, ১৩১, ১৯৫, ১৯৬

আলেকজাণ্ডার ক্লিফোর্ড ১৪১

আঁ-হযরত (সা) ১৪, ১৫, ১৮, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১২৪, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৬, ১৬২, ১৬৩, ১৮৮, ১৯৭

ই

ইবনে 'আমের ৭৭

ইবরাহীম বিন 'আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন 'আলী, ইমাম ৪৩

ইমদাদ উদ্দীন মুহাম্মদ (বিন কাসিম) ৫৪

ইয়াহইয়া বিন যার' ২০

ইঙ্গারসোল, জেনারেল ১৩১

ঈ

'ঈসা বিন মূসা ৪৩

www.almodina.com

উ

উইলস হেগ ১৬১
উইলিয়াম ম্যুর ১৬১
'উছমান (রা), হযরত ৫০, ৭০, ১১৫
উছমান বিন 'আস ৭৭
'উবায়দুল্লাহ ৫৭, ৮২
উমর/ওমর (রা), হযরত ১৬, ২০, ২২, ২৪, ২৭, ৪৯, ৫০, ৭৭, ৯৬, ১১৫, ১২৫

এ

এ্যারিস্টোটল ১৯৫

ও

ওমর ইবন মুহাম্মদ (বিন কাসিম) ৯৬
ওয়াল্টার অব একবূরী, নাইট ১৩৪
ওয়ালীদ বিন 'আবদুল মালিক ৫৯, ১১১, ১৬৭

ক

কক্ক, রাজা ১০৯, ১১০
কাইজার, সম্রাট ৫
কাকা, রাজা ৭৪, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০৫, ১০৬, ১০৮
ক্যানিংহাম, জেনারেল ১৪১
কালিংকুস ৪০
লর্ড ক্লাইভ ১২৫
কিচেনার, লর্ড ১২৫
কুতায়বা বিন মুসলিম ৫৬, ৫৭, ৫৮,৭৯, ১১২,১৬৭

খ

খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ ১৪, ২৮, ৪৪, ৪৫, ১৩৯

গ

গোপী, রাজা ৮১, ১০২, ১০৫, ১৩১, ১৯৪, ১৯৫

চ

চন্দ্র, রাজা ৬৪, ৭৩
চাচ, রাজা ৬৩, ৬৪, ৭৩
চাবিলানী, এম. পি. ৯৬
চিয়াং-কাই-শেক, মার্শাল ১৪৭

জ

জওয়াহিবাহ ৯৩
জয়চান্দ, রাজা ১৩১
জয়সিংহ, রাজা ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৭, ১০৯
জা'ফর (রা) বিন আবূ তালিব ১৩৯
জাহিম (বুদ্ধ), রাজা ৬৪, ১০২, ১০৭, ১০৮

ট

টুকার, জেনারেল ১৩৬, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩

ড

ডি. জয়েন ওয়েল ১৩৩, ১৩৫

www.almodina.com

ত

তারিক, জেনারেল ১২৩, ১৪৬
তৈমুর লং, সুলতান ১৪৬, ১৯৬

থ

থিওডোর, বাদশাহ ১৬০

দ

দারা, রাজা ১৩০, ১৩১
দাহির, রাজা ৩০, ৩১, ৫০, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১৭, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১১৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৭, ১৩৯, ১৪২, ১৪৭, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬৬, ১৯৪

ন

নবী করীম (সা) ১৮৭
নেপোলিয়ন, সম্রাট ৪৫, ৪৬, ১১৬, ১২০, ১২৬, ১৪০, ১৪৮, ১৫০, ১৫৮, ১৯০, ১৯৫, ১৯৬

প

পুরু, রাজা ৩, ৪, ১০

ফ

ফকীর ই. পি ১৪৯
ফ্যারাডিয়া ভোলো ১৪৮
ফির'আওন, রাজা ৯
ফিলিপ, রাজা ৩, ৯, ১০, ৩৭, ৪৩
ফুলার, জেনারেল ১১৯, ১৩১, ১৩২, ১৪০, ১৪১
ফীব্‌স ১১৯
ফেনি, রাজা ৭৫
ফো, জেনারেল ১৫৯

ব

বজ্র, রাজা ৭৩, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১১০, ১২৭, ১৪৬
বাহরাম গোর, শাহযাদা ৬৩
বিজওয়া, রাজা ৬৪
বুদ্ধ, রাজা ৬৪
ব্যাল্‌ফ, জেনারেল ১৫০
বুদায়ল ৭৮
বেট, রাজা ১৯৪

ম

মলিটিকে, জেনারেল ৫
মহত্ত, রাজ ৬৪
মাড, জেনারেল ১২৬
(আল)-মামূন, খলীফা ১৬৬
মালিক আশতার, গভর্নর ১৬৭, ১৬৮
মালিকুস-সালিহ ১৩৫
ম্যাসিনা, জেনারেল ১৪৮
মাহমূদ গযনবী, সুলতান ৬৩, ৬৬, ৭২

www.almodina.com

মু'আবিয়া (রা), আমীর ১৮, ২১, ২২, ৪৯, ৫০
মুক্কা, রাজা ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১১৮
মুস'আব ইব্‌ন উমায়র ২৫
মূসা বিন নুসায়র ১১২, ১৪৬, ১৬৭
মুহাম্মদ (সা), হযরত ১৬৪
মুহাম্মদ বিন কাসিম ৮, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৮, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৭, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬৬, ১৬৭, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭
মুহাম্মদ বিন যিয়াদ ১০৮
মুহাম্মদ বিন হারূন ৭৮, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯
মুহাল্লাব বিন আবী সফরা ৭৮

য

যায়দ বিন হারিছা ১৩৯

র

রবার্টসন, ফিল্ড মার্শাল ১৬১
রসূল (সা) ১৫, ২৬, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৪
রসূল আকরাম (সা) ২৯
রসূল করীম (সা) ৪২, ১১৪
রসূলুল্লাহ (সা) ১৬, ২৫, ৩৭, ১৮১, ১৮৪
রাজা, সেনাপতি ৯৫
রাণী বাঈ ১০৯
রামচন্দ্র, রাজা ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১২৭
রায় সহিংস, রাজা ৬৩, ৬৪, ১০৫
রাসেল, রাজা ১৯৫
রূহ ইবন যানবাগ ১৮, ১৯
রোমেল, জেনারেল ৪৮, ১২৭, ১৪০, ১৪১, ১৪২

ল

লিড্‌ল হার্ট ১১৩, ১১৮, ১৩৬

শ

শুজা'উদ্দুর, শাহযাদী ৩৮, ৩৯, ১৩৫
শুদ্ধানী, রাণী ৬৪
শুয়ারেঙ্গ ৪১

www.almodina.com

স
সলীম, সুলতান ১৪৬
সাঈদ বিন আসলাম বিন যুর'আ ৭৮
সাগ্নিজ ৬৪
সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ৩৩
স্টালিন, মার্শাল ১২৮
সিপাহি সিংহ ৮৬
সুমানা, রাজা ৬৪, ৭০
সুলায়মান, সর্দার ৭৮
সুলায়মান বিন 'আবদুল মালিক, খলীফা ৫৯, ১১১, ১১২
সেন্ট লুই, সম্রাট ১৩৩, ১৩৫

হ
হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ১০১, ১০৪, ১১১, ১১৩, ১১৫, ১৪৭, ১৬০, ১৬১, ১৬৭
হ্যানিবল, সম্রাট ৪, ৫, ৬, ১১৯
হাবীব বিন মাসলামা ১৬৫
হারূনুর রশীদ, খলীফা ১৬৬
হিকমত খান, সুবেদার ১৫৪
হিটলার, চ্যান্সেলর ৪৮, ১১৯, ১২০, ১২৮, ১২৯, ১৩৮, ১৬৫
হুসায়ন বিন নুমায়র ৪১
হেনরী উইলসন, স্যার ১৫৯
হেগ, জেনারেল ১৬৬

য়
য়াযীদ বিন মুহাল্লাব ১১১
য়াযীদ বিন আবী সুফিয়ান ৪৯

স্থান

অস্ট্রিয়া ১২৬
আউজ ৬৫
আগোর (বন্দর) ৮৬, ৮৭
আফগানিস্তান ১৫৫
আফ্রিকা ১৪০, ১৪৬
আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) ৫০, ১৬০
আরব ১২৩
আরমল (দীবেজী) ৭২
আরমাঈল ৫৩
আরমান ১১৬
আল্লাহ রাখখো ১০৫
আল-আলামিন ১২৭
আলেকজান্দ্রিয়া ২৫
আলোর (আরোর) ৬৪, ৬৫, ১০৯, ১৩১, ১৩২
আস্কা ৬৭
আসহিয়ার ১০২
অ্যাসিরিয়া
আহওয়ায ৫৩
ইউ. পি. ৩৫
ইউফ্রেটিস (ফোরাত) ১২৬
ইযবেলা ১৩০
ইয়ারমুক ১৩০

www.almodina.com

ইরাক ১৭, ২৫, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬৭, ৭১, ৮২, ১০১, ১১১, ১১৭, ১২৪
ইরাক-এ আরব ১২৬
ইরান (পারস্য) ১২, ২২, ২৫, ২৮, ৩৬, ৬৩, ৬৭, ৭১, ৭২, ৭৭
ইশতিহার ৬৫
ইশহার ৭৪
ইংল্যাণ্ড ১২০, ১৫৯, ১৬০
উহুদ ১১৭
ইংলিশ চ্যানেল ১২৮
এশিয়া ৪০, ৬২, ১৫০
ওয়াজিরিস্তান ১৪, ১৪৯, ১৫০
ওয়ারকা ৬৭
ওয়াহ ৭৪
কচ্ছ উপসাগর ৭২, ৭৪
কনস্টান্টিনোপল ৪০
কমর কুন্দ ৬৭
কাথিয়াওয়াড় ৭৫, ৭৬, ১০৯ ১১১
কান্দাহার ৬৭, ১০১
কাবুলিস্তান ১৬৬
কাথিয়াওয়াড় ৬৬
কারওয়ার ৬৫
কালাত (খফদার) ৫৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭২, ৭৮
ক্যালব্রিয়ার ১৪৮
কেপমুনয় ৬২
কোয়েটা ৫৩, ৬৭, ৭২, ৭৩, ৮১
কাশ্মীর ১৪৩
কাশ্মীর দক্ষিণ
কাশমূর ৬৬, ৯৫
কাসবেলা (লাসবেলা) ৮৪
কাসর কান্দ ৫৩, ৬৭
কিরমান ৬৭, ৭৭
কীন ৪
কীষ ৫৩
কীষ মাকরান বা কীষে কিওয়ান ৬৭
কুফা ১৬, ১৭, ২২, ২৫, ৫৬, ৫৮, ৭৭
কুস্ত ৬৫, ৭৩, ৭৪, ১০০
কুষপুর (পাঞ্জগোর) ১১৫
কুরিওয়াহ ৮৪, ৮৫, ১১৫
কেল্লাবন্দ ৭৫
কোটরী ৭৩
কোটাল ৭৪
খন্দক ১১৭, ১১৮
খফদার (কালাত) ৯৭
খাওয়ারিযম ৫৬. ৫৮
খায়বার (গিরিপথ) ৩৭, ৭৮
খায়ের পুর ৭৪
খার্ক উপদ্বীপ ৫৭
খারান ৬৩
খুরাসান ৫৬, ৬৬, ১৬৬
গঙ্গা অববাহিকা ৯৭
গীলানাই ১৫৪
গ্রীস ৩৭
গুজরাট ৭৫, ৭৬
গোরী ৭৪
গোঙ্গ নদী ১০১

www.almodina.com

ঘারো (নদী) ৭২, ৭৩
চাচপুর ৬৫
চিতোর ৬৪
চিনান ৬৭
চীন ৫০, ৫৮, ১৪৭, ১৬০
চুনা ৯৭
জয়পুর (কুযাজ) ৭৪, ১০৭, ১১১, ১২৯, ১৩০ ১৩১, ১৩৩
জঙ্গশাহী ৯৬
জ্যাকবাবাদ ৬৩, ৬৬
জাজপুর ৬৫
জাবীল ৪৯
জার্মানী ৫, ৬, ৭, ৩১, ৩৮, ৪৬, ৪৮, ১২০ ১৩২, ১৩৭, ১৩৮ ১৪৭, ১৫৬, ১৫৯
জাহম্ ৭৪
ঝানকান ৬০
ঝিলাম ১১১, ১৪৩
ঝুমপির ৯৬
টাইগ্রীস (দজলা) ১২৫
ঠাঠ ৭৪, ১০১
ডেনমার্ক ১৩৭
ডোহিস্ত
তন্দাবীল ৭৪
তবুক ২২
তাবিলিস্তান ১৬৬
তিউনিস ৫০
তিব্বত ৬৩
ত্রিবিয়া ৪
তিরাখিল ১৪৪
তুব্বা ১৩
তুর্কমান ১৪৯
তুর্কিস্তান ৫৬, ৬০ ৭৮
তুরস্ক ১২৬
তুরান ৬৫, ৬৬, ৭৩, ৯৫, ১০২, ১১৫, ১২১, ১২৭
দহলীলা ৭৫, ১০৯
দাদু ৬৩, ৬৬, ৭৩
দামিশ্‌ক ৫৯, ৬০, ৮২
দারা ৪৬
দুহালিয়া ৭৩
দেবল ২৬, ৩৮, ৫৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭২, ৭৭, ৭৯, ৮৩, ৮৪, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১১৫, ১২১, ১২৩, ১৪৩, ১৬৪
নওমা শহর ৫৩
নওয়াবশাহ ৭৪
নগর পারকার ৭২
নাজরান ১৬৪
নায়ার কোট ৯৭
নারা নদী ৬৭, ৭২, ৭৫, ৮৯
নারানী (নারায়ণ) ৭৪
নীম ৫৩
নীরূন/নীরূন কোট ৬৪, ৬৫, ৭৩, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১২১, ১২৩, ১২৭, ১৪৩
নেপাল ৩৫
পঙ্গ গোর ৬৭, ৭১
পহলপুর ৬৭

www.almodina.com

পাকিস্তান ৭১, ১২৫, ১৪৪
পাটালা ৬২
পুঞ্জ ১৪৪
পেশাওয়ার ৬৫
ফাহরাজ ৫৩
ফ্রান্স ৬, ৪৮, ১২৫, ১২৯, ১৩৩ ১৩৭, ১৩৮, ১৪৮, ১৫৯, ১৬০
ফুরাত (নদী) ২৫
ফেজপুর ৬৭
ফিনল্যাণ্ড ১৪৭. ১৫৭
ফিরোজপুর (ভাজপুর) ১৭১
বদর ২৫, ১১৪ ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১৪৬
ব্রহ্মাপুর ৬৫, ১১১
বর্মা ৬৩, ১৩৮
বসরা ১৬, ২২, ২৫, ৫৩, ৫৭, ৬০, ৬৬, ৬৭, ৭১, ৭৮, ৮২, ৮৩, ১২১, ১২৩, ১৪৭
বাগদাদ ৬৭
বাজান ৯৮
বাগরুর ১০২
বান্দ ১৪৯, ১৫০
বাবিয়া ৭৬, ১০৯, ১১০
বাবীনা ৬৫
বাবীহ ৬৪
ব্রাহ্মণাবাদ ৬৫
বায়তুল মুকাদ্দাস ১৩৩
বায়রুত (বৈরুত) ৪৯
বার্লিন ১২০, ১৩১, ১৩২
বাহমনাবাদ (বাহমনওয়া) ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৫, ১০৬, ১০৯, ১৩১, ১৩২
বাহরাইন ৭২
বাহারো ৭৫, ১০৯
বিপাশা (নদী) ৬৪
বীর শিফারজান ১৪১
বুঘ ৬৫
বুদ্ধিয়া ৬৫, ৬৬, ৭৪, ১০২, ১১৫, ১২১, ১২২, ১২৭
বৃটেন ৭, ১২৫, ১৬০
বেট ১০২, ১০৩
বেলজিয়াম ৬, ১৩৭
বেলা ৫৫, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯১, ৯২, ৯৪, ১১৪, ১১৬, ১২১, ১৪৩
বেলুচিস্তান ৫৩, ৬১, ৭২, ৭৩ ৮১
ব্যাবিলন ৯
বোম্বাই ৭৭, ৮৩
ভারতবর্ষ ৩, ১০, ২৮, ৩৫, ৫৬, ৫৮, ৬২, ৬৬, ৭৭, ১২৫, ১৫৩
ভীলম্যান ৭৬, ১১১
ভুট্টো ১০১
ভূমধ্যসাগর ৫০, ১২৯
ভেট ৭৪
মদীনা ১৫, ২৫
মনসুরা ৯৬, ১৩৩, ১৩৫
মন্টেঙ্গরো ১৪৮

www.almodina.com

মস্কো ১২০, ১৯৬
মাকরান ৫৬, ৬৩, ৬৫, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৪, ৯৫, ১১৫
মাদায়েন ২৫
মারহু ১০৫
মারী ১৪৩
মালুম ১০৬
মিঠাল ৭৫
মিথিলো ৬৫
মিসর ১৭, ২২, ২৫, ৩৮, ৫০, ৬০, ১৩৩, ১৬৭
মিহরান ৬২, ৬৫
মীর আলী ১৪৯
মীরখাস (মীরপুর খাস) ৭৫
মীরপুর সাকরো (সাকেরাহ্) ৭৪, ১০৫
মুখ্যাপত ৬৫
মুতা ৪৪, ১৩৯
মুলতান ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৫ ৭৬, ১১০
মেদ-এর পুল (শুক্কুর) ৭৫
মেসিডোনিয়া ৯
যুল-কিস্‌সা ৪৯
য়ামান ১৭, ১৮৪
য়ুরোপ ৪০, ৬২, ১১৯, ১২৯ ১৩৮, ১৪৩, ১৪৮
রাইন নদী ৪৮
রাওর ৭৫, ৮০, ৮১, ১০৭, ১১১
রাওয়ালপিণ্ডি ১৪৩
রান অব কচ্ছ ৭২
রাশিয়া ১২০, ১২৮, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৬, ১৯৬
রিওয়া ২৮
রিযমুক ১৪৯, ১৫০
রেজিয়ান ৬৫
রোম ৫, ১২, ৩৬
রোহড়ী ৭৫, ৮০
লণ্ডন ১২০, ১৮৮
লাওয়ান ৬৭
লাক চৌকী ৯০, ৯১
লাখনৌ ৩৪
লাসবেলা (কাসবেলা) ৬৩, ৬৪
লাহরাজ ৯৭
লোহিত সাগর ৯
শতদ্রু (নদী) ৬২, ১১০
শাম ৭৮
শাহদাদপুর
শিখা ৭৬
শীরায ৫৩, ৭১, ৮২
শ্রীনগর ১৪৪
শ্রীলংকা ৫০, ৭৯
শুক্কুর বাধ ৭২
সহওয়ান ৬৪, ৯৬, ৯৭, ১৪৩
সাইপ্রাস ৫০
সায়দা ৪৯
সাহবন ১০৫
সালুজ ১০১
সিক্কা ১১০, ১৩১

www.almodina.com

সিন্ধু ৫৮, ৫৯, ৬০ ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১৩১, ১৪২, ১৬০, ১৬১, ১৬৬
সিন্ধুনদ ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৮০, ৯৬, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৮, ১৬৬, ১৯৪
সিফ্‌ফীন ৪২
সিবী ৬৪, ৬৫, ৭৪, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১২৬, ১২৭, ১৪৩, ১৪৬
সিরিয়া ২২, ৪৯, ৬০, ৬৫, ৬৭, ৮২
সীম অথবা সিববী ৭৪
সীরজান ৫৩
সীলন (সরন্দীপ) ৭৯
সুওয়ারিয়া ৬৫
সুকরালীদ ৭৫-৮০
সুখাকুর্দ ৬৫
সুময়ানী ৯৩
সুমাসন ৭৫
সুরনা বেট ১০১
সুস্তান ৬৫, ৭৩, ৭৭, ১০২, ১১৫, ১২১, ১২২, ১২৭
স্কালিন্দা ৬৫, ৭৫, ১০১, ১০৯, ১৩১
সেকেন্দ্রা ৪৬
স্পেন ১১২, ১২৩
সোমনাথ ৬৩, ৭২
সোরাই, হ্রদ ৬৫
হল্যাণ্ড ৬
হায়দরাবাদ ৭৩, ৯৬
হাস ৬৫
হিন্দ ৬৫
হিন্দুস্তান ১৪৪, ১৬৬
হিলিয়ান (বল্কান) ৯৮
হিস্‌ন-ই-বাবেল ২৫
হীরা ১৩
হুদায়বিয়া ১১৭, ১১৮
হেজায ১৭, ৫০, ৫৫, ৭৯

গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠি

আনসার ১৫, ২০, ২৫, ৪৭
আবুল কায়স ১৬
আব্বাসী ৪৩
আমেরিকান ১৩১
আরব ১৩, ২৪, ২৫, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪১, ৫১, ৫৬, ৫৮, ৬৬, ৭০, ৭১, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০৪, ১০৭, ১০৯, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৯, ১৪৭

www.almodina.com

আলজিরীয় ১৫৮
ইটালীয় ১১৯
ইয্‌দ ১৬
ইরানী বা পারসিক ১১, ১৩, ২৬, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৬২, ৬৩, ৮৫, ১৩০, ১৩১
ইংরেজ ৪৬, ১২৬, ১৫০, ১৫৯, ১৬০
কায়স ১৬
কার্থেযীয় ১১৯
কিনানা ১৬
কুরায়শ ১৬, ২১, ১১৮
খাছআম ১৬
খার্বু ৭৯
খুরাসানী ২১, ৩২
গুযর ১১১
গুর্খা ১৪৯
গোরা ১৪৯
গোদরহন ৬৩
গ্রীক ১১, ১২, ৩৭, ৪৩, ৬১, ১৩০, ১৩১
জাট ৬৩, ৬৭, ৭২, ৯৭, ১০২, ১০৫, ১০৭, ১২২, ১২৩
জার্মান ১২৮, ১২৯, ১৪০. ১৪২
ঠাকুর ৯৭, ৯৮, ১০২, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১২৩, ১২৬
তাবিঈন ২০
তামীম ১৬
তুর্কমান ১৪৯
তুর্কী ২১, ৮৫, ১২৬
পাকিস্তানী ১৪৪
পাঠান ৮৫, ১৪৭, ১৪৯
ফরাসী ১৩৩, ১৪৮, ১৫৮, ১৬০
ফিনিসীয় ৩৭
ফিরআওনী ২১
ফিরিঙ্গী ৪১
বকর ১৬
বনী 'আদনান ১৭, ২১
বনী 'আবদির রহমান ৪৭
বনী 'আব্বাস ২৩
বনী 'আমর ৭৮
বনী 'উবায়দুল্লাহ ৪৭
বনী উমাইয়া ১৬, ১৭, ২৯, ২২, ২৩, ২৪, ৩০, ৫৫, ৫৬, ৬০
বনী কাহতান ১৭, ২১
বনূ হাকিম ২১
ব্রাহ্মণ ৯৯, ১১৭, ১২২, ১২৪
বৃটিশ ৮৩, ৯৭, ১১৮, ১২০, ১২৫, ১৩১, ১৩৬, ১৪১, ১৪২, ১৪৬, ১৪৯, ১৫৯
ভারতীয় ১৩, ২১, ২৬, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৫৩, ৬৩, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ১২৫, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৯, ১৫০, ১৫৯
ভীল ১১১
মামলূক ১৫৮.
মায়দ ৯৭, ১০২, ১০৭, ১২২, ১২৩
মীরাঠা ১২৫, ১৫৯
মারীভাগটি ৫৩
মার্কিন ১৪৬
মুনযির ১৩

www.almodina.com

মুযায়না ১৬
মুহাজির ১৫, ২০, ৪৭
মূর ১৪৮
মিণ্ড ৬৩, ৬৭
মিসরীয় ৪০, ১৩৪, ১৩৫
মেহমন্দ ১৫৩, ১৫৪
মোগল ৮৫, ১২৫, ১৬০
য়ামনী ৩২, ৩৩
রাজপুত ৬৩,৯৯, ১১৭, ১২২, ১২৪
রাশিয়ান ৩৮, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৭, ১৯৭
রুশ ৩১ ১৪৮, ১৪৯, ১৯৬
রোমক ১১, ১২, ২৬, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪৩, ৪৯, ১১৯
লোহানা ৬৪, ৭৫
সাসানী ৬৩
সিন্ধী ৬৮, ৬৯, ৭০, ১০৩, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৫৭
সিরীয় ৩২, ৩৩, ৪০, ১৩৬
সুজায়লা বা সুখায়লা ১৬
স্পেনিশ ১৪৮
হিন্দী ফৌজ ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০৫, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২৯, ১৩৯, ১৪৭, ১৬৫
হিন্দুস্তানী ১২৫

সামরিক পদ

অধিনায়ক ৯৩, ৯৯, ১০৩, ১১৪, ১১৮, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৪১, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৫, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৯০, ১৯১, ১৯৩ ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬
আমীর ২২, ৪৩
আমীর-ই-ইসবা' ২৩
আর্মার্ড ১২৫
আরীফ ২২, ২৩
আস্পাহাদ ১২
এডমিরাল ১৪১
কমাণ্ডার ৪৮
কমাণ্ডার-ইন-চীফ ২৩, ৪৮, ১৬১
কুমতারাহ ১১
কর্নেল ৬৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৮৯, ১৯১, ১৯২
কূস ১১
জেনারেল ৫, ৮, ৪৯, ৫৬, ৫৭, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২০, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৬০, ১৯১, ১৯২, ১৯৫, ১৯৭
তীরন্দায ২৯, ৪০, ৯০, ১০৮
তুনজারিয়া ১১
তুমার খান ১১
দামরাখ ১২
নকীব ২৩
নাইট ৩৩, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫
নাশশাব ৩০
ফীল্ড মার্শাল ১৬১
বাৎরীক ১১

www.almodina.com

মারযুবান ১২
মীর-ই-মীরান ১২
মুন কাসিব ২২
রীমাতুল হাদাক ২৯
সিপাহসালার ২, ৩, ৪, ৫, ৭ ১২, ১৪, ২৬, ৪৫, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৪, ১০২, ১১৮, ১২৯, ১৩০, ১৩৫, ১৩৯, ১৪০, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫৭, ১৮১, ১৯১, ১৯২
সুপ্রীম কমাণ্ডার ৪৮, ১২৮
সুবেদার ১৫৪
সেনাধ্যক্ষ ২৩, ৯৪
সেনানায়ক ২২, ২৩, ৪৮, ৮৬, ৮৭, ৯১, ৯৯, ১০৩, ১১২, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৮৯, ১৯১, ১৯৩
সেনাপতি ৬, ৪৮, ৬৮, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ১১২, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১২৯, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৬১, ১৭৫, ১৮৯
ব্যারণ ১৩৫
ব্রিগেডিয়ার ১৪৫, ১৫৪

অস্ত্রশস্ত্রের নাম

অগ্নিগোলক ৫০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫
আগুন বোমা ১৩৬
আছম ৮৩
আবনীন ৩৪
আস্তাম ৫১
'উরূস ৩৮, ৯৩, ১২১
উড়োজাহাজ ৩১, ১৫৪
এটম ৭
কাবৃশ ৩৯, ৪০, ১১০, ১৩৪
কামান ১২, ১৩, ৩৮, ৫১, ১৪৯, ১৫৩
কালবালীব ৫১
খঞ্জর ৩৬, ৬৮
খোখরী (গুর্খা খঞ্জর) ১৫২
খোদ ৫১
গুর্য ১২
গোলা ৯৩
গ্রীক অগ্নি ৪০
গুলী ১৫২
ট্যাংক ৭, ৩১, ৩৪ ৩৮, ৪৮, ৬৯, ১৩০, ১৩৬, ১৩৮, ১৪১, ১৪২, ১৫৬, ১৫৭
ট্রেঞ্চ মর্টার ৩৮
ঢাল ১২, ৩৫, ৫১, ৬৮
তলোয়ার ১১, ১২, ১৩, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪৯, ৬০, ৬১, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৮৩, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১০৪
তলোয়ার সুলায়মানী ৩৩
তীর ৪, ১২, ১৩, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৫১, ৬৮, ১০৮, ১৩৪
তুবরা ১২

www.almodina.com

তোপখানা ৭
দিলামন ৩৬
দুবাবা ৩৮, ৩৯, ৯৩, ১১০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫
ধনুক ১৩, ২৯, ৬৮,
নেযা ১২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৫৯, ৬৮
ফালা ৩৪, ৫১
flame thrower ৩৮, ১৩৬
বর্শা ৫১, ৫৯, ৬৮
বল্লম ১০, ১১, ১২, ১৩, ৩৬, ৪২, ৬৮
বোমা ১৫২, ১৫৫
বারুদ ৪১, ১৫২
বাসীকাফ ৫১
বায়দা ও মিদফার ৩৬
বিমান ৭, ৩৪, ৪৮, ১৩০, ১৩৬, ১৪৯, ১৫৬
ভালা ১০, ৩৫, ৫১, ৬৮, ১০৪
মর্টার ১৩৬
মলোটভ ককটেল ৩৮
মাহফুরা ৩৩
মিনজানীক ৭, ১০, ১২, ২৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫০, ৮৩, ৯৩, ১১০, ১২১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬
মুজার্রাত ৩০
মেরা ৫১
মেশিনগান ১৫৩
রাইফেল ৮৩
লিজাম ৫১
সাঁজোয়া মটর গাড়ী ৩১
সার্চলাইট গোলা ১৫৩, ১৫৫
সুয়ুফে আতীকা ৩২
হেলমেট ৩৬

রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক পদ

আমীর-উমারা ৯৪, ১১৩, ১৬৭
আমীরু'ল-মুমিনীন ১৬, ১৯, ৫৮, ৬০
কাযী ১৭৭
কাযী উল-কুযাত (চীফ জাস্টিস) ১৭৭
খলীফা ১৭, ১৮, ১৯, ২৭, ৩১, ৪৯, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৭৮, ৭৯, ১১১, ১৩৯, ১৬২, ১৯৭
খলীফাতু'ল-মুসলিমীন ৯৪
গভর্নর ৫, ৬, ১০২, ১১১, ১২২, ১২৬
বাদশাহ ১৩৫
মন্ত্রী ১৬১, ১৯৩
সচিব ১৭৯, ১৮০
সম্রাট ৫৫
সম্রাজ্ঞী ১৩৩

সামরিক পরিভাষা

আর্মার্ড কোর ১২৪, ১২৫, ১৪৯
Echelon ৪৪
কনভয় ১৫২
কম্যাণ্ড ১৪৪
combined operation
কাল্‌ব-আল-জায়্‌শ ৪৩
কোড ১৪৪

www.almodina.com

কোম্পানী ১৫, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯২, ১০৩, ১১৮, ১৩৭, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৯, ১৯১, ১৯২
গোলন্দাজ ইউনিট ৯৩
জেনারেল হেডকোয়ার্টার ১৬০
ট্যাংক রেজিমেন্ট ৯৭
পল্টন ১২৫, ১৪৯, ১৫৪
প্লাটুন ১৫, ৮৫, ৯০, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১২৮, ১৩৪, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৯, ১৯২
ব্যাটেলিয়ন ৭০
ব্রিগেড ১৫৪
মায়মানা ৪৩
মায়সারা ৪৩
মুকাদ্দামা ৪৩
সাকা ৪৩
Spear head ৪৮
Successive Attacks ৪৮
হাওয়াফা ৫০

গ্রন্থ

ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল ২৫
Cambridge History ১৬২
কুরআন মজীদ ১৬২
নিউ টেস্টামেন্ট ১৬২
বুখারী শরীফ ২২
মহাভারত ৩, ৩০
রসূলুল্লাহ (সা)-এর রণকৌশল ২৫
রামায়ণ ৩, ৩০
হাদীছে দেফা ২৫
হামারা দেফা ২৫

www.almodina.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

মেজর জেনারেল আকবর খান ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে বৃটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের একটি অভিজাত সৈনিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজা ফযলদাদ খান বৃটিশ সেনাবাহিনীর একজন মেজর ছিলেন। জন্মের পর প্রধানত নানীর কোলেই তিনি লালিত-পালিত ও বর্ধিত হতে থাকেন এবং এই নানীর মুখেই তাঁর পূর্ব-পুরুষদের শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব গাথা শ্রবণ করে বালক আকবর খানের মনেও সৈনিক হবার বাসনা জাগে। স্কুল জীবনে তিনি কয়েকবার সৈন্য বিভাগে যোগ দেবার প্রয়াস চালান। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের বাধা দানের ফলে তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অবশেষে তাঁর চেষ্টা ফলবতী হয়। সেনা-বাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারে তিনি পরিবারের সদস্যদের অনুমতি আদায়ে সক্ষম হন। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে তিনি রাজকীয় বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর অশ্বারোহী ইউনিটে ভর্তি হন। সে সময় অশ্বারোহী ইউনি-টের সদস্যদের অশ্ব, সাজ-সরঞ্জাম, ইউনিফর্ম, তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি নিজেদের সংগ্রহ করার নিয়ম ছিল। চাকুরী কালে কেবল একটি রাইফেল মাত্র দেওয়া হ'ত। ভর্তিকালে তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর কয়েক মাস মাত্র। এ বছরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। টেনিং শেষে তাঁকে ইরান ও ইরাক-ই-আরব রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। অতঃপর ১৯১৫ সালের সংঘটিত যুদ্ধে তাঁর অপরিসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'রাজকীয় কমিশন' লাভ করেন এবং বৃটেনের 'রয়েল ন্যাশনাল গ্যালারীতে' তাঁর ছবি স্থান পায়। অধিকন্ত তাঁর একই ইউনিটে সাধারণ সৈনিক থেকে অফিসার হিসাবে নিযুক্তি ছিল বৃটিশ বাহিনীতে একটি বিরল ও ব্যতিক্রমী ঘটনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর ১৯২০ সনে তাঁর ইউনিট মীরাঠ ছাউনিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২১ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর

www.almodina.com

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ভারত সফরে এলে তাঁকে সম্রাটের এডিকং নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী বছর (১৯২২ ইং) প্রিন্স অব ওয়েলস (ডিউক অব উইণ্ডসর) ভারতবর্ষে বেড়াতে এলে তিনি পুনরায় তাঁর এডিকং নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি যুবরাজের এডিকং লর্ডমাউন্ট ব্যাটেন (বৃটিশ ভারতের শেষে গভর্নর জেনারেল)-এর সঙ্গে প্রথম বার মিলিত হন। বৃটিশ ভারতের সিংহ পুরুষ বিখ্যাত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের (মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী) সঙ্গে এ সময়কার একটি সাক্ষাৎকার তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এ সাক্ষাৎকার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনায় বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে।

মওলানা মুহাম্মদ আলী এ সময় তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

"আকবর ! যে বীরত্বের জন্য তুমি গর্বিত, তুমি জান না, মুসলিম জাহানকে তা কতটা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। ১৯১৪-১৮ খৃস্টাব্দে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) তোমাদের কৃতিত্ব তোমার ও তোমার সহযোগী ভারতীয় সৈনিকদের জীবনের একটি সোনালী অধ্যায় বটে। কিন্তু এর একটি দুঃখজনক ও মর্মস্পর্শী দিকও রয়েছে। তোমাদের বীরত্ব আমাদের কাছ থেকে দু'টি সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। তা হ'ল ঃ

১. জিহাদী প্রেরণা--যা মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার ;

২. নিশান-ই-খিলাফত (খিলাফতের প্রতীক)—যার পতাকাতলে মুসলমানরা প্রয়োজনে এক হ'তে পারত।"

১৯২৬ সালে নওয়াব স্যার বুলন্দ জঙ্গ বাহাদুরের কন্যার সংগে আকবর খানের বিয়ে হয়। বিবাহানুষ্ঠানে মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মিঃ মোতিলাল নেহরু, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, ডাঃ যাকির হুসায়ন, স্যার যিয়াউদ্দীন মরহুমের সংগে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। ১৯২৮ সালে লাহোরে নওয়াব স্যার যুলফিকার খান এবং ইসলামের দার্শনিক কবি 'আল্লামা ইকবালের সংগে পরিচয় হয় লেখকের।

১৯৩৯-৪৫ সানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সংগে পালন করেন। এ সময় তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত

www.almodina.com

মেজিনিউ লাইন রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত মিত্র বাহিনীর অপরাপর সদস্যদের সঙ্গে বৃটিশ বাহিনীর অন্যতম সেনানায়ক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। জার্মান আক্রমণের প্রচণ্ডতার মুখে মেজিনিউ লাইন ভেঙে পড়লে বৃটিশ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে এবং আত্মরক্ষার্থে ডেনমার্ক হয়ে বৃটেনে গিয়ে হাযির হয়। অতঃপর ১৯৪২ সালে ছুটি কাটাতে তিনি জাহাজ যোগে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। পথে জাহাজ ডুবিসহ নৌযুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এরপর তাঁকে বর্মা রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। এখানেও তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধাবসানে ১৯৪৬ সালে তিনি মীরাঠ এরিয়ার এরিয়া-কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। এসময় তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত বৃটিশ জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস টুকার এবং জেনারেল কার্টিস। '৪৬ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষব্যাপী যে সাম্প্রদায়িক দাংগা সংঘটিত হয় তার ঢেউ ইউ. পি-তেও লাগে। ইউ. পি-এর দাংগা রোধে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের সময় তিনি পাকিস্তানের অনুকূলে স্বীয় খেদমত পেশ করেন। '৪৮ সনের কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতেও তিনি তাঁর অসীম সাহসিকতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। ক্রম-পদোন্নতির মাধ্যমে এ সময় তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। ৩৭ বছর সামরিক বিভাগে চাকুরী করবার পর তিনি ইসলামের সমর কৌশল ও প্রতিরক্ষা নীতি সম্পর্কে লেখনী ধারণ করেন। 'হাদীছে দেফা', 'হামারা দেফা', 'আসলাহা-ই-জংগ', 'জিহাদ-ই-সিদ্দীক', 'খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ', 'ইসলামী তরীক-ই-জংগ' প্রভৃতি ইসলামের সমর কৌশল ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা।

www.almodina.com

www.almodina.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.almodina.com